আত্মচরিত

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

প্রবাসী-কার্য্যালয়
২১০-৩-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
১৩২৫

২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,
ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

২১০-৩-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,
প্রবাসী-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা সহরের প্রায় বিশ বাইশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সুন্দরবনের উত্তর প্রান্তে মজিলপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা প্রসিদ্ধ জয়নগর গ্রামের পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত। ইহাতে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরই অধিক বাস। ভদ্রলোকদিগের বাসস্থান হইতে দূরে গ্রামের পার্শ্বে কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, হাড়ি, মুচি প্রভৃতির বাস আছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বড় অধিক নয়, গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের কার্য্য-নির্ব্বাহের উপযুক্ত। গ্রামখানির ইতিবৃত্ত জানি না; অনুমান করি, এককালে গঙ্গা এই পথে বহমানা ছিল এবং গ্রামখানি গঙ্গার চড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পোর্ত্তুগিজেরা যখন এদেশে আসে তখন এই পথে আসিয়াছিল কি না ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যে ও পোর্ত্তুগিজদের যাত্রাবিবরণে "ময়দা" নামক একটী গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। এই মজিলপুরের কয়েক ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে "ময়দা" নামে এক গ্রাম এখনও বিদ্যমান আছে। ইহাতে অনুমান করা যায়, পোর্ত্তুগিজেরা এই পথেই আসিয়া থাকিবে। গ্রামের পার্শ্বে মাঠে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভগ্ন জাহাজ ও বোটের নিদর্শন স্বরূপ অনেক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেও অনুমান হয়, এক সময় এই পথে জাহাজাদি চলিত। এইরূপে, গ্রামখানি যে বহু-কালের নয় তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, যে, জাহাঙ্গীর বাদ্‌সার সময় যখন রাজা মানসিং যশোর নগর আক্রমণ করেন, তখন চন্দ্রকেতু দত্ত নামক

একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্রলোক, সপরিবারে যশোর বিভাগ হইতে পলায়ন করিয়া, ঐ চড়ার উপরিস্থিত গ্রামে সুন্দরবনের ভিতরে আসিয়া সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার যজ্ঞপুরোহিত ও কুলগুরু শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহারই প্রদত্ত এক সামান্য ভূমিখণ্ডে আপনার বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। তিনিই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। এই শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছিলেন তাহার সবিশেষ বিবরণ জানি না। যশোর হইতে আসিয়াছিলেন বলিলে মনে হইতে পারে তিনি পূর্ব্বদেশের লোক, কিন্তু তাহা নহে। আমরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদ হইতে বৈদিক নামের উৎপত্তি। তদ্ভিন্ন উদ্গাতা উপাধিটিও বৈদিক সম্পর্ক সূচনা করিতেছে। বৈদিক ঋত্বিকগণের মধ্যে হোতা পোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতার উল্লেখ দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশে এখনও বৈদিক শব্দ একশ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রতি প্রযুক্ত দেখা যায়। যাঁহারা ধর্ম্মের যজনযাজন লইয়া থাকেন তাঁহারা "বৈদিক", আর যাঁহারা বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত হন তাঁহারা "লৌকিক"। তদ্ব্যতীত এখনও সে-সকল প্রদেশে অনেক স্থানে বৈদিক প্রণালীতে হোমাদি ক্রিয়াকাণ্ডের রীতি প্রচলিত দেখা যায়। তদ্ভিন্ন এইরূপ বহু বহু ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা বেদগান, বেদমন্ত্রপাঠ ও হোমাদিরূপ বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠানাদিকে জীবনের প্রধান কার্য্য করিয়া রহিয়াছেন। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ উপলক্ষে গোদাবরী-তীরে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা

"বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার।
এই সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্ম সম
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন।"

অতএব মনে হয় যে, হয় শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা, না হয় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া থাকিবেন। আমাদের বংশে এরূপ প্রবাদ আছে যে ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর হইতে আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যাতে এখনও "ওতা" নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। এই "ওতা" শব্দ হোতা কি উদ্গাতার অপভ্রংশ কি না বলিতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা হইতে আমি নবম পুরুষ পরে। এই বংশের ব্রাহ্মণগণ মজিলপুর গ্রামের মধ্যভাগ ছাইয়া ফেলিয়াছেন। এই বাৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ আবহমান কাল কেবল যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন কার্য্যে রত থাকিয়া গৌরবান্বিত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়া আসিয়াছেন। যতদূর স্মরণ হয়, এই বংশে আমার পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বাগ্রে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে পণ্ডিতী কর্ম্ম লইয়া সকলের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে আমার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ রাজসেবা করেন নাই। আমার পিতা কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে পড়িবার সময়, অনুমান করি, তাঁহার প্রীতিভাজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুকরণে, চটিজুতা পায়ে দিয়া ও গেঞ্জি গায়ে দিয়া গ্রামে বাহির হওয়াতে জ্ঞাতি ব্রাহ্মণগণ তাঁর সাহেব নাম তুলিয়া দিয়াছিলেন। গ্রামশুদ্ধ লোক তাঁহাকে সাহেব সাহেব করিয়া ডাকিত। এই সাহেব অখ্যাতি তাঁহার বহুদিন ছিল।

বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও তৎপূর্ব্ব শতাব্দীর শেষ ভাগে আমার স্ববংশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক সময়ে একই গ্রামে ১০।১২ খানি টোল চতুষ্পাঠী ছিল। তন্মধ্যে আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের একখানি। ইহাঁকে আমি ১০।১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। ইনি একশত তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

আমার স্মৃতিশক্তি যতদূর যায়, আমার জ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত আমি তাঁহাকে অন্ধ বধির ও বাড়ীর বাহিরে যাইতে অসমর্থ দেখিয়াছি। সে সময়ে বোধ হয় তাঁহার ৯৫ বৎসর বয়স ছিল। তিনি খর্ব্বাকৃতি ও কৃশাঙ্গ মানুষ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে একটী বালকের মত দেখাইত। আমার মা তাঁহার ধর্ম্মভাব ও সাধননিষ্ঠা দেখিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষার সংকল্প ত্যাগ করিয়া তাঁহারই নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে কোলের শিশুটির ন্যায় তাঁহাকে হাতে ধরিয়া পালন করা আমার মার এক প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। প্রাতে উঠিয়া গলবস্ত্রে তাঁর চরণে প্রণত হইতেন; তৎপরে ছোট শিশুটির ন্যায় তাঁর কাপড় ছাড়াইয়া কাচা কাপড় পরাইয়া পূজার আসন ও কোশা-কুশী দিয়া তাঁহাকে সেখানে বসাইয়া দিতেন। বসাইয়া দিয়া নিজের গৃহকর্ম্মে যাইতেন। পূজা অন্তে আমি তাঁর হাত ধরিয়া বসিবার আসনে বসাইয়া দিতাম।

প্রপিতামহদেব একজন সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতানুরাগী মানুষ ছিলেন। আমার স্মরণ আছে, গ্রামের পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে মধ্যে মধ্যে আমার প্রপিতামহের নিকট আসিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহার কাণে নিজেদের শাস্ত্রীয় বিচারের কথা তুলিতেন, এবং কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহার মত চাহিতেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বয়সে অতি প্রাচীন হইলেও সেরূপ স্মৃতিশক্তি হারান নাই। তিনি সমাগত ব্যক্তিদিগকে শাস্ত্রীয় বচন শুনাইয়া দিতেন। তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান বিষয়ে দুইটী উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে।

প্রথমটী এই, অনুমান ১৮৬১।১৮৬২ সালে আমাদের গ্রামের স্কুলের মধ্যে একটী সংস্কৃত শিক্ষার শ্রেণী খোলা হয়। আমাদের জ্ঞাতিবর্গের বাড়ীর অনেক ছেলে তাহাতে ভর্ত্তি হয়; এবং চাঙ্গড়িপোতা-গ্রামবাসী আমার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জাঠতুতো ভাই

কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেই সংস্কৃত-শিক্ষা-শ্রেণীর শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি কর্ম্ম লইয়া আমাদের গ্রামে গিয়া আমাদের বাটীতেই বাস করিতে থাকেন; এবং সংস্কৃত কাব্যাদির বিচার-বিষয়ে আমার প্রপিতামহের একজন সহায় ও সঙ্গী হইয়া পড়েন। আমি কলিকাতা হইতে বাড়ী গেলেই দেখিতে পাইতাম, তিনি কৈলাস মামাকে ডাকিয়া তিন চরণ সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিয়া শেষ চরণ কি তাহা জানিতে চাহিতেছেন।

অপর ঘটনাটী হাস্য-জনক। আমি ১৮৫৬ সালে যখন কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলাম, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানকার কর্ত্তা। তিনি তৎপূর্ব্বে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ান বন্ধ করিয়া নিম্ন শ্রেণীতে তাঁহার প্রণীত উপক্রমণিকা ধরাইয়াছেন। আমরা উপক্রমণিকা অনুসারে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিলাম। তৎপরে গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ীতে আসিলে, আমার প্রপিতামহদেব শুনিলেন, যে, আমি সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি। তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! রাম শব্দের 'টা'তে কি হয় বল ত।" আমি বালকের কণ্ঠস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "রাম শব্দের আবার 'টা' কি!—রামটা।" তখন তিনি বিরক্ত হইয়া তাঁর দন্তবিহীন মুখের ভাষাতে বলিলেন, "ঘোড়ার ঘাস কাটুবে।" রাম শব্দের তৃতীয়ার একবচনে কি হয় বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিতে পারিতাম রামেণ, কিন্তু আমি ত মুগ্ধবোধ পড়ি নাই, কাজেই রাম শব্দের টা যে কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা লইয়া আমার বাবার সহিত প্রপিতামহদেবের কথা হইল, বাবা সমুদয় কথা বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতেছি না শুনিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঝড় ও বন্যা হইয়া দক্ষিণ দেশ ভাসিয়া যায়। সমুদ্র-তরঙ্গ উঠিয়া আমাদের গ্রামের দক্ষিণবর্তী সমুদয় প্রদেশকে প্লাবিত করে। সেই সময়ে হাজার হাজার লোক মারা যায়। তদনন্তর ওলাউঠা রোগ বঙ্গদেশে প্রথম দেখা দিয়া আরও সহস্র সহস্র লোককে নিধন প্রাপ্ত করে। সেই ওলাউঠা রোগে দশ দিনের মধ্যে আমার পিতামহ, প্রপিতামহী ও পিতামহী মারা পড়েন। আমার পিতামহ স্বর্গীয় রামকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বগ্রামেই কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-দিগের গৃহে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কাশ্যপ বংশীয়গণ বড় অহঙ্কৃত ও তেজী মানুষ ছিলেন। আমার পিতামহী ঠাকুরাণী সেই বংশের কন্যা। তিনিও অতিশয় তেজস্বিনী নারী ছিলেন। আমাদের গৃহে এরূপ প্রবাদ আছে যে, পিতামহী ঠাকুরাণীর ঘরে একবার চোর ঢুকিয়া নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার কণ্ঠদেশ হইতে কণ্ঠাভরণ হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল; তিনি হঠাৎ জাগ্রত হইয়া এরূপ বলের সহিত চোরের হাত ধরিলেন, যে, তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। অনেক টানাটানির পর চোর কোনও মতে নিষ্কৃতি পাইল। আর-একটি গল্প ইহা অপেক্ষাও অধিক সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক। সেটি এই :—

সেকালে আমাদের গ্রামে শীতকালে মধ্যে মধ্যে বাঘ দেখা দিত। গ্রামটি সুন্দরবনের মধ্যেই বলিলে হয়। কয়েক ক্রোশের মধ্যে আকাট জঙ্গল ছিল। গ্রামের চতুষ্পার্শ্বেও বন-জঙ্গল যথেষ্ট ছিল। সুতরাং বাঘের আসা কিছুই বিচিত্র ছিল না। এই কারণে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যে, একশাখাভুক্ত চারি পাঁচ পরিবার একত্র বাস করিয়া সমগ্র পাড়াটা একবড় প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া রাখিত; সম্মুখের দ্বার এক, খিড়কীর দ্বার ভিন্ন ভিন্ন। এই বন্দোবস্তে কাজ-কর্ম্ম চলিত। আমাদের কয়েক ঘর জ্ঞাতির

সহিত আমাদের বাড়ীটী এইরূপ এক প্রাচীরে আবদ্ধ ছিল। একদিন শীতকালে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমার পিতামহ সায়ংসন্ধ্যা করিয়া খড়ম পায়ে উঠানে বেড়াইতেছেন, প্রপিতামহদেব সায়ংসন্ধ্যাতে নিমগ্ন আছেন, পিতামহী ঠাকুরাণী রন্ধনশালাতে পাককার্য্যে রত আছেন, এমন সময়ে পার্শ্বের প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে "বাঘ, বাঘ" চীৎকার উঠিল। পিতামহ মহাশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দেখিবার জন্য সেদিকে উঁকি মারিলেন, অমনি বাঘের সঙ্গে চোকাচোকি। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বাবা, সত্যি ত বাঘ, আমাকে নিলে যে।" প্রপিতামহ বলিলেন, "দাঁড়িয়ে থাক্, পিছন ফিরিস না।" অমনি যিনি যেখানে যে কাজে ছিলেন, সকলেই আমার পিতামহের রক্ষার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। পিতামহী ঠাকুরাণী উনান হইতে এক জ্বলন্ত কাঠ লইয়া বাঘের দিকে ধাবিত হইলেন। শুনিতে পাই সেই প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শনে বাঘ ভীত হইয়া যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দ্বার দিয়া মহাবেগে বহির্গত হইয়া গেল। তখন জানিতে পারা গেল, কোনও প্রতিবেশীর একটি নবাগতা বধূ একটী খিড়কীর দ্বার খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, বাঘ তাহা দিয়াই প্রবেশ করিয়াছিল।

আমার পিতামহীর চরিত্র এই সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনুরূপই ছিল। গ্রামেই বাপের বাড়ী, তাহাতে বাপেরা পদস্থ ও গর্ব্বিত লোক, এজন্য পিতামহীর দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে পাড়ার লোক সশঙ্ক-চিত্তে বাস করিত। আমার পিতা তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র। তিনি স্বীয় জননীর ব্যক্তিত্ব ও প্রখর তেজস্বিতা প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছিলেন।

পিতামহ ঠাকুর আকৃতি ও প্রকৃতিতে পিতামহী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিলেন। পিতামহী গৌরাঙ্গী, তিনি শ্যামবর্ণ; পিতামহী অসহিষ্ণু, তিনি সহিষ্ণু; পিতামহী অন্যায়ের গন্ধ পাইলেই অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিতেন,

পিতামহ ঠাকুর অনেক অন্যায় শান্তভাবে বহন করিতেন ; এমন লোক ছিল না যে, পিতামহী ঠাকুরাণীকে অপমানের কথা শুনাইয়া দশকথা না শুনিয়া যায়, পিতামহ মহাশয় অনেক অন্যায় কথা ও ব্যবহার নির্ব্বাক থাকিয়া সহ্য করিতেন, অপমানের সম্ভাবনা হইতে দূরে থাকিতেন ; পিতামহী ঠাকুরাণী নিজগৃহের সুখ সমৃদ্ধি সর্ব্বাগ্রে বুঝিতেন, সেই দিকে প্রধান দৃষ্টি রাখিতেন, বাহিরের লোকের সুখদুঃখের দিকে ততটা মন দিতেন না ; পিতামহের হৃদয়ের দ্বার বাহিরের লোকের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। তিনি অতিশয় দয়ালু মানুষ ছিলেন। বড়পিসীর মুখে নিম্নলিখিত গল্পটী শুনিয়াছি। একদিন বড়পিসী দোলাতে বসিয়া আছেন, এমন সময় পিতামহ ঠাকুর স্নান করিয়া আসিলেন। আসিয়াই সত্বর শয়ন-ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন। পিসী দেখিলেন তিনি গামছাখানি পরিয়া আসিয়াছেন, পরিধেয় বস্ত্রখানি নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তোমার কাপড় কোথায় ফেলে এলে?" পিতামহ তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া চুপে চুপে বলিলেন, "চেঁচিয়ো না মা! তোমার মা যেন টের পায় না, কাপড়খানা একজন গরীবকে দিয়ে এসেছি।" ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে পিতামহ মহাশয়কে অনেক সময় পিতামহী ঠাকুরাণীর ভয়ে লুকাইয়া দান করিতে হইত। আমার পিতাঠাকুর স্বীয় মাতার এই তেজস্বিতা ও নিজ পিতার এই সহৃদয়তা উভয়ই পাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, আমার পিতামহ ঠাকুর যখন গত হইলেন, তখন দুই পুত্র, দুই কন্যা পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন। তন্মধ্যে বড়পিসী তখন বয়ঃপ্রাপ্তা অর্থাৎ ১৬।১৭ বৎসরের মেয়ে, এবং তৎপূর্ব্বেই সন্তানের মুখ দেখিয়াছেন। কাজেই তিনি তখন গৃহের কর্ত্রী হইয়া বসিলেন। পিসামহাশয় এই সময় হইতে ঘরজামাই হইয়া, বড় পিসীর শাসনাধীনে থাকিয়া, আমাদের বাড়ীতেই বাস ও সমুদয় বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমার পিতার বয়ঃক্রম তখন ৬।৭ বৎসর। এইরূপে, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, পিসামহাশয় ও বড়পিসী, ছোটপিসী, কাকা ও বড়পিসীর দুই সন্তান লইয়া সংসার চলিতে লাগিল।

আমার প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার আয়েই সংসার চলিত। তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বৃত্তিরূপে অনেক উপার্জ্জন করিতেন। তিনি অনেক সময় কলিকাতাতে বাস করিতেন। এখানে তিনি পটলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ মল্লিক পরিবারের কুলপুরোহিত ছিলেন। দেশের কাজকর্ম্ম দেখার ভার পিসামহাশয় ও বড়পিসীর উপর ছিল।

ক্রমে আমার পিতার দশম কি একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম ও সেই সঙ্গে বিবাহের কাল উপস্থিত হইল। দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলীনদিগের মধ্যে তখন কুলসম্বন্ধের প্রথা ছিল, এখন দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে। কুলসম্বন্ধের অর্থ এই যে, কুলীন বৈদিকের ঘরে কন্যা জন্মিলেই দুই একমাসের মধ্যে সমশ্রেণীর কোনও শিশু বালকের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখা হইত। তৎপরে কন্যা আট নয় বৎসরের হইলেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত। যদি বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্‌দত্ত বরের মৃত্যু হইত, তাহা হইলে কন্যা "অন্যপূর্ব্বা" নাম পাইত। তৎপরে আর তাহার কুলীন বরের সহিত বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না; মৌলিক বরের সহিত বিবাহ হইত। আমার দুই পিসী, এইরূপে "অন্যপূর্ব্বা" হইয়া মৌলিক বরের সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন। এই প্রথানুসারে আমার পিতার ছয় কি সাতমাস বয়সের সময়, কলিকাতার পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ববর্ত্তী চাঙ্গড়িপোতা গ্রামের হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একমাস-বয়স্কা প্রথমা কন্যার সহিত কুলসম্বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তদনুসারে দশম কি একাদশ বৎসর বয়সে আমার পিতার বিবাহ হইল।

হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন সুবিজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা কাঁসারিপাড়াতে তাঁহার টোল চতুষ্পাঠী ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুবিখ্যাত সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্য-জগতে চিরদিনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আমার মাতামহ কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত "প্রভাকর" নামক পত্রিকা সম্পাদনে তাঁহার সাহায্য করিতেন। তিনি উত্তরকালে মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গলা পাঠশালাতে পণ্ডিতী কর্ম্ম লইয়াছিলেন, এবং আমার বড় মামা সংস্কৃত কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই কলেজেই কর্ম্ম পাইলে, মাতামহ মহাশয় মিতব্যয়িতার গুণে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া পৈতৃক ভিটা হইতে উঠিয়া স্বগ্রামেই একটি দোতালা পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে ইহা এক নূতন ব্যাপার বলিয়া ঐ দোতালা বাড়ী প্রতিবেশীবর্গের অনেকের চক্ষের শূল-স্বরূপ হইয়া বহুদিন ধরিয়া আমার মাতুল-পরিবারের ঘোর অশান্তির কারণ হইয়াছিল। তাহা পরে বর্ণন করিব।

আমার মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে আমার বেশ স্মরণ হয়।° আমার ৯৷১০ বৎসরের সময় তিনি দারুণ উরুস্তম্ভ রোগে গতাসু হন। তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, প্রসন্নমূর্ত্তি, দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন। আমাকে শিবরাম বলিয়া ডাকিতেন। গৃহস্থালী বিষয়ে পরিপক্কতা তাঁহার প্রধান গুণ ছিল। আমার মাতুলালয়ে সম্বৎসরের চাল, ডাল, প্রভৃতি গৃহস্থের প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্য এরূপ সঞ্চিত থাকিত যে, হঠাৎ কোনও দিন দশ-পনর জন অতিথি উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে দুই ঘণ্টার মধ্যে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান মাতামহী ঠাকুরাণীর পক্ষে কিছুই ক্লেশকর হইত না। তাঁহার মিতব্যয়িতা ও পাকা গৃহস্থালীর

একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমার বড়মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথম পুত্র উপেন্দ্রনাথের শৈশব কালে হুঁকা কলিকা হাতে লইয়া বেড়াইবার বাতিক ছিল। একটা হুঁকা ও কলিকা না পাইলে কাঁদিয়া ঘর ফাটাইত; রাত্রে তাহার শয্যার পার্শ্বে হুঁকা কলিকা রাখিতে হইত; রাত্রি দুই প্রহরের সময় জাগিলে হুঁকা হুঁকা করিয়া কাঁদিত। সুতরাং তাহার জন্য হুঁকা ও কলিকা সর্ব্বদাই রাখিতে হইত। হুঁকা ত বড় একটা ভাঙ্গিতে পারিত না, কলিকাগুলি দিনে ২।৩ বার ভাঙ্গিত। মাতামহ মহাশয় প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে গৃহে আসিতেন, আসিয়া রবিবার গৃহস্থালীর জিনিস গুছাইতেন। একবার আসিয়া রবিবার কয়েক ঘণ্টা বসিয়া মাটি দিয়া এক ঝোড়া কলিকা গড়িয়া খড়ের আগুনে পোড়াইয়া রাখিয়া গেলেন; অভিপ্রায় এই, উপেন যত পারে কলিকা ভাঙ্গুক। তখন এক পয়সাতে বোধ হয় ৮টা কলিকা পাওয়া যাইত, সে ব্যয়টুকুও বাঁচাইবার দিকে তাঁহার এত দৃষ্টি পড়িল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চাঙ্গড়িপোতা গ্রাম কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে প্রতিষ্ঠিত। সেকালে একপ্রকার দোলদার ছক্কড় গাড়ি ছিল, তাহা চাঙ্গড়িপোতার সন্নিহিত রাজপুর গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিত। কুঠীওয়ালা বাবুরা ও অপেক্ষাকৃত পদস্থ ব্যক্তিরা প্রতি সোমবার সেই দোলদার ছক্কড় গাড়ি চড়িয়া কলিকাতায় আসিতেন ও শনিবার কলিকাতার ধর্ম্মতলা হইতে ঐ গাড়ি চড়িয়া বাড়ী যাইতেন। আমার মাতামহের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না; কিন্তু তাঁহাকে কেহ কখনও গাড়িতে দেখিতে পাইত না; তিনি সর্ব্বদাই শনিবার পদব্রজে কলিকাতা হইতে বাড়ীতে যাইতেন, এবং সোমবার পদব্রজেই কলিকাতায় ফিরিতেন; বড়মামাও সেইরূপ করিতেন। আমি

৮ বৎসরের সময় কলিকাতায় আসিলে, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে পদব্রজে যাতায়াত করিতাম।

এই-সকল কারণে লোকে কৃপণ বলিয়া আমার মাতামহের অখ্যাতি করিত; কিন্তু আমি কলিকাতায় তাঁহার বাসাতে আসিয়া দেখিয়াছি, তিন জামাতা ছাড়া স্বসম্পর্কীয় প্রায় ৮।৯ জন যুবক তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। যাহা হউক তিনি যে অতিশয় হিসাবী ও মিত-ব্যয়ী লোক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার মাতা ঠাকুরাণী স্বীয় পিতার গৃহস্থালীর সুব্যবস্থা ও মিতব্যয়িতা পাইয়াছিলেন। আমার মাতামহী ঠাকুরাণী আকৃতি ও প্রকৃতিতে মাতামহ হইতে বিভিন্ন ছিলেন। মাতামহ সম্বৎসরের চাল ডাল গোলাতে সঞ্চয় করিতেন, মাতামহী দরিদ্রা স্ত্রীলোকদিগকে গোপনে ডাকিয়া সেই চাল ডাল অঞ্চল ভরিয়া দান করিতেন; টাকা কড়ি সর্ব্বদা দুই হাতে দান করিতেন। এজন্য তাঁহার পতি বা পুত্র তাঁহার হস্তে সংসারের টাকা রাখিতেন না; আপনাদের নিকট রাখিতেন। কিন্তু মাতামহীর নিজব্যয় বলিয়া তাঁহার হস্তে যাহা দেওয়া হইত, তাহা হইতেই দান ধ্যান চলিত।

এইস্থানে মাতামহী ঠাকুরাণীর সদাশয়তার কয়েকটী নিদর্শন দেখাই। আমার পিতা আমাকে কলিকাতায় রাখিয়া গেলে সময় সময় আমার ভয়ানক অর্থাভাব হইত। তখন অনন্যোপায় হইয়া আমি মাতুলালয়ে যাইতাম, মামীদিগকে আমার অভাব জানাইতে সাহস করিতাম না। মাতামহী ঠাকুরাণী আমাকে এত ভাল বাসিতেন যে আমি মাতুলালয়ে গেলে, রাত্রে আমাকে স্বীয় শয্যাতে লইয়া, গলা জড়াইয়া শুইতে ভাল বাসিতেন। এই নিয়মে তিনি আমায় উনিশ বিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি কিরূপে আমাকে আলিঙ্গন পাশে বাঁধিতেন তাহা স্মরণ করিলে এখনও চক্ষে জল আসে। যাহা হউক যে জন্য এ বিষয়টা

উল্লেখ করিতেছি তাহা এই। মাতামহী আমাকে আলিঙ্গনপাশে বাঁধিয়া শয়ন করিলে আমি রাত্রে মাতামহীর কাছে শুইয়া তাঁহার কানে কানে আমার দারিদ্র্যের কথা বলিতাম; তিনি গোপনে আমার কাপড়ের খুঁটে তাঁহার নিজ ব্যয়ের টাকা হইতে হয়তো দুইটি বা চারিটি টাকা বাঁধিয়া দিতেন, বলিতেন, "এ কথা কারুকে বলো না, টাকার কষ্ট হলেই আমার কাছে এস।" এখন স্মরণ করিয়া লজ্জা হয়, কি স্বার্থপরতার কাজই করিতাম।

আমার মাতামহী ঠাকুরাণী বড় ধর্ম্মভীরু মানুষ ছিলেন। উপহাস-চ্ছলেও যদি কাহাকেও কিছু দিব বলিয়া মুখ দিয়া কথা বাহির করিতেন, তাহা হইলে তাহা না দিয়া প্রসন্নমনে থাকিতে পারিতেন না; তাহা দিতেই হইত। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার রন্ধনশালার জন্য একটা বড় ঘটা কেনা হইল। ঘটাটা এত বড় যে জলশুদ্ধ নাড়াচাড়া করিতে মেয়েদের কষ্ট হয়। মাতামহী একবার জলসমেত ঘটাটা তুলিতে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাবারে! এ ঘটার একঘটা জল যদি কেউ একেবারে খেতে পারে তবে তাকে একটাকা দিই।" অমনি জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে এক পরিবারের একটি ছেলে ছুটিয়া গিয়া ঘটাটা লইয়া জলপান করিতে বসিয়া গেল। মাতামহী ভয় পাইয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে তুই অত জল খাসনি, আমি টাকা দিব বলিছি দিবই," এই বলিয়া একটা টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিলেন। আর একবার একদিন গ্রীষ্মকালে ভয়ানক রৌদ্র, উঠান তাতিয়া অগ্নিসমান হইয়াছে। এমন সময় মাতামহী ঠাকুরাণীর একবার গোলাতে যাওয়ার আবশ্যক হইল। উঠানে পা দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বাবারে! যেন আগুন, এ উঠানে যদি কেউ দুদণ্ড বসতে পারে, তবে তাকে দুটাকা দিই।" অমনি একজন যুবক প্রস্তুত। সে লম্ফ দিয়া সেই তপ্ত উঠানের মধ্যে গিয়া

বসিল। মাতামহী একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন; "ওরে তুই উঠে আয়, আমি দুটাকা দিচ্ছি।" তাহাকে দুইটাকা দিলেন।

বাস্তবিক তাঁহার মত কোমল-হৃদয়া, দয়াশীলা, স্বজনবৎসলা, উদারপ্রকৃতি সত্যপরায়ণা নারী অল্পই দেখিয়াছি। আমার বড়মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ধর্ম্মভীরুতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। সে ধর্ম্মভীরুতা তিনি জননী হইতে পাইয়াছিলেন।

মাতামহীর বৃদ্ধাবস্থায় আমার দুই মামী যখন ঘরকন্নার ভার লইলেন ও তাঁহাকে সংসারের খুঁটিনাটি হইতে নিষ্কৃতি দিলেন, তখন ধর্ম্মচিন্তা, দরিদ্রের সেবা ও গৃহস্থ শিশুগণের পালন, তাঁহার প্রধান কাজ দাঁড়াইল। তিনি প্রতিদিন প্রাতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন এবং স্নানান্তে ফিরিবার সময়, পথের দুই পার্শ্বে পরিচিত দরিদ্র পরিবারদিগকে দেখিয়া আসিতেন। এটি তাঁহার নিত্য ব্রতের মধ্যে হইয়াছিল। এজন্য তিনি নিজ ব্যয়ের টাকা হইতে কয়েক আনা পয়সা সঙ্গে লইতেন, এবং গৃহে ফিরিবার সময় বাড়ীতে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আবশ্যকমত কিছু কিছু সাহায্য করিতেন এবং নিজের সাধ্যে না কুলাইলে, পুত্রদিগকে অনুরোধ করিয়া সাহায্য করাইয়া দিতেন।

তাঁহার সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী কথা স্মরণ হইতেছে। একবার আমি পদব্রজে স্বীয় বাসগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিতে-ছিলাম। পথিমধ্যে মাতুলালয়ে একবেলা থাকিয়া আসিব এইরূপ সংকল্প ছিল; কিন্তু অগ্রে মাতুলালয়ে সংবাদ দিই নাই। গ্রাম হইতে অতি প্রত্যুষে বাহির হইয়াছিলাম। মাতুলালয়ে পৌছিতে প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। পথিমধ্যে একজন হীনজাতীয় লোক আমার সঙ্গ লইল। সে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আসিতেছে। সে যখন শুনিল যে, আমি

সহরে আসিতেছি তখন ব্যগ্রতা সহকারে তাহাকে সঙ্গে লইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি জানিতাম বিনা সংবাদে অসময়ে মাতুলালয়ে পৌঁছিব, হয়ত মামীদিগকে আবার পাক করাইতে হইবে, সেই ভয়ে প্রথমে ইতস্ততঃ করিলাম, কিন্তু তাহার ব্যগ্রতাতিশয় দেখিয়া চক্ষুলজ্জা-বশতঃ "না" বলিতে পারিলাম না। দুইজনে দ্বিপ্রহরের সময় মাতুলালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মামীরা তখন আহারে বসিয়াছেন, মাতামহী ঠাকুরাণী বসিতে যাইতেছেন, তখন ভাতে হাত দেন নাই। আমার গলার স্বর শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। আমি তাঁহাকে চুপে চুপে বলিলাম, একটি অন্তজাতীয় লোক পথ হইতে আমার সঙ্গ লইয়াছে। সে কলিকাতায় কখনও যায় নাই, আমার সঙ্গে যাইবে। তিনি বলিলেন, "বেশ ত, তুই শাঁগগির নেয়ে এসে মামীদের পাতে বসে যা, আমার ভাত ঐ লোকটা খাক, আমি আমার ভাত চড়িয়ে দিচ্চি, পরে খাব।" এ প্রকার বন্দোবস্তটা আমার ভাল লাগিল না। একবার বলিলাম, "তোমার ভাত ওকে কেন দেবে, যে ভাত চড়াবে, তাই ওকে দিয়ো, তোমার ভাত তুমি খাও।" তিনি বলিলেন, "আহা! বেচারা পথ চলে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, ও বসে থাকবে আর আমরা খাব, তাকি হয়, যা যা তুই নেয়ে আয়।" তাঁর ত্বরাতে আমাকে আর ভাবিতে চিন্তিতে সময় দিল না, তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া মামীদের পাতে বসিয়া গেলাম। মাতামহী সেই লোকটীর হাতে একটু তেল দিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমিও নেয়ে এসো, আসবার সময় আমাদের বাগান থেকে একখানা কলাপাতা কেটে এনো।"

তারপরে মাতামহী ঠাকুরাণী যখন উঠানের পাশে ঢেঁকিশালার দাবা ঝাঁট দিয়া নিজের ভাতগুলি তুলিয়া তাহাকে দিতে গেলেন, তখন

মামীদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা রাগারাগি করিতে লাগিলেন। দিদিমা আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগকে বলিয়া নিজের ভাতগুলি ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া দিলেন। আমি আহারান্তে আচমন করিয়া আসিয়া দেখি, সে ব্যক্তি আহারে বসিয়াছে, দিদিমা অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন এবং "বাবা, এটা খাও, ওটা খাও," বলিতেছেন, যেন তাহার প্রত্যেক গ্রাসে তাঁহার সন্তোষ হইতেছে। সে ব্যক্তি আহারান্তে আসিয়া গলবস্ত্র হইয়া আমার মাতামহীর চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "মা, অনেক বামনের মেয়ে দেখেছি, তোমার মত বামনের মেয়ে দেখিনি।"

ঠিক কথা, আমার মাতামহীর ন্যায় ব্রাহ্মণকন্যা বিরল। বলিতে কি, তাঁহাকে আমি যখন স্মরণ করি, আমার হৃদয় পবিত্র ও উন্নত হয়, এবং এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে আমাতে যে কিছু ভাল আছে, তাহার অনেক অংশ তাঁহাকে দেখিয়া পাইয়াছি।

এই মাতামহীর ক্রোড়ে, মাতুলালয়ে, বাঃ ১২৫৩ সাল ১৯শে মাঘ ইংরাজী ১৮৪৭ সাল ৩১ শে জানুয়ারী রবিবার আমার জন্ম হইল। আমার জন্মকালের বিষয় যাহা শুনিয়াছি লিখিতেছি। সায়ংকালে যখন আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম তখন সবে পূর্ণিমা গিয়া প্রতিপদের সঞ্চার হইতেছে। সেদিন আমার মাতামহ বাড়ীতে আছেন। পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শ্রবণমাত্র তিনি তাঁহার এক দৈবজ্ঞ জ্ঞাতিবন্ধুর ভবনে ধাবিত হইলেন। গৃহস্থ রমণীগণের শঙ্খধ্বনিতে পাড়া কাঁপিয়া যাইতে লাগিল, ওদিকে গ্রামে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে, ন্যায়রত্নের দৌহিত্র জন্মিয়াছে। মাতুলগৃহে সেই প্রথম শিশুবালকের আবির্ভাব। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতামহী ও তাঁহার জননী, দুই মামী, দুই মাসী (আর এক মাসী তখনও শিশু) ও গৃহস্থ অপর দুই এক জন বিধবা, ইঁহাদের আদর ও

অভ্যর্থনার ধন হইলাম। পরদিন রজনী প্রভাত হইতে না হইতে দলে দলে বাজ্‌নাদার আসিয়া বাড়ী আক্রমণ করিতে লাগিল। পরদিন প্রাতে মাতামহ মহাশয় কলিকাতায় গেলেন। শনিবার তাঁহাদের ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত সাতদিন দলে দলে বাজ্‌নাদার আসিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল।

শনিবার মাতামহঠাকুর ও বড়মামা কলিকাতা হইতে আসিলেন। বাবা তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, তিনি বোধ হয় লজ্জাতে তাঁহাদের সঙ্গে আসেন নাই। কিছুদিন পরে আসিয়াছিলেন। বড়মামা রবিবার প্রাতে সূতিকাগৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া মোহর দিয়া ভাগিনার মুখ দেখিলেন। জননীর মুখে শুনিয়াছি, আমার মামা, আমার মাথা ও কপাল দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার এই ভাগিনা বড়লোক হবে।"

ক্রমে সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়া আমি মাতামহী, মামী ও মাসীদের কোলে বাড়িতে লাগিলাম। বিশেষতঃ আমার মেজমাসী একদণ্ড আমাকে কোল হইতে নামাইতেন না।

কিন্তু আমি পৃথিবীতে পদার্পণ করিবামাত্র মাতুলগৃহে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার মাতামহ মহাশয় স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিয়া পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগপূর্ব্বক, তাহার নাতিদূরে একটি দ্বিতল পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঐ দ্বিতল বাড়ীটি পাড়ার লোকের চক্ষুশূল হইল। একখণ্ড পতিত জমি ক্রয় করিয়া সেই জমির উপরে ঐ বাড়ীটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ভূমিখণ্ড বহুদিন পতিত অবস্থাতে থাকাতে তাহার উপর দিয়া লোকের যাতায়াতের পথ হইয়া গিয়াছিল। বহু বহু বৎসর ধরিয়া লোকে সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিত। কিন্তু মাতামহ যখন তাহা ক্রয় করিয়া, প্রাচীরের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, তদুপরি গৃহনির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,

তখন তাহা লইয়া বিবাদ ও বিষম দলাদলি ও তাহার ফলস্বরূপ মাম্‌লা মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। তখন প্রতিবেশীগণ আমার মাতুল-পরিবারের প্রতি এরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিল যে, তাঁহারা বাধ্য হইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন। সেই সূত্রে আমার ছয়মাস বয়সে জননী আমাকে লইয়া আমার বাসগ্রাম মজিলপুরের বাটীতে গেলেন।

আমার প্রপিতামহ তখন সকল কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন; চক্ষে দেখেন না, কানে শোনেন না। তিনি আমাকে পাইয়া "আমার বংশধর আসিয়াছে" বলিয়া মহা আনন্দিত হইলেন এবং আমাকে "বাবা বাবা" করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আমার এতটা অভ্যর্থনা আমার বড় পিসীর সহ্য হইল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার কাকার মৃত্যু হওয়ার পর, ও ছোটপিসী শ্বশুরালয়ে যাওয়ার পর,. তিনি নিজ পুত্রকন্যাগণকে লইয়া গৃহের কর্ত্রী হইয়া বসিয়াছিলেন। সে ভিটা যে তাঁহাকে কোনও দিন পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা বোধ হয় স্বপ্নেও জানিতেন না। গৃহকর্ত্তা স্বীয় পিতামহের হাতে নূতন বংশধরের এই আদর দেখিয়া তাঁহার আর-এক চিন্তার উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন, তিনি এতদিন ভিতরে থাকিয়াও বাহিরে রহিয়াছেন।

ইহার পর হইতে আমার মাতার প্রতি তাঁহার দারুণ বিরুদ্ধভাব জন্মিল এবং ননদে ও ভাজে মন-কষাকষি আরম্ভ হইল। তাহার ফলস্বরূপ আমার মা আমাকে দেখিতেন না। মনের রাগে প্রভাত হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অনাহারে রান্নাঘরে সংসারের কাজে নিমগ্ন থাকিতেন, আমি চেঁচাইয়া মরিয়া যাইতাম, একবার ফিরিয়া চাহিতেন না। বড় কাঁদিলে আমার পিস্‌তুতো বোনেরা কোলে

করিয়া রান্নাঘরে লইয়া গিয়া উনানের নিকট হইতে স্তনপান করাইয়া আনিত। কিন্তু রাগের দুধ খাইয়া খাইয়া আমার ঘোর উদরাময় জন্মিল; যেমন দুধ পান করিতাম, তেমনি দুধ বাহির হইয়া যাইত। অল্প দিনের মধ্যে রাগে ও অনাহারে মায়ের বুকের দুধ শুকাইয়া গেল। তখন আমার জীবন-সংকট উপস্থিত। রক্তভেদ ও রক্তবমন আরম্ভ হইল। তখন মার চক্ষুস্থির হইল। তিনি সমস্ত দিন সংসারের কাজে থাকিতেন, সমস্ত রাত্রি আমাকে কোলে করিয়া বসিয়া কাঁদিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে আমার মুখে জল দিতেন। এই অবস্থাতে একদিন আমার পিসীর অনুপস্থিতি-কালে আমার মা আমার প্রপিতামহের ক্রোড়ে আমাকে শোয়াইয়া তাঁহার কানে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার দুধ শুকিয়ে গিয়েছে, তোমার বাবা না খেতে পেয়ে মরে।" এই কথা শুনিয়া তিনি নিজের গালে মুখে চড়াইতে লাগিলেন এবং এই সংবাদ তাঁকে কেহ দেয় নাই বলিয়া আমার পিসামহাশয় ও পিসীমাকে গালা-গালি দিতে লাগিলেন; এবং পিসামহাশয় আসিলে হুকুম দিলেন, "আমার বাবার জন্য যত দুধ লাগে রোজ করে দেও।" আমার জন্য দুধের রোজ হইল। তদবধি প্রপিতামহ কিছু সতর্ক হইয়া কান পাতিয়া থাকিতেন। ছোট ছেলের কান্না একটু কানে গেলেই "বাবা কেন কাঁদে" বলিয়া চীৎকার করিতেন, আর বড়পিসী রাগিয়া যাইতেন।

আমার জন্য দুধের রোজ হইল বটে, কিন্তু তখন উদর ভাঙ্গিয়াছে, ছেলে আর বাঁচান যায় না। আমার শরীর অস্থিচর্ম্মসার হইল। তখনকার অবস্থা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমার পাছা ছিল না, যে পাছা পাতিয়া বসি; যখন বসিতে শিখিলাম, তখন পিঠের দাঁড়ার উপর বসিতাম। সেই যে আমার হাত পা ছিনা পড়িয়া গেল, সেই ছিনা-পড়া এখনও রহিয়াছে।

দারুণ উদরভঙ্গের উপরে রসতড়্কা রোগ দেখা দিল। মধ্যে মধ্যে সমুদয় গা গরম হইয়া হাত পা খেঁচিতাম ও অজ্ঞান হইয়া যাইতাম। মা আমাকে বুকে ধরিয়া ছেলে গেল বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেন। মায়ের মুখে শুনিয়াছি এই রোগ প্রায় ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছিল, ডুব দিয়া নাইতে শিখিলে সারিয়া যায়। আমার আকার ও মূর্ত্তি তখন এ প্রকার হইয়াছিল, যে, আমাকে রাখা ও আমার সেবা করা একমাত্র জননী ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য ছিল না।

যাহা হউক আমার পিসীমা আমার প্রপিতামহের তিরস্কার খাইয়া খাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে আমাদের ভিটাতে আর তাঁহার থাকা হইতেছে না। পিসামহাশয় আমাদের বাড়ীর সম্মুখেই কিছু জমি লইয়া একটি বসতবাটী নির্ম্মাণ করিলেন। পিসীমা সপরিবারে সেখানে উঠিয়া গেলেন। আমার বয়স তখন দুই কি আড়াই বৎসর হইবে।

বড়পিসী উঠিয়া গেলে গৃহে শান্তি হইল বটে, কিন্তু আমার মার আর-একপ্রকার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। একমাত্র দাসী সহায় করিয়া সেই বৃদ্ধ দাদাশ্বশুর ও শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইতে হইল। একলা ঘরে একলা স্ত্রীলোক পাইয়া চোরে বড় উপদ্রব আরম্ভ করিল। কয়েকবার সিঁদ হইল। এক রাত্রে এক ঘরে পাঁচ জায়গায় সিঁদ ফুটাইয়াছিল।

একদিকে চোরের উপদ্রব, অপরদিকে দুষ্টলোকের উপদ্রব। বাবা তখন কলিকাতায় আমার মাতামহের বাসায় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে পড়িতেছেন। সুতরাং আমার মাকে বৎসরের অধিকাংশকাল সশঙ্ক-চিত্তে একাকিনী থাকিতে হইত এবং আত্মরক্ষার জন্য অনেক সময় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইত। সেই অবধি মায়ের এমন একটা আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান জন্মিয়াছিল, যে, তাঁহার মর্য্যাদার অণুমাত্র লঙ্ঘন হইলে,

তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না; লঙ্ঘনকারীকে জানিতে দিতেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটির ভিতরে মেঘের ন্যায় আগ্নেয়গিরির অগ্নিও আছে। আমার মাতার আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একটি আমার শৈশবে ঘটিয়াছিল, অপরটি বহুবৎসর পরে।

প্রথম ঘটনাটি এই। পাঁচ বৎসর বয়স হইলেই মা আমাকে গ্রামের একটি পাঠশালে দিলেন। বসুপাড়ায় বসুদের বাড়ীতে এক বদ্ধমেনে গুরুর পাঠশালা ছিল, তাহাতে আমাকে ভর্ত্তি করা হইল। আমি তালপাতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াই দিন দিন সমপাঠী বালকদিগের অপেক্ষা উন্নতি দেখাইতে লাগিলাম। ইহার কারণ এই, আমার মা সে সময়কার তুলনাতে অনেক লেখাপড়া জানিতেন। আমার বাবা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদন মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রিয় মানুষ ছিলেন। তাঁহার মত সত একটু উদার ছিল, তিনি আমার মাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মা প্রায় প্রতিদিন দুপুর বেলা রামায়ণ পড়িতেন। দুপুরবেলা তিনি নিজে পড়িতেন ও আমাকে পড়িতে ও লিখিতে শিখাইতেন। সেই জন্য আমি পাঠশালে অপরাপর বালকের অপেক্ষা অধিক উন্নতি দেখাইতে লাগিলাম। ইহাতে গুরুমহাশয়ের কিছু আশ্চর্য্য বোধ হওয়াতে তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরে কে পড়া বলে দেয় রে?" আমি বলিলাম, "আমার মা।" গুরুমহাশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা লেখাপড়া জানে?" উত্তর, "হাঁ, আমার মা বেশ পড়্‌তে পারে।" তারপর গুরুমহাশয় সন্ধান লইলেন যে আমার মা একাকিনী বাড়ীতে থাকেন, বাবা বিদেশে। একদিন গুরুমহাশয় আমার লিখিবার তালপাতে কি লিখিয়া আমাকে দিলেন, বলিলেন, "তোর মাকে দিস্ আর কেউ যেন দেখে না।" আমি ভাবিলাম,

সকল বালকের মধ্যে আমি ভাগ্যবান, গুরুমহাশয় আমার মাকে পত্র লিখিয়াছেন। আমি বাড়ীতে আসিয়া একগাল হাসিয়া মাকে বলিলাম, "ওরে মা, গুরুমহাশয় তোকে কি লিখেচে দেখ।" মা তালপাতাটি আমার হাত হইতে লইয়া একটু পড়িয়াই গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; পাতাটি ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া দিলেন। আমি তাহা আনিয়াছিলাম বলিয়া আমাকে মারিলেন, এবং তৎপর দিন হইতে আমার পাঠশালে যাওয়া বন্ধ করিলেন। সেই আমার পাঠশালে যাওয়া শেষ। তৎপর তিনি আমাকে গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

আর একটি ঘটনা অন্যরূপ। সে ঘটনাটি সে সময়ে আমার মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হওয়াতেই স্মরণ আছে। একবার আমার মাতুলালয়ে কয়েকজন নবাগত অতিথি আহারে বসিয়াছেন। আমার মায়ের জ্ঞাতি সম্বন্ধে খুড়তুতো ভাই অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী সেই সঙ্গে বসিয়াছেন। এই অভয় মামা কলিকাতার সেণ্টজেভিয়ার কলেজে কি বিশপস্‌ কলেজে সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রামে একজন পদস্থ ব্যক্তি। কিন্তু আমার মা ও পাড়ার অপরাপর প্রাচীনা আত্মীয়া মহিলারা অভয় মামাকে বালককাল হইতে "ঘেনো", "ঘেনো" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার অভয় নাম দিদিদের বা খুড়ী-জেঠীদের মুখে কখনই শোনা যাইত না। সকলেই "ঘেনো," "ঘেনো" বলিয়া ডাকিতেন। উক্ত দিবস আহারের সময় আমার মা পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি মাছ পরিবেশন করিবার সময় অভয় মামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘেনো, তোকে একটা মাছের মুড়ো দেব?" কারণ অভয় মামা আহারের বিষয়ে খুঁতখুঁতে লোক ছিলেন, মা তাহা জানিতেন। এত লোকের সমক্ষে "ঘেনো" বলিয়া ডাকাতে অভয় মামা রোষকষায়িতলোচনে একবার আমার

মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন, এবং অবজ্ঞাসূচক দুই একটি বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আমার মা তখন কিছু বলিলেন না। তৎপরে আচমনান্তে অভয় মামা যেই ঘরের মধ্যে পান খাইতে আসিয়াছেন, অমনি মা কুপিতা সিংহীর ন্যায়, পদাহতা ফণিনীর ন্যায়, গর্জিয়া উঠিলেন, "তবে রে গাধা! লেখাপড়া শিখে তোর এই বিদ্যে হয়েছে? আমি তোকে ঘেনো বলেছি, তাই ভাল দেখায়, না, অভয়বাবু বল্‌লে ভাল দেখায়? তোর বন্ধুরা কি জানে না আমি তোর দিদি? তুই বাইরে অভয়বাবু হতে পারিস, আমাদের কাছে তো সেই ঘেনোই আছিস। জিজ্ঞাসা করে দেখিস তোর বন্ধুরা ঐ ঘেনো ডাকেই খুসী হয়েছে কি না। আর যদি আমার ঘেনো বলাটা চুকই হয়ে থাকে, তুই তো অতগুলো ভদ্রলোকের সমক্ষে তোর দিদিকে অপমান কর্‌লি। এই তোর লেখাপড়ার ফল? তোর লেখাপড়াকে ধিক্, তোর প্রফেসারিতে ধিক্, তোর নাম সম্ভ্রমকে ধিক্! অমুক কাকার কি কপাল, তোর মত গাধার জন্য এতগুলো টাকা বৃথা খরচ করেছেন।" যখন আগ্নেয়-গিরির অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এইরূপ ব্যক্যবাণ বর্ষণ চলিতে লাগিল, তখন অভয় মামা আর সহিতে না পারিয়া মায়ের পায়ে পড়িয়া গেলেন, "দিদি! মাপ কর, অপরাধ হয়েছে।" অভয় মামাকে আমি বিদ্বান লোক ও গুণী লোক বলিয়া মনে মনে উচ্চ স্থান দিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি যখন আমার মায়ের পায়ে পড়িয়া গেলেন, তখন আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না। তিনি চলিয়া গেলে মাকে বকিতে লাগিলাম, "তুমি আমাকে যেমন করে বক তেমনি করে অত বড় লোকটাকে বক্‌লে?" মা বলিলেন, "রেখে দে তোর বড় লোক, বড়লোকের মুখে ছাই। অসভ্য, বর্ব্বর, গোঁয়ার!" সেদিনকার সে দৃশ্য আমি জন্মে ভুলিব না।

আমার তেজস্বিনী মা, একাকিনী পড়িয়াও এইরূপে তাঁহার আত্মমর্যাদা-জ্ঞানের গুণে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। বাবা গ্রীষ্মের ছুটি ও পূজার ছুটির সময় বাড়ীতে আসিতেন। আমি তাঁহাকে যমের মত ডরাইতাম, কারণ তিনি সামান্য সামান্য কারণে আমাকে ভয়ানক মারিতেন।

আমার মা আমাতে কিছু অন্যায় দেখিলে রাগ করিতেন এবং সাজা দিতেন বটে, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার কি প্রকার স্নেহ ছিল তাহার বর্ণনা হয় না। একবারকার একটা ঘটনা মনে আছে। তখন আমার বয়স চারি পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না। সেই সময়ে একবার আমার গুরুতর পীড়া হইয়াছিল। সেই পীড়ার অবস্থাতে মা ইষ্টদেবতার চরণে প্রণত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাঁহার কৃপায় ছেলে যদি সারিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি হাতে মাথাতে ধূনা পোড়াইবেন, এবং নিজের বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া দেবতার স্তব লিখিয়া দিবেন। কয়েক দিনের পর আমি সারিয়া উঠিলাম। যেদিন ব্রত উদ্‌যাপনের দিন আসিল, সেদিন পাড়ার একটি মেয়ে আমাকে কোলে করিয়া মায়ের ব্রত উদ্‌যাপন দেখিবার জন্য ঠাকুরঘরে লইয়া গেলেন। গিয়া দেখি মা স্নান করিয়া আসিয়া দুই হাঁটুর উপর দুই হাত দিয়া যোগাসনে বসিয়াছেন। পূজারি ব্রাহ্মণ তাঁহার দুই হাতে ও মাথার উপরে কাদার তাল দিয়া তদুপরি জ্বলন্ত আগুনের সরা বসাইয়াছেন এবং মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সেই আগুনে ধূনার গুঁড়া নিক্ষেপ করিতেছেন, আগুন দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। মনে হইল আমার মাকে পোড়াইতে যাইতেছে। যাঁহার কোলে ছিলাম, ভয়ে তাঁহার কাঁধে মুখ লুকাইলাম। তারপর যখন একখানা ছুরির বা নরুনের অগ্রভাগ দিয়া মার বুক চিরিল এবং একটা ঝিনুকে রক্ত ধরিয়া

এক ভূর্জ্জপত্রে দুর্গার স্তব লিখিতে লাগিল, তখন আর আমাকে সে ঘরে রাখিতে পারিল না, আমি মেয়েটির কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমাকে বাহিরে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে মা আসিয়া আমাকে কোলে লইলেন, ও নানা মিষ্ট সম্বোধনে থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমার বয়স তখন চারি পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না। আমার মায়ের উনিশ বৎসর বয়সের সময় আমি হইয়াছি; সুতরাং মায়ের বয়স তখন ২৩ কি ২৪ বৎসরের অধিক নয়। ২৪ বৎসরের বালিকার ঐ মানতের কথা যখন স্মরণ করি, তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে ভাবি, এই ধর্ম্মনিষ্ঠা আমার চরিত্রে কৈ?

আমার ছয় বৎসর বয়সের সময় আমার এক ভগিনী জন্মিল। সে দেখিতে অতি সুশ্রী হইয়াছিল বলিয়া বাবা কবিত্ব করিয়া তাহার নাম 'উন্মাদিনী রাখিলেন। উন্মাদিনী বসিতে সমর্থ হইলেই আমার খেলিবার সঙ্গিনী হইল। দুই ভাই বোনে বসিয়া খেলিতাম। মা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমার মেশা পছন্দ করিতেন না। তখন পাড়ার ছেলেরা যে কি খারাপ কথা বলিত ও খারাপ কাজ করিত তাহা স্মরণ করিলে লজ্জা হয়। গালাগালি বৈ তাহাদের মুখে ভাল কথা ছিল না। অধিকাংশ ছেলে রাগিলেই তাদের মাকে "পাঁটী" বলিত। আমাদের প্রতিবেশী এক জ্ঞাতি জেঠার ছেলে-মেয়েরা মাকে এত পাঁটী পাঁটী বলিত যে তাদের একটি বোনের "মা" "মা" বলার পরিবর্ত্তে পাঁটী পাঁটী বলিয়াই কথা ফুটিল। সে মাকে না দেখিতে পাইলেও, "পাঁটী", ও "পাঁটী" করিয়া কাঁদিত। সেই কুসঙ্গের মধ্যে আমার মা যে আমাদিগকে কিরূপে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা এখন ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একবার পাড়ার এক ছেলের মুখে তার মার প্রতি বাপান্ত গালি শুনিয়া আসিয়া আমি নিজের মাকে

সেই গালি দিলাম। আর কোথায় যায়! মা আমাকে ধরিয়া দুইখানা খোলার কুচি একত্র করিয়া আমার গালের মাংস ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; রক্তে মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল! তৎপরে কয়েকদিন আহার বন্ধ হইল, মা আমার গলায় গলান ভাত ও দুধ ঢালিয়া দিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই দিন অবধি জননীর প্রতি গালাগালি আমার মুখে কেহ কখনও শোনে নাই।

উন্মাদিনীকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম; সর্ব্বদাই কাঁধে করিয়া বেড়াইতাম; কোথাও কিছু ভাল ফল বা ফুল পাইলে তাহার জন্য আনিতাম; সে সঙ্গিনী না হইলে খাইতে বসিতাম না; এবং তাহাকে ফেলিয়া একা শয্যাতে যাইতে পারিতাম না। মা সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাদের দুই ভাই বোনকে খাওয়াইয়া দিতেন; আমরা দুজনে গিয়া শয়ন করিতাম। আমার কল্পনা-শক্তি শৈশব হইতেই প্রবল, কত যে গল্প বানাইয়া উন্মাদিনীকে শুনাইতাম, এখন মনে হইলে হাসি পায়। গল্প শুনিতে শুনিতে আমার গায়ে হাত দিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িত, আমিও ঘুমাইয়া পড়িতাম।

ইহার পরে আমার কলিকাতা আসা পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে যে বিষয় স্মরণ আছে, তাহা লিখিয়া যাইতেছি। ইহাতে সময়ের ক্রম থাকিবে না, কোনও ঘটনার সাল তারিখ মনে নাই। এইমাত্র মনে আছে যে ঐকালের মধ্যে তাহা ঘটিয়াছিল। সেইরূপেই লিখিব।

গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের রাজত্বকালে দেশে কতকগুলি আদর্শ বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হয়। তাহার একটী আমাদের গ্রামে স্থাপিত হইয়াছিল। কাঁচড়াপাড়ানিবাসী শ্যামাচরণ গুপ্ত নামক একজন ভদ্রলোক তাহার প্রথম পণ্ডিত নিযুক্ত হন। মা পাঠশালের গুরুমহাশয়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া আমাকে পাঠশালা ছাড়াইয়া সেই

স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া আমি স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত বর্ণমালা ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নবপ্রকাশিত শিশুশিক্ষা পড়িতে লাগিলাম। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষায় অনেক পাঠ যুক্তাক্ষর ও কবিতার মত ছিল, সেগুলি আমার বড় ভাল লাগিত; দুই একবার পড়িলেই মুখস্থ হইয়া যাইত। ইহাতে বর্ণ-পরিচয়ের ব্যাঘাত হইত বটে, কিন্তু আমি বর্ণ মিলাইয়া মুখে মুখে কবিতা করিতে পারিতাম। এই সময়ের আর কয়েকটী বিষয় স্মরণ আছে।

মাতাঠাকুরাণীর আহার করানর গুণে আমার ভুঁড়িটি বিলক্ষণ বড় হইয়াছিল। রুগ্নাকৃতি হাত পা, কিন্তু ভুঁড়িটি বেশ গোলগাল। সেজন্য শ্যামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় আমাকে "আফিংখেকো বামন" বলিতেন; এবং আমাকে কাছে পাইলেই, দুই আঙ্গুল দিয়া আমার পেট টিপিতেন। আমি ভুঁড়ির জন্য অনেক শিক্ষকের এই পেট টেপার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। এক এক দিন স্কুলে পৌঁছিলেই পণ্ডিত মহাশয় আমার কাপড়খানি খুলিয়া মাথায় বাঁধিয়া দিতেন; এবং পেট টিপিয়া বলিতেন, "আফিংখোর বামন, তোমার মা তোমাকে কত ভরি আফিং খাওয়ান?" ফলতঃ পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বড় ভালবাসিতেন; তাহার কারণ এই, আমি ক্লাসের পড়াতে সর্ব্বদা প্রথম কি দ্বিতীয় স্থানে থাকিতাম। তাহার কারণ ছিলেন আমার মা। আমি মায়ের কাছে পড়া শিখিয়া যাইতাম। তবে আমার এইটুকু প্রশংসার বিষয় যে পড়াতে আমার মনোযোগ ছিল। মা প্রাতে উঠিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত হইতেন। আমি বইখানা হাতে লইয়া, "মা এটা কি?", "মা এ কথার অর্থ কি?" এই বলিতে বলিতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শিশুশিক্ষাতে আছে, "আ" ও "ঢ" এ "য" ফলা—উদাহরণ "আঢ্য

লোক সদা সুখী"। মা ফিরিয়া বলিলেন, "ওটা আঢ্য"। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। প্রশ্ন, "আঢ্য কাকে বলে মা?" উত্তর, "আঢ্য বড়মানুষ, যেমন গোপালবাবু" (গ্রামের একজন জমিদার)। স্কুলে পণ্ডিত মহাশয় যেই "আঢ্য" শব্দ বানান করিতে বলিলেন, অমনি সর্ব্বাগ্রে আমি বানান করিলাম, আ ও ঢয়ে য ফলা—আঢ্য, আঢ্য বল্‌তে বড়মানুষ, যেমন গোপাল বাবু। পণ্ডিত মহাশয় শুনিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হাঃ হাঃ—ও তুই কোথায় পেলি রে?" উত্তর, "কেন আমার মা বলে দিয়েছে।" এইরূপে মায়ের গুণে কোনও বালক আমাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ইহার এক ফল এই হইল যে অন্যান্য বালকেরা বাড়ীতে গিয়া নিজ নিজ মায়ের কাছে আব্‌দার আরম্ভ করিল, "শিবের মা কেমন পড়া বলে দেয়? তুই কেন দিস্ না?" মায়েরা বলিতে লাগিলেন, "আরে মলো, আমি কি লেখা পড়া জানি? শিবের মা ত ভাল জ্বালা ঘটালে!" এইরূপে আমার মা একটু লেখাপড়া জানিয়া ঘরে ঘরে গোল বাধাইয়া দিয়াছিলেন।

এই পাঠদশার স্মৃতি হৃদয়ে বড় মিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্মের কয়মাস মর্নিংস্কুল হইত। আমি পাড়ার বালকদের সঙ্গে মিলিয়া অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ফুল তুলিতে যাইতাম। কোঁচড় ভরিয়া ফুল লইয়া স্কুলে যাইতাম। জমিদারবাবুদের বাড়ীর সম্মুখে একটা চাঁপা গাছ ছিল, সেই গাছে চড়িয়া ফুল পাড়িতাম। আমি গাছে চড়িতে তত পরিপক্ক ছিলাম না। কখনই ডাংপিটে ছেলে ছিলাম না। কিন্তু পাড়ার ডাংপিটে ছেলেরা আমাকে গাছে চড়িতে শিখাইতে ক্রটী করিত না। চড়িতে ভয় পাইলে ভীরু বলিয়া উপহাস করিত, সেটা প্রাণে সহিত না।

একবারকার একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার পাড়াতে একদিন রামায়ণ গান হইল। তাহা দেখিয়া পাড়ার ছেলেরা এক রামায়ণ

গানের দল করিল। আমি গাইতে পারিতাম না, সুতরাং মূলগায়েন হইতে পারিলাম না। কিন্তু আমার উৎসাহে দলটী জমিয়া গেল। এক ছেলের গলায় একটা ঢোল, আর একজনের হাতে করতাল, মূলগায়েনের হাতে চামর দিয়া, আমরা নুপুর পায়ে দিয়া দোয়ার হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে বাড়ীতে গান গাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সে গানের মাথা মুণ্ড ভাব অর্থ কিছুই থাকিত না। পাড়ার একজন কৌতুকপ্রিয় লোক হাসাইবার মত কতকগুলো ছড়া বাঁধিয়া আমাদিগকে শিখাইয়া দিলেন, তাহাই আমরা বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়েদিগকে শুনাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মেয়েরা হো হো করিয়া হাসিয়া কে কার গায়ে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতেই আমরা পরমানন্দিত হইয়া আপনাদের শ্রম সার্থক বোধ করিতে লাগিলাম।

আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আমাদের বাড়ীর পাশে জ্ঞাতিদের বাড়ীতে এক গৌরাঙ্গী বিধবা যুবতী থাকিতেন, তিনি সম্পর্কে আমার পিতার খুড়ী। আমার মাকে অন্নদামঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত, রোমিও জুলিয়েট প্রভৃতি পড়িতে দেখিয়া তাঁর লেখাপড়া শিখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি আমাকে তাঁর ঘরে ডাকিয়া লইয়া খাইবার জন্য কিছু মিষ্টদ্রব্য হাতে দিয়া, অনেক খোসামোদ করিয়া বর্ণপরিচয় করিতে বসিতেন এবং হাতে তালি দিয়া আমাকে নাচাইতেন, আর বলিতেন "শিব নাচি নাচি যায়, শিব ডম্বুরু বাজায়, ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডম্বুরু বাজায়।" আমি তালে তালে নাচিতাম। ইহার পরে আমার সহৃদয় খুড়ী, জেঠী, দিদিরা আমাকে দেখিলেই "শিব নাচি নাচি যায়" বলিয়া আমার অভ্যর্থনা করিতেন।

আমি বোধ হয় ভিতরে ভিতরে চিরদিন প্রশংসাপ্রিয় মানুষ। এ দুর্ব্বলতাটা শৈশব হইতেই আছে। আমাদের পাশের বাড়ীতে আমার

একজন জ্ঞাতি জেঠার একটি খোঁড়া মেয়ে ছিল, সে বোধ হয় আমার অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড় ছিল। সে আমাকে ভুলাইয়া রোজ প্রাতে আমার খাবার হইতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য চাহিয়া খাইত। আমি যেই খাবারের থামীটী হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতাম, অমনি সে আমাকে মিষ্টস্বরে ডাকিত, "আগাশ দাদা! এখানে এস।" সে তাদের দাবা হইতে নামিতে পারিত না, কাজেই আমাকে যাইতে হইত। কেন যে সে আমাকে "আগাশ দাদা!" বলিত জানি না। যতই আমি তাহাদের দাবার দিকে অগ্রসর হইতাম ততই তার মিষ্ট কথার মাত্রা বাড়িত। কি লক্ষ্মী ছেলে, কি সুন্দর ছেলে, ইত্যাদি। আমি আহ্লাদে আটখানা হইয়া যেই দাবায় গিয়া উঠিতাম, অমনি সে বলিত, "এস না ভাই, দুজনের খাবার মিশিয়ে খাই।" এই বলিয়া তার থামীর খাবারগুলি আমার থামীতে ফেলিয়া থাবা থাবা করিয়া খাইতে আরম্ভ করিত। তাহাতে আমার আনন্দই হইত। হাসির কথা এই, খাবারগুলি শেষ হইলেই আর সে আমার প্রতি প্রেম দেখাইত না। সামান্য একটু কিছু মনের অনভিমত কাজ করিলেই আমাকে খামচাইয়া গালি দিয়া, দাবা হইতে নামাইয়া দিত। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে আসিতাম। মা বলিতেন, "খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে, পাঁচশ বার বলি খুঁড়ীর কাছে যাসনি, তবুও মরতে যাস।" মা বারণ করিলে কি হয়, আমি খুঁড়ীর কাছে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না; বোধ হয় প্রশংসাটুকুর লোভে। ইংরাজ কবি Cowper নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

Dupe of to-morrow even from a child.

আমিও নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি,

Duped by praise even from a child.

সে কালের আর-একটা কথা মনে আছে। একটী সুন্দর ফুটফুটে গৌরবর্ণ মেয়ে আমাদের পাশের বাড়ীতে তার মাসীর কাছে আসিত। সে আমার সমবয়স্ক। ঐ মেয়ে আসিলেই আমার খেলা-ধূলা লেখা-পড়া ঘুচিয়া যাইত। আমি তার পায়ে পায়ে বেড়াইতাম। আমরা পাড়ার বালক বালিকা মিলিয়া "চাঁদ চাঁদ কেন ভাই কাঁদ" প্রভৃতি অনেক খেলা খেলিতাম। তখন সে আমাদের সঙ্গে খেলিত। খেলার ঘটনাচক্রে যদি আমি তাহার সঙ্গে এক দলে না পড়িতাম, আমার অসুখের সীমা থাকিত না। আমি তার হাত ধরিয়া খেলার সঙ্গীদিগকে বলিতাম, "আমি এর সঙ্গে থাক্‌ব, তোমরা আমার বদলে এ দল হতে ও দলে আর কারুকে দেও।" বালকেরা আমার অনুরোধ রাখিত না, বকিয়া, ঠেলিয়া, গলা টিপিয়া আমাকে আর-এক দলে দিয়া আসিত। ঐ বালিকার বাড়ী আমাদের স্কুলের পথে ছিল। আমি স্কুল হইতে আসিবার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া একটু খেলা করিয়া আসিতাম। ইহার পর আমি যখন কলিকাতায় আসিলাম ও এখানকার পাঠাদিতে ব্যস্ত হইলাম, তখন গ্রামে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। সে দূরে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। আর বহু বৎসর তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে বড় হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পর গ্রামে গিয়া আবার তাহাকে দেখিলাম। দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম, সে প্রস্ফুটিতপুষ্পসম কান্তি বিলীন হইয়াছে! সন্তানভারে ও সংসারভারে সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মনে যে ভাব হইয়াছিল, তাহা "তুমি কি আমার সেই খেলার সঙ্গিনী" নামে একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছি। আমার যতদূর স্মরণ হয়, আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সেই কবিতাটি জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া, তাঁহার অবলা-বান্ধবে ছাপিয়াছিলেন।

আমি সেটিকে সংগ্রহ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু অবলা-বান্ধবের পুরাতন ফাইল না পাওয়াতে পারি নাই।

সে সময়কার আর-একটী কথা। আমি তখন পশুপক্ষী পুষিতে বড় ভালবাসিতাম। পুষি নাই এমন জন্তুই নাই। টুন্‌টুনি, বুল্‌বুলি, দয়েল, ছাতারে, শালিক, টিয়া, ওসকল তো পুষিয়াছি, পীঁপ্‌ড়াও পুষিতাম। ফড়িং ও পীঁপ্‌ড়া পোষা আমার একটা বাতিক ছিল। তাহাদিগকে অতি যত্নে কৌটার মধ্যে রাখিতাম। ফড়িংদিগকে কচি কচি দূর্ব্বার ঘাস খাওয়াইতাম, পীঁপ্‌ড়াদিগকে চিনি মধু প্রভৃতি খাইতে দিতাম। পীঁপড়ার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে এতই ভাল লাগিত, যে, আমি যখন ৬।৭ বৎসরের ছেলে তখনও পীঁপ্‌ড়া হইয়া চারি হাত পায় পীঁপ্‌ড়াদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম। মাছি মারিয়া খ্যাংরা কাঠির অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া সেই কাঁটা দ্বারা সেই মাছি দাবার মাটিতে পুঁতিয়া দিতাম; দিয়া কখন্ পীঁপ্‌ড়া আসিয়া মাছি ধরিয়া টানাটানি করিবে সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতাম। হয়তো আধ ঘণ্টার পর সেখানে একটী পীঁপ্‌ড়া দেখা দিল। সে প্রথমে আসিয়া মাছিটির পা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। যখন দেখিল সহজে টানিয়া লইতে পারে না, তখন চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। আমার খ্যাংরা কাঠিটার উপরে একবার উঠে, একবার নামে, বড়ই ব্যস্ত! অবশেষে সে চলিয়া গেল। আমি তার সঙ্গে সঙ্গে শুঁড়ি মারিয়া চলিলাম। সে গিয়া গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আমি দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আর আধঘণ্টা গেল। শেষে দেখি সৈন্যদল বাহির হইল। পীঁপ্‌ড়ার সারি; মধ্যে মধ্যে দুইটা করিয়া বলবান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি পীঁপড়া। পরে ভাবিয়াছি, তাহারা সেনাপতি হইবে। প্রকাণ্ড সৈন্যদল ক্রমে আমার মাছির নিকট উপস্থিত। তখন মহা টানাটানি আরম্ভ হইল। অবশেষে আমি খ্যাংরা কাঠিটি

তুলিয়া লইলাম। তখন মাছি লইয়া সকলে গর্ত্তের দিকে দৌড়িল। ইহারা ফিরিতেছে, তখন অপরেরা আসিতেছে, পথে মুখামুখী করিয়া কি সঙ্কেত করিল, যে, যাহারা আসিতেছিল তাহারাও ফিরিল। আমি মনে করিতাম, ইহারা নিশ্চয় কথা কয়। তখন মাটীর নিকটে কান পাতিয়া রহিলাম, তাহাদের শব্দ শোনা যায় কি না? কান পাতিয়া আছি, তখন কেহ শব্দ করিলে বারণ করিতাম, চুপ কর, চুপ কর, পীঁপ্‌ড়েরা কি বলছে শুনি। ইহা দেখিয়া বাড়ীর লোকেরা হাসাহাসি করিতেন। এই ব্যাপার প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিত।

তৎপরে, পাখী ধরিবার ও পুষিবার জন্য অতিশয় উৎসাহ ছিল। পাখীর বাসা হইতে বাচ্ছা চুরি করিয়া আনিতাম, আনিয়া তার মায়ের মত যত্নে তাহাকে পালন করিতাম। সে-জাতীয় পাখীরা কি খায়, তাদের মায়েরা কিরূপে খাওয়ায়, এ-সকল সংবাদ পাড়ার ডাংপিটে ছেলেদের কাছে পাইতাম, সেইরূপ করিয়া দিনের মধ্যে দশবার করিয়া খাওয়াইতাম। হাঁড়ির গায়ে ছিদ্র করিয়া, তার মধ্যে কুটিকাটি দিয়া বাসা বাঁধিয়া তার মধ্যে বাচ্ছা রাখিতাম। রাখিয়া একখানি সরা দিয়া ঢাকিয়া হাঁড়িটি ঘরের চালে ঝুলাইয়া রাখিতাম, পাছে সাপে খাইয়া যায়। তারপর খেজুর গাছের ডাল কাটিয়া, অগ্রভাগের পাতাগুলি চিরিয়া খ্যাংরার মত করিতাম; তাহাকে বলে ছাট। সেই ছাট হাতে করিয়া মাঠে মাঠে ঘাস-বনে ফড়িং ধরিতে যাইতাম। ঘাসের উপর ছাটগাছি বুলাইলেই ফড়িং লাফাইয়া উঠিত। অমনি সেই ছাট সজোরে তার পৃষ্ঠদেশে মারিয়া তাহাকে অর্দ্ধমৃতপ্রায় করিতাম। সেই অচৈতন্য অবস্থাতে তাহাকে এক বাঁশের কেঁড়ের মধ্যে পুরিতাম। এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফড়িং ধরিতাম। ধরিয়া আনিয়া পাখীকে খাওয়াইতাম। পাখীর বাচ্ছা পোষা প্রায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হইত।

বাবা তখন ছুটিতে বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি আমার পাখীপোষা দেখিতে পারিতেন না। পড়াশুনার ব্যাঘাত হয় ইহা সহিতে পারিতেন না। পাখীর বাচ্ছাকে খাওয়াইতে দেখিলেই আমাকে মারিতেন। সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে, আমাকে ঐ বাচ্ছার মায়ের কাজ করিতে হইত। পিতার হস্তে এত প্রহার খাইয়াও কিরূপে আমি তাহাদিগকে পালন করিতাম, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

মা আমার পাখী পোষার বড় বিরোধী ছিলেন না। বোধ হয় ছেলে বাড়ীতে থাকে এবং একটা কাজে ভুলিয়া থাকে, এই তাঁর মনের ভাব ছিল। কিন্তু তাঁহারও পাখী পোষার সখ ছিল। আমি চলিয়া আসিবার পরও তিনি অনেক পাখী পুষিয়াছেন।

আমি যে কেবল পাখীর বাচ্ছা পুষিতাম তাহা নহে, ধাড়ি পাখীও পুষিতাম। বড় পাখী ধরিবার তিনপ্রকার কৌশল ছিল। প্রথম, আমাদের উঠানে একটি ধামা খাড়া করিয়া তাহার সম্মুখে চাল কড়াই ছড়াইয়া, ধামার পৃষ্ঠে একগাছি বাঁকারির অগ্রভাগ লাগাইয়া, অপর প্রান্ত দাবাতে লাগাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতাম। কোনও ঘুঘু বা পায়রা বা শালিক যেই আসিয়া একমনে চাল কড়াই খাইত, অমনি বাঁকারির দ্বারা ধামাটি ঠেলিয়া তাহাকে ধামা চাপা দিতাম। দ্বিতীয়, গাছের ডালে যখন পাখীতে পাখীতে ঝগড়া ও মারামারি করিত, তখন তাহার নীচে গিয়া কাপড়ের জাল পাতিতাম। তাহারা মারামারি করিবার সময় রাগে এমন অন্ধ হয় যে, দুজনে জড়ামড়ি করিয়া পাকা ফলটির মত গাছের তলায় পড়িয়া যায়। কখন কখনও ঐরূপে আমার কাপড়ে পড়িয়া যাইত। তৃতীয়, টুনটুনি, দয়েল, প্রভৃতি ক্ষুদ্র পাখীরা যখন অন্যমনস্ক ভাবে গাছের ডালে বসিয়া থাকিত, তখন ভোঁ করিয়া তাহার পায়ের নিকটস্থ ডালে সজোরে ঢিল মারিতাম। হঠাৎ তাহাদের পায়ের নিকটস্থ

ডালে সজোরে ঢিল লাগাতে তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িয়া যাইত; আমি অমনি তাহাদিগকে ধরিতাম।

ঢিল ছোড়া বিষয়ে আমার অদ্ভুত বিদ্যা ছিল। পাখীকে বাচাইয়া ডালে ঢিল মারিতে পারিতাম। বলা বাহুল্য যে অনেক সময় ডালে ঢিল না লাগিয়া পাখীর মাথায় লাগিত এবং পাখীটার প্রাণ যাইত। এইরূপে আমার হস্তে অনেক পাখীর প্রাণ গিয়াছে। বলিতে কি, পুকুরে ব্যাঙটী ভাসিতেছে বা গাছে পাখীটী বসিয়া আছে দেখিলেই আমার ঢিল মারিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিত। শুনিলে হয়তো অনেকে হাসিবেন, এই বৃদ্ধ বয়সেও সময় সময় বৃক্ষশাখায় পাখীটি আছে দেখিয়া আমার ঢিল মারিতে ইচ্ছা করে, অমনি হাসিয়া সে ইচ্ছা নিবারণ করি।

আমার ঢিল ছেঁাড়া বিষয়ে দুইটী ঘটনা স্মরণ আছে। একবার আমার পিতার সহিত কোথায় যাইতেছিলাম। তখন আমার বয়স ১৩।১৪ হইবে। পিতা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। আমি পশ্চাৎ হইতে দেখিতে পাইলাম, আমার পিতার সম্মুখস্থিত একটি বৃক্ষের শাখাতে একটি শালিক পাখী অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া আছে। আর সে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলাম না। যে পিতাকে যমের মত ভয় করিতাম, তিনি সঙ্গে, সে কথাও মনে থাকিল না। ভোঁ করিয়া আমার ঢিলটী ছুটিল। পাখীটির কোথায় যে লাগিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু পাখীটী পাকা ফলটীর মত বাবার সম্মুখে পড়িয়া গেল। বাবা বুঝিতে পারেন নাই যে, আমি পশ্চাৎ হইতে ঢিল ছুড়িয়াছি, সুতরাং তিনি মনে করিলেন, আর কোনও কারণে পড়িয়াছে। তিনি পাখীটিকে কুড়াইয়া লইলেন। নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণীর ঘাটে লইয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগে করিয়া তার মুখে জল দিতে লাগিলেন। সুখের বিষয় পাখীটি মরিল না।

তিনি পথের একজন লোককে পাখীটি দিয়া গন্তব্যস্থানের অভিমুখে চলিলেন। আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

আর একবার আমি পথে যাইতেছি, আমার সম্মুখে আর-একজন লোক যাইতেছে। আমি দেখিতে পাইলাম দূরে আমাদের সম্মুখস্থ রাস্তার পার্শ্বে একটি ছাগল বাঁধা রহিয়াছে। অমনি ঢিল ছুড়িবার প্রবৃত্তি আসিল। বলিতে লজ্জা হইতেছে ভোঁ করিয়া এক ঢিল ছুড়িলাম। সে নিরপরাধ প্রাণী চরিতেছিল, আমার ঢিল গিয়া বোধহয় তার মাথায় লাগিল। বুঝিতে পারিলাম না, কেবল মাত্র দেখিলাম, ছাগলটি একবার ভ্যা করিয়া ডাকিয়া মাটিতে মুখ থুবড়াইয়া-থুবড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঐ দেখিয়াই আমি পশ্চাৎ হইতে চম্পট। আর-এক পথ ধরিয়া পাড়া ঘুরিয়া কিছু পরে গিয়া দেখি, কয়েকজন লোক জুটিয়াছে, ছাগলটাকে শোয়াইয়া জল ঢালিয়া বাঁচাইতেছে, বোধ হইল ছাগলটা মরিবে না।

তখন আমি যেমন পীঁপ্‌ড়ার গতিবিধি লক্ষ্য করিতাম, তেমনি পাখীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেও ভালবাসিতাম। যদি দৈবাৎ উঠানে কোনও পাখী আসিত, তাহা হইলে আমি মা, খুড়ী জেঠী যে কেহ সে সময় কথা কহিতেন, সকলের মুখ চাপিয়া ধরিতাম, "চুপ কর, চুপ কর, পাখী এসেছে।" একবার পাখী দেখিতে গিয়া হাতীর পায়ের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। তখন আমাদের গ্রামে পোলবন্দী ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের হাতী যাইত। কারণ, রেল বা রাস্তা ঘাট ছিল না। একবার আমি পাঠশালে বা স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছি; দপ্তরটী বগলে আছে; এমন সময় হঠাৎ একটী নূতন রকমের পাখী দেখিলাম, যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সে লেজ তুলিয়া চমৎকার শীস দিতেছে। আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া গেলাম, "এ কি পাখী ?" নিমগ্নচিত্তে তাহার প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। ওদিকে পোলবন্দী সাহেবের হাতী আসিতেছে।

মাহুত চেঁচাইতেছে, পাড়ার লোকেরা, "ওরে অমুকের ছেলে মলি মলি, পালা পালা" বলিয়া চেঁচাইতেছে। আমার সেদিকে খেয়াল নাই। কানে একটা আওয়াজ আসিতেছে মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ চেতনা হইতেছে না। এমন সময় হঠাৎ দেখি হাতী শুঁড় দিয়া আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। মাহুত বোধ হয় আমাকে সরাইয়া দিতে ইঙ্গিত করিতেছে। হাতীর শুঁড় দেখিয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া সরিয়া গেলাম।

আমি যে কিছু দেখিলেই এত মনোযোগী হইতাম তাহার কারণ বোধ হয় এই যে শৈশব হইতেই আমার কারণানুসন্ধিৎসা বড় প্রবল ছিল। মায়ের মুখে শুনিয়াছি যে আমি দাঁড়াইতে ও কথা কহিতে শিখিলেই সকল বিষয়ে কেন কেন বলিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতাম। যথা, তাঁহার কোলে চড়িয়া আর-এক পাড়ায় নিমন্ত্রণে যাইতেছি, হঠাৎ পথে একটি নূতন গরু দেখিলাম। অমনি প্রশ্ন—ও কাদের গরু? উত্তর—পুঁটেদের গরু। প্রশ্ন—এখানে কেন রেখে গেছে? উত্তর—ঘাস খাবে বলে। প্রশ্ন—কেন ঘাস খাবে? উত্তর—ক্ষিদে পেয়েছে বলে। প্রশ্ন—কেন ক্ষিদে পেয়েছে? উত্তর—সমস্ত রাত কিছু খায়নি বলে। প্রশ্ন—কেন খায়নি? উত্তর—ওরা রাত্রে গরুকে জাব্‌না দেয় না বলে। প্রশ্ন—কেন রাত্রে জাবনা দেয়না? উত্তর—ওরা গরীব বলে। প্রশ্ন—গরীব কাকে বলে? ইত্যাদি। সময়ে সময়ে এই কেনর মাত্রা এত অধিক হইত যে উত্তরের পরিবর্তে চপেটাঘাত পাইতাম। এই কারণানুসন্ধান-প্রবৃত্তি হইতেই বোধ হয়, পিঁপ্‌ড়ে ও পাখীর গতিবিধি এত লক্ষ্য করিতাম।

কেবল যে পাখী ভালবাসিতাম, তাহা নহে, অন্যান্য জন্তুও পুষিতাম। বিড়ালছানা আনিয়া উন্মাদিনীকে দিতাম, সে পুষিত। অনেক সময়ে আমাদের উভয়ের অতিরিক্ত প্রেমবশতঃ তাহাদের প্রাণ যাইত। বিড়ালের মধ্যে রূপীর কথা স্মরণ আছে। রূপী একটি মেনি বিড়াল

ছিল। এমন সুন্দর বিড়াল কম দেখা যায়। শাদার উপরে পেটের দুই পাশে ও মাথায় কাল দাগ। লোমগুলি পুরু পুরু, চক্ষুদুটি হরিদ্রাবর্ণ, ও লেজটি মোটা। এখন মনে করি রূপী বোধ হয় দোআঁশলা বিড়াল ছিল। কে যে তাহাকে দিয়াছিল মনে নাই। উন্মাদিনী ও আমি তাহাকে পুষিয়াছিলাম। তিনি এমনি আদুরে হইয়াছিলেন যে, উনান কাঁধায় শোয়া তাঁর পক্ষে সম্ভ্রমের হানি বোধ হইত, বিছানার উপর না হইলে তিনি শুইতেন না। উন্মাদিনী ও আমি যখন সন্ধ্যার সময় আসিয়া শয়ন করিতাম, তখন রূপী বাবা ও মার পাতের মাছের কাঁটার লোভও ত্যাগ করিয়া আমাদের দুজনের মধ্যে আসিয়া শুইত। অনেক সময় তিনজনে গলা-জড়াজড়ি করিয়া ঘুমাইতাম। মা শয়ন করিতে আসিয়া, তাহাকে মশারির বাহিরে ফেলিয়া দিতেন। ভোরে যদি কোন দিন ঘুম ভাঙ্গিত, দেখিতাম রূপী গরীব-দুঃখীর মত মশারির বাহিরে পড়িয়া আছে। তখন বড় দুঃখ হইত; তাহাকে আবার মশারির মধ্যে আনিতাম। তাহা লইয়া মাতাপুত্রে বিবাদ হইত।

আমাদের তখনকার আর-একজন খেলার সঙ্গীর কথা স্মরণ আছে। সে শেয়ালখাকী। শেয়ালখাকী একটা মাদী কুকুর। তাহার ইতিবৃত্ত এই। আমার বাবা একদিন দেখিলেন একটি কুকুরের বাচ্ছাকে শেয়ালে লইয়া যাইতেছে। দেখিয়া তাঁর দয়ার আবির্ভাব হইল। তিনি হৈ হৈ করাতে ও ঢিল ঢেলা মারাতে শেয়ালটা বাচ্ছাটাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। বাবা বাচ্ছাটা কুড়াইয়া আনিলেন, সে তখন অতি শিশু। তাহার পৃষ্ঠের শেয়ালের কামড়ের ঘা শুকাইতে অনেক দিন গেল। সে বড় হইল, বাবা তাহার নাম শেয়ালখাকী রাখিলেন। শেয়ালখাকী আমাদের বাড়ীতেই রহিয়া গেল, এবং পাড়ার বালক-বালিকার খেলিবার একটা মস্ত সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। এখন আমার ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়, আমরা

শেয়ালখাকীকে আমাদেরই একজন ভাবিতাম। সে সকল খেলাতেই সঙ্গে থাকিত। আমরা পাড়ার বালক বালিকাদের সঙ্গে মিশিয়া কখন কখন বন-ভোজনে যাইতাম। পাড়ার নিকট কোনও জঙ্গলময় স্থান পরিষ্কার করিয়া সেখানে উনান করিয়া প্রত্যেকের বাড়ী হইতে কাঠ কুটা চাল ডাল বহিয়া লইয়া যাইতাম। বালিকারা রাঁধিত, বালকেরা হইত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, এবং তাহাদের মা খুড়ী জেঠীরা হইতেন অতিথি। পরম সুখে বনভোজন হইত। শেয়ালখাকী আমাদের সঙ্গে সমস্ত দিন বনে থাকিত। আহারান্তে আমরা যখন বনে লুকোচুরি খেলিতাম, তখন শেয়ালখাকী বনের মধ্যে লুকাইত, আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতাম। আমরা তাহাকে খেলার সঙ্গী বলিয়া জানিতাম।

শেয়ালখাকীর দুইটি কীর্ত্তি স্মরণ আছে। একবার আমরা কয়েকজন বালকে পরামর্শ করিলাম যে প্রতিবেশীদের একটা পুরাতন ভাঙ্গা দালানে ঢুকিয়া পায়রা ধরিব। ঐ দালানের মধ্যে অনেক পায়রা থাকিত। আমরা মধ্যে মধ্যে ঘরে ঢুকিয়া দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া তাড়া দিয়া পায়রা ধরিতাম। কিন্তু দ্বার জানালা ভাঙ্গিয়া তাহাতে এত গর্ত্ত হইয়া-গিয়াছিল যে সেগুলি বন্ধ করিবার জন্য প্রায় পাঁচ-ছয়জন বালককে ঘরে প্রবেশ করিতে হইত। দরজা জানালার গর্ত্তে গর্ত্তে পিঠ দিয়া এক-একজন বালক দাঁড়াইত, আর একজন পায়রাদিগকে তাড়াইয়া ধরিত। সেদিন আমাদের পাঁচজনের মধ্যে চারিজন বৈ জুটিল না। আমরা আর-একটি বালক খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে দেখি শেয়ালখাকী আসিতেছে। শেয়ালখাকীকে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম, ভাবিলাম আর বালকের প্রয়োজন নাই শেয়ালখাকীর দ্বারাই কাজ চলিবে। বলিলাম "শেয়ালখাকি! আয় আয় পায়রা ধরিতে যাই।" শেয়ালখাকী অমনি প্রস্তুত! আমাদের সঙ্গে চলিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া এক

একজন বালক এক এক ছিদ্রে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের নীচে চৌকাঠের উপরে একটা ছিদ্র ছিল, শেয়ালখাকীকে বলা গেল, "শেয়াল-খাকি! এই গর্ত্তের মধ্যে লেজ দিয়ে বসে থাক্, দেখিস যেন এ জায়গা ছেড়ে উঠিস্‌নে।" তখন আশ্চর্য্য বোধ হয় নাই, এখন যতবার ভাবি আশ্চর্য্য বোধ হয়, শেয়ালখাকী কিরূপে আমাদের কথা বুঝিল। সেই ছিদ্রের মধ্যে লেজ দিয়া নিজের পিঠের দ্বারা ছিদ্রটি ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। পরে পায়রাদিগকে যখন তাড়া দিতে আরম্ভ করা গেল এবং পায়রাগুলি তার মুখের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল, তখন না জানি শেয়াল-খাকীর স্থান ত্যাগ করিয়া পায়রার সঙ্গে জুটিবার কি প্রলোভনই হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে তা করিল না; আমরা যেরূপ পিঠ দিয়া ছিদ্র ঢাকিয়া স্থির থাকিলাম, সেও সেই প্রকার রহিল।

আর একটি ঘটনা এই।—আমাদের বুধী বলিয়া একটা গাভী ছিল। তাহার একটি রাখাল ছিল। শেয়ালখাকী অনেক সময় রাখালের সঙ্গে বুধীকে লইয়া মাঠে যাইত। সমস্ত দিন মাঠে থাকিয়া বৈকালে ঘরে আসিত। একবার বাবা কি কারণে রাগ করিয়া রাখালটাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তখন বুধী ঘরে বাঁধা পড়িল। তাকে চরায় কে? এইরূপ দুই-একদিন গেল। পরে আমি বলিলাম, "বাবা, শেয়াল-খাকীকে দিলে সে গরু চরিয়ে আন্‌তে পারে।" শুনিয়া বাবা হাসিলেন, "হাঁ, কুকুরে আবার গরু চরাবে?" মা শেয়ালখাকীকে চিনিতেন, তিনি তখন আমার কথাতে যোগ দিলেন। তখন শেয়ালখাকীর সঙ্গে গরু পাঠান স্থির হইল। কেমন করিয়া গরু চরাইতে হইবে তাহা শেয়ালখাকীকে বুঝাইয়া দেওয়া গেল। সে গরু লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। একদিন সন্ধ্যা হইয়া গেল, গরু আর আসে না। বাবা ও মা চিন্তিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে দেখা গেল যে, একা শেয়ালখাকী মহা চীৎকার

করিতে করিতে আসিতেছে; সঙ্গে গরু নাই। আসিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া চীৎকার করে, একটু দৌড়িয়া যায়, আবার দাঁড়ায়, আবার নিকটে ছুটিয়া আসে, মুখের দিকে চায়, ডাকে, আবার দৌড়িয়া যায়, আবার দাঁড়ায়। শেষে বাবা বুঝিলেন যে আমাদিগকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছে। তখন আমাদের দুইজন বালককে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। আমরা সঙ্গে গিয়া দেখি একজনেরা আমাদের গরু বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহারা শেয়ালখাকীকে দেখিয়া বলিতে লাগিল— "ওরে কুকুরটা আবার এসেছে; নিজে মার খেয়ে গিয়ে বাড়ীর লোক ডেকে এনেছে।"

এই শেয়ালখাকীর ন্যায় আরও অনেকবার অনেক কুকুর পুষিয়াছি।

সে সময়কার আর-একটা অদ্ভুত কথা আছে। অনুমান চারি-পাঁচ বৎসর বয়সের সময় আমি কোন মতেই ঠাকুরদের নিবেদিত অন্ন আহার করিতে চাহিতাম না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাটীতে এটা একটা ভয়ানক কথা। কে যে আমার মাথাতে এ সংকল্প ঢুকাইয়া দিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বেশ মনে আছে যে প্রায় প্রতিদিন আমার ভাত খাওয়া লইয়া একটা মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইত। আমাদের বাড়ীতে শালগ্রাম শিব পঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পৈতৃক ঠাকুর ছিলেন। প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্জন তাঁহাদের অগ্রে নিবেদন না করিয়া কাহারও আহার করিবার অধিকার ছিল না। আমারও ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল ঠাকুরদের নিবেদিত অন্ন আহার করিব না। এজন্য বাবার ও মার হাতে গুরুতর প্রহার সহ্য করিতাম, তবুও নিজের জেদ ছাড়িতাম না। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া এই নিয়ম করা হইয়াছিল, যে, আমার অন্নগুলি স্বতন্ত্র রাখিয়া, অপর অন্ন ঠাকুরদের নিবেদন করা হইত। কিন্তু আমার পিতামাতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর থাকিত না। অধিকাংশ সময় ঠাকুরদের নিবেদনের পূর্বে

আসিয়া আমি বাহিরের দাবাতে আহার করিতে বসিতাম। কোনও কোনও দিন বাবা কৌতুক দেখিবার জন্য রান্নাঘরের ভিতর হইতে অন্ন নিবেদন করিয়া ঠাকুর লইয়া যাইবার সময় দাবার এক প্রান্তে যে আমি আহারে বসিয়াছি, আমার পাতে ঠাকুরদের কুশীর জল ছড়াইয়া দিতেন। অমনি, 'ভাত আমি খাব না,' বলিয়া আমি হাত তুলিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিতাম, মা আসিয়া অনেক বুঝাইতেন, কিছুতেই খাওয়াইতে পারিতেন না। শেষে বড়পিসীদের বাড়ী হইতে আমাকে খাওয়াইয়া আনিতে হইত। কারণ তাঁহাদের বাড়ীতে ঠাকুর-টাকুর ছিল না। এই ব্যাপার লইয়া আমার মাকে পাড়ার মেয়েদের নিকট বড় লজ্জা পাইতে হইত। তাঁহারা বলিতেন, "তোমার পেটে এ কি কালাপাহাড় এসেছে?" তখন মা তাঁহাদিগকে নিজের একটি স্বপ্নের কথা বলিয়া বলিতেন, "আমি জানি ও ছেলে জাতহরণীতে হরে নিয়েছে।" সে স্বপ্নটি এই। আমাদের এতৎ প্রদেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সংস্কার আছে যে, সূতিকাগৃহে ছয়দিনের রাত্রে শিশুকে মাটিতে শোয়াইতে নাই, প্রসূতিকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। মাটিতে শোয়াইলে জাতহরণীতে হরিয়া লইয়া যায়। তদনুসারে আমি যখন ছয়দিনের ছেলে সেদিন রাত্রে মা ধাইয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন যে অর্দ্ধেক রাত সে আমাকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবে, আর অর্দ্ধেক রাত মা নিজে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবেন। তদনুসারে ধাই অর্দ্ধেক রাত্রি রহিল, পরে মার পালা আসিল। মা কিয়ৎকাল বসিয়া নিদ্রাতে অভিভূত হইলেন। মনে করিলেন, শুইয়া ছেলে বুকের উপর শোয়াইয়া ঘুমাইবেন, মাটিতে না শোয়াইলেই হইল। এই ভাবিয়া আমাকে বুকের উপর শোয়াইয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, একটি রূপলাবণ্যসম্পন্না নারী, সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে ছেলেটি নিজ কোলে তুলিয়া

লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কে? আমার খোকাকে কোথায় নিয়ে যাও?" স্ত্রীলোক হাসিয়া বলিল, "বাঃ, এ যে আমার খোকা।" মা বলিলেন, "না, আমার খোকা।" মেয়েটি বলিল, "না, আমার খোকা"। এই বিবাদে মার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখেন আমি বুক হইতে সরিয়া পড়িয়াছি। এই স্বপ্নের কথা চিরদিন মার মনে জাগিয়া রহিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল আমাকে জাতহরণীতে হরিয়াছে বলিয়া কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছি। মার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিলাম।

সর্ব্বশেষে আমার প্রপিতামহকে এই কালের মধ্যে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি। এ বিষয়ে অগ্রে কিছু বলিয়াছি, কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুক্তি করিব। আমি আমার জ্ঞানে তাঁহাকে অন্ধ বধির ও তাঁহার গৃহে আবদ্ধই দেখিয়াছি। আমি চলিতে বলিতে শিখিলেই তাঁহাকে ধরিয়া ঘরের বাহির করা, শৌচে লইয়া যাওয়া, তাঁহার মুখ ধুইবার জল আনিয়া দেওয়া, কাপড় আনিয়া দেওয়া, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের ভার আমার প্রতি অর্পিত হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি আমাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। আমি তাঁহাকে সরু গলাতে "পো" বলিয়া ডাকিলেই তিনি পুলকিত হইয়া উঠিতেন। কোনও কাজে আমার দরকার হইলেই আমাকে "বাবা" "বাবা" বলিয়া ডাকিতেন। সর্ব্ববিষয়ে আমাকে অতিরিক্ত আদর দিতেন। মা আমাকে মারিলে আমি কাঁদিতাম। আমার ক্রন্দনের স্বর যদি তাঁহার কানে যাইত তাহা হইলে "বাবা কাঁদে কেন?" বলিয়া রাগিয়া কাটাকাটি করিতেন। এইজন্য মা মারিলেই আমি আকাশ-পাতাল হাঁ করিয়া পোর নিকট গিয়া কাঁদিতাম। তৎপরে, পো অধ্যাপক ছিলেন, বাড়ীতে বসিয়া বিদায় আদায় যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই সুখে সংসার চলিত।

কখনও কখনও গ্রামের বিষয়ী লোকদিগের গৃহে ক্রিয়া কর্ম্ম হইলে, পোর জন্য বিদায়ের ডালি আসিত। ডালির অর্থ একখানি সরাতে একটু চিনি ও দশ বারটা সন্দেশ, তৎসহ একটি ঘড়া, কি একটা গাড়ু, কি কতকগুলি মুদ্রা। আমি বাহিরে খেলা করিতে করিতে যদি দেখিতাম যে ডালি আমাদের ভবনের অভিমুখেই যাইতেছে, তখনি সঙ্গ লইতাম। প্রপিতামহ মহাশয় বাহির বাড়ীর দিকে এক রকে বসিয়া জপ করিতেন। লোকে ডালিটী সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ছুঁয়াইয়া দিত। তিনি বুঝিতেন যে ডালি আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতেন, "কার বাড়ী হতে"। ডালি-বাহক চীৎকার করিয়া নামটা বলিয়া দিত। তখন পো আমাকে ডাকিতেন "বাবা!" আমি অমনি ছোট ছোট অঙ্গুলিতে তাঁহার গা ছুঁইয়া দিতাম; ভাবিতাম বেশি চেঁচাইলে মা শুনিতে পাইবেন। প্রপিতামহ বুঝিতেন বাবা উপস্থিত। টাকাগুলি নিজের কাছে রাখিয়া বলিতেন, "এই সন্দেশের সরা মাকে দিয়া দেও।" বাবা তো সরাখানি লইয়া একান্তে দাঁড়াইয়া অধিকাংশ সন্দেশ খাইলেন, শেষে রান্নাঘরের কাছে গিয়া বলিলেন, "মিত্রের বাড়ী থেকে ডালি এসেছিল, ঐ সে সরা।" এই বলিয়াই রান্নাঘরের দাবাতে সরাখানি রাখিয়াই দৌড়। মা রাগিয়া পোর নিকট আসিয়া বকাবকি করিতেন। বলিতেন, "আমাকে কি ডাক্‌তে পার না? বড় যে বাবা বাবা কর, ঐ বাবা সব সন্দেশ খেয়ে ফেলেছে।" প্রপিতামহ মহাশয় শুনিয়া হাসিয়া উঠিতেন, "হাঃ হাঃ বেশ করেছে, ওর জন্যই ত সব।" যখন সরাখানি আমার হাতে না পড়িয়া মায়ের হাতে পড়িত, তখন পো হাত দিয়া সন্দেশগুলি গণিয়া রাখিতেন। তারপর তাঁকে প্রতিদিন কয়টা করিয়া সন্দেশ দেওয়া হইত তাহা গণিতেন। যদি দেখিতেন অধিকাংশ তাঁকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে কাটাকাটি করিতেন, "আমাকে যদি সব দিলে তো বাবা খেলে কি?"

এ-সকল লিখিতে আমার চক্ষে জল আসিতেছে। হায়! তখন আমি তাঁর এতটা প্রেম বুঝি নাই।

আমাদের বাড়ীতে প্রায় ২।৩টা বিড়াল থাকে। সে সময় একটা কদাকার বিড়াল ছিল। সে কদাকার বলিয়া মা তাকে "হনুমান" বলিয়া ডাকিতেন। আমরাও হনুমান বলিতাম। হনু বড় চোর ছিল। আমার পোর পাতের মাছ চুরি করিয়া খাইত ; তিনি দেখিতে পাইতেন না। এইজন্য মা প্রথম প্রথম পোকে আহারে বসাইয়া বামহস্তে একগাছি ছড়ি দিয়া আসিতেন। বলিয়া আসিতেন, "মধ্যে মধ্যে বাড়ি গাছটা আপ্‌সো, বেড়াল আসে।" পো মধ্যে মধ্যে ছড়ি গাছটা লইয়া উদ্দেশে মারিতেন। একদিন দেখা গেল, হনুমান লম্বা হইয়া পোর পাত হইতে চুরি করিয়া মাছ খাইতেছে, পো উদ্দেশে ছড়ি মারিতেছেন, সে ছড়ি হনুর পৃষ্ঠে চপ চপ করিয়া পড়িতেছে, হনুর গ্রাহ্যই নাই। তাহার পর হইতে মা আমাকে পোর পাতের নিকট ছড়ি হস্তে বিড়াল তাড়াইবার জন্য বসাইয়া রাখিতেন। তাহার পর আর বিড়াল আসিতে পারিত না। কিন্তু একদিন যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে হাসিও পাইতেছে, লজ্জাও হইতেছে। সেদিন আমি বসিয়া আছি, পো আহার করিতেছেন। শুক্ত, ডাল, মাছের ঝোল, একে একে সব খাইলেন। আমি ঠিক বসিয়া আছি, কিছুই বিভ্রাট ঘটিল না। কিন্তু শেষে যখন দৈ কলা ও সন্দেশ দিয়া ভাত মাখিলেন, তখন এই পেটুকের পক্ষে স্থির থাকা কঠিন হইল। অলক্ষিতে ক্ষুদ্র হস্তে এক এক থাবা ভাত গালে তুলিতে লাগিলাম। আমার প্রপিতামহের নিয়ম ছিল যে আহারে বসিয়া কথা কহিতেন না। এ নিয়ম তিনি ৮ বৎসর হইতে ১০৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। আর একটা নিয়ম এই ছিল যে, আহারের সময় কেহ স্পর্শ করিলে আহার হইতে বিরত হইতেন। আমার

ক্ষুদ্র হাতের থাবা উঠিতেছে উঠিতেছে, একবার হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। অমনি পো শিহরিয়া মাকে ইসারাতে ডাকিতে লাগিলেন। "উঁ, উঁ!" মা আসিয়া দেখেন পেটুক পুত্রটির হাতে মুখে দৈয়ের দাগ, আর লুকাইবার জো নাই। পোর কাণে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আর উঁ কি? ঐ বাবা! বড় যে আদর দেও।" শুনিয়া প্রপিতামহ মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, "হা হা বেশ করেছে, তবে ওই সব খাক্।" বলিয়া আহার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বন্দোবস্ত মার সহ্য হইল না। তিনি আমার গলা টিপিয়া থাবড়া দিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন, "আচ্ছা ত বেরাল তাড়াতে বসিয়েছি, নিজেই বেরাল হয়েছে।"

আমার শৈশবে আমার মাতৃদেবীর ও আমার প্রপিতামহের যে ধর্ম্মভাব দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে। আমাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য মার ইষ্টদেবতার নিকট মানতের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাই কেবল নহে। ধর্ম্মসাধন তাঁর প্রতিদিনের প্রধান কার্য্য ছিল। মাটী দিয়া শিব গড়িয়া নিত্য পূজা করিতেন। সে পূজাতে অনেকক্ষণ থাকিতেন; খাবার অন্ন ঠাকুরদিগকে নিবেদন না করিয়া কাহাকেও খাইতে দিতেন না; তারপর বিশেষ বিশেষ দিনে ব্রত নিয়ম উপবাসাদি চলিত; প্রতিদিন পূজার ফুল আনিয়া আমার মাথায় দিতেন এবং নিজের পদধূলি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন।

প্রপিতামহদেবের ধর্ম্মভাবও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি জপ তপ পূজাদিতে প্রতিদিন প্রাতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় যাপন করিতেন। প্রথমতঃ প্রায় একঘণ্টা কাল দেব-দেবীর পূজন ও জপ প্রভৃতিতে যাইত; তৎপরে প্রায় আধঘণ্টা কাল পিতৃপুরুষের তর্পণে অতিবাহিত হইত। তৎপরে প্রায় আধ ঘণ্টাকাল মাটীতে মাথা ঠুকিয়া ইষ্টদেবতার চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা হইত। এই প্রণাম করিয়া করিয়া তাঁর কপালের

উপরে একটা আবের মত মাংসের গুলি জমিয়াছিল। মাথা ঠুকিয়া যখন প্রার্থনা করিতেন, তখন আমার মা কান পাতিয়া কোনও কোনও দিন শুনিতেন। তাঁর মুখে শুনিয়াছি তিনি বলিতেন, "মা মা! হারুর সুমতি করে দাও।" তাহা আমার বাবার জন্য প্রার্থনা। সর্ব্বশেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া করতালি দিয়া নাচিতেন। নাচিবার সময় আমার ডাক হইত, "বাবা।" বাবা আমি তখন দিগম্বরমূর্ত্তি বালক, মা আমাকে খেলার ভিতর হইতে ধরিয়া আনিতেন। এবং প্রপিতামহের হাতে হাত দিয়া নাচিতে বলিতেন। অমনি দুইজনে হাতে হাতে ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ হইত। তিনি তিনশত পঁয়ষট্টি দিন নাচিবার সময় একই গান করিতেন, তাহার দুই পংক্তি মাত্র আমার মনে আছে।

"দুর্গা দুর্গা বল ভাই
দুর্গা বই আর গতি নাই।"

এই গান প্রতিদিন।

মা প্রপিতামহদেবকে আমার ধর্ম্মশিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাই তিনি আমাকে লইয়া প্রাতে নাচিতেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আমাকে কোলে লইয়া বসিয়া মুখে মুখে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, দেবতাদের স্তব প্রভৃতি শিখাইতেন, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়-সকল শিখাইতেন। যথা—প্রপিতামহের নাম কি? প্রশ্ন করিয়াই তদুত্তরে বলিতেন—বল—"শ্রীরামজয় ন্যায়ালঙ্কার।" আমি বাল্যস্বরে বলিতাম—শ্রীরামজয় ন্যায়ালঙ্কার। ইত্যাদি, ইত্যাদি। তৎপরে দেব-দেবীর যে-সকল স্তব মুখস্থ আবৃত্তি করিতেন এবং আমাকে আবৃত্তি করাইতেন তাহার সকলগুলি মনে নাই; একটী মনে আছে, তাহা এইঃ—

সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।
স্মরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্তুতে॥

আর-একটা কথা স্মৃতিতে আছে। আমি জ্বরে পড়িলে বা অন্য কোনও প্রকার পীড়াতে আক্রান্ত হইলে আমার মা সন্ধ্যাকালে আমাকে লইয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া দিতেন; এবং পীড়ার কথা জানাইতেন। তৎপরে প্রপিতামহদেব আমার দেহে হাত বুলাইয়া ঝাড়িতে আরম্ভ করিতেন, ও সমগ্র দেহে ফুৎকার দিতেন, ও মুখে মুখে ইষ্টদেবতার স্তব আবৃত্তি করিতেন। আমার বোধ হয়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই ঝাড়িয়া দেওয়াতে অনেক সময়ে আমার জ্বর সারিয়া যাইত। এইজন্য জ্বরে, আমার গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইলেই আমি "পোর কাছে নে যা," বলিয়া কাঁদিতাম।

এই সাধু ও সিদ্ধ পুরুষের স্মৃতি আমাদের পরিবারে জীবন্ত রহিয়াছে। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন যাহা কিছু আছে, আমাদের গৃহে যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইতেছে। সে-সকলকে সকলেই পবিত্র চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ব্রাহ্ম হইয়া উপবীত ত্যাগের পর, আমার একবার যক্ষ্মারোগের সূচনা হয়; তখন আমার জননী আমার পরিচর্য্যার জন্য কলিকাতা আসিয়া আমাকে লইয়া কয়েক মাস ছিলেন। তিনি আমার পূজ্য পো-ঠাকুরদাদার লাঠি, যোগপট্ট ও মালা আনিয়া আমার শয্যাতে রাখিয়াছিলেন; বিশ্বাস এই ছিল, তাহার গুণে আমি রোগমুক্ত হইব। তিনমাস কাল ঐ-সকল দ্রব্য আমার শয্যা হইতে সরাইতে দেন নাই। তৎপরে এলোক হইতে যাইবার সময় পোর জপের মালা আমার ভগিনীকে ও তাঁর আহারের বাটি আমাকে দিয়া গিয়াছেন, আমি প্রতিদিন তাহা ব্যবহার করিতেছি।

আমি আর কি বলিব, তাহার পর বহুবৎসর চলিয়া গিয়াছে, অনেক মানুষ দেখিয়াছি, নিজে অনেক ভ্রম প্রমাদ করিয়াছি, কিন্তু যখনই সেই সাধুপুরুষের সেই ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করি, তখনই নিজের

দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া লজ্জাতে অভিভূত হইয়া যাই। বহুবর্ষ পরে যখন আমার মা কাঁদিয়া বলিতেন, "হায় রে, এমন সাধু পুরুষের এত আশীর্ব্বাদ কি বৃথা গেল?" তখন আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিতাম না। মনে মনে বলিতাম, "হায়রে, তিনি তাঁর ইষ্টদেবতাকে যেমন অকপটে মা বলিতেন, আমি কেন তেমন করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে পারি না?"

ক্রমে আমি নবম বৎসরে আসিয়া উপনীত হইলাম। নবম বৎসরে আমার উপনয়ন হইল। উপনয়নান্তে পো নিজে আমাকে সন্ধ্যা আহ্নিক শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং নিজের নিকট লইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা করাইতে লাগিলেন।

ইহার অল্প দিন পরেই, বাবা আমাকে কলিকাতায় আনিলেন। সেদিনকার কথা আমি ভুলিব না। আমি মায়ের এক ছেলে; বাছুর লইয়া গেলে গাভী যেমন হাম্‌লায়, তেমনি আমার মা সেদিন হাম্‌লাইতে লাগিলেন। আমি বাবার সঙ্গে চলিয়া আসিলাম, তিনি পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দন কোনও দিন ভুলিব না। উন্মাদিনী চিন্তা-দাসীর সঙ্গে শাল্‌তী-ঘাট পর্য্যন্ত আমাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। যখন সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"পাগ্‌গা দাদা, [অর্থাৎ পাগ্‌লা দাদা,] আমার জন্যে পুতুল এনো," তখন আমি কাঁদিয়া অধীর হইলাম। সে চলিয়া গেল, আমার মনে হইল, আমার বুকের হাড় খুলিয়া লইয়া গেল। আমি পিতার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিলাম।

এই স্থানে দুইটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। প্রথম, চিন্তাদাসীর বিবরণ। ১৮৩৩ সালে কলিকাতার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে ভয়ানক সাইক্লোন হয়। তাহা কলিকাতা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ ঝড়ে সমুদ্রতরঙ্গ উঠিয়া সুন্দরবনের অভ্যন্তরবর্ত্তী প্রদেশ-

সকলকে প্লাবিত করে। সেই প্লাবনে যখন গরীব লোকের কুঁড়ে-ঘর ভাসিয়া যায়, তখন হাজার হাজার পুরুষ ও রমণী জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ নিজ নিজ ঘরের চালের উপরে আশ্রয় লইয়া প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বিভাগে ভাসিয়া আসে। এইরূপে অনেক পুরুষ ও নারী ভাসিয়া আসিয়া আমাদের গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিল। তৎপরেই তাহারা বিষম কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করে। এই ভাসা কাঙ্গালীদের মধ্যে চিন্তা নামে এক নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক আসিয়া আমাদের বাড়ীতে শরণাপন্ন হয়। আমার পিতামহ দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে বাড়ীতে স্থান দেন। চিন্তা আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া যায় এবং আমার বড়পিসীর পরিচারিকা হয়। আমার বড়পিসীর ছেলেমেয়েরা মাতার গর্ভ হইতে চিন্তা-দাসীর ক্রোড়েই পড়িয়াছেন, ও তাহার ক্রোড়েই প্রতিপালিত হইয়াছেন। আমিও মাতুলালয় হইতে আসিয়া চিন্তার ক্রোড়ে আশ্রয় পাই। আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই দেখিতাম যে চিন্তাই আমাদের হর্ত্রী কর্ত্রী। আমরা তাহাকে দাসী বলিয়া মনে করিতাম না। চিন্তা দিদি বলিয়া ডাকিতাম। চিন্তা সকল কার্য্যেই পটু ছিল। বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত; জাল, পোলো প্রভৃতি লইয়া গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী খাল হইতে মাছ ধরিয়া আনিত; গো দোহন করিত; বাজার হাট করিত, ধান ভানিত, সর্ব্বোপরি আমাদের প্রতি কেহ কোনও অত্যাচার করিলে বাঘিনীর ন্যায় তার ঘাড়ে গিয়া পড়িত। চিন্তার প্রতাপে পাড়ার লোক সশঙ্কিত থাকিত। চিন্তা এমন সুস্থ ও সবল ছিল যে প্রাতে উঠিয়া ১৮।১৯ মাইল হাঁটিয়া আমার মাতুলালয়ে তত্ত্ব লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল না।

সেই শৈশবকালে চিন্তাদাসী বোধ হয় আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিল, যে, আমাদের বাটীর সম্মুখস্থ নারিকেলের গাছ রাত্রিকালে দেশ ভ্রমণ

করে। এক ডাকিনী তাহাতে চাপিয়া বেড়াইতে যায়। ইহাতে আমাদের শিশুদলে মহাভয় হইয়াছিল পাছে আমাদের নারিকেলগাছ হারাইয়া যায়, কি জানি ডাকিনী যদি কোথাও ফেলিয়া আসে। চিন্তাদাসী ইহা বলিয়া দিয়াছিল, গাছের গায়ে লোহা মারিয়া রাখিলে ডাকিনীতে গাছ লইতে পারে না। আমার স্মরণ হয়, আমরা কয়েক জন শিশুতে মিলিয়া সন্ধ্যার-পূর্ব্বে গাছের গায়ে গজাল মারিয়া রাখিয়াছিলাম।

এ সময়ের আর-একটী বিষয় স্মরণ আছে। হার্ডিঞ্জ বাঙ্গালা স্কুল স্থাপনের পরেই আমাদের গ্রামে এক ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। হরিদাস দত্ত নামে জমিদার-বাবুদের বাড়ীর একজন যুবক তখন দেশে শিক্ষা-বিস্তার-বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন। ইনি অল্পদিন হইল পরলোকগত হইয়াছেন। অনুমান করি প্রধানতঃ ইঁহার ও ইঁহার বন্ধুদিগের যত্নে ও জমিদার-বাবুদের সাহায্যে ঐ ইংরাজী বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। আমার মনে আছে যে সেই স্কুলে একজন ইংরাজ হেডমাষ্টার লওয়া হইয়াছিল। সেটা গ্রামবাসীদের পক্ষে এক নূতন ব্যাপার। সাহেবের সঙ্গে এক কুকুর স্কুলে আসিত, সে সাহেবের টেবিলের তলায় শুইয়া থাকিত। আমরা তাহাকে দেখিয়া বড় ভয় পাইতাম। সাহেব জমিদার-বাবুদের এক বাগান-বাড়ীতে থাকিতেন। আমরা তাঁর পালিত মুরগী ও অন্যান্য পাখী দেখিবার জন্য গিয়া সেই বাগানে উঁকি ঝুঁকি মারিতাম। সাহেবকে রাস্তায় দেখিলে সে পথ হইতে অন্তর্ধান করিতাম। ইহাতেই প্রমাণ, আমাদের গ্রামে নূতন সভ্যতার আলোক আমার বাল্যদশাতেই প্রবেশ করিয়াছিল। কেবল তাহা নহে; হরিদাস দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন যুবকের উৎসাহে "মজিলপুর পত্রিকা" নামে একখানি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, এবং কিছুদিন চলিয়াছিল। তদ্ভিন্ন ব্রজনাথ দত্ত নামে আমাদের গ্রামে একজন মধ্যাবস্থ

বিষয়ী লোক ছিলেন। জ্ঞান-চর্চ্চাতে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, জ্ঞানী মানুষদিগকে লইয়া সর্ব্বদা জ্ঞানালোচনা করিতে ভালবাসিতেন। শুনিয়াছি তিনি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লইতেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবকৃষ্ণ দত্ত মজিলপুর পত্রিকার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন এবং গ্রামের উন্নতি-বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন। শুনিয়াছি তিনিই গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রবিষ্ট করেন এবং আমার ভক্তি-ভাজন স্বগ্রামবাসী গুরুস্থানীয় উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী করেন। এই শিবকৃষ্ণ দত্ত ইহার কিছুদিন পরে লুক্রিসিয়ার উপাখ্যান বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করেন এবং বাঙ্গলা কাব্য বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হন। পরে ইনি উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই বহুদিন পরে গতাসু হন। ইঁহার উন্মাদ রোগ সম্বন্ধে একটি স্মরণীয় কথা আছে। ইঁহার পিতা ব্রজনাথ দত্ত জ্ঞানানুরাগী ও গুণীগণের উৎসাহদাতা মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় সিদ্ধি খাইতেন। লোকে যেমন ঘরের দেওয়ালে গোবরের ঘুঁটে দিয়া রাখে, তেমনি তিনি তাঁহার বৈঠক-ঘরে দেওয়ালে ছোট ছোট ঘুঁটের মত সিদ্ধি দিয়া রাখিতেন, মধ্যে মধ্যে তাহা লইয়া নিজে খাইতেন এবং বন্ধুদিগকে খাইতে দিতেন। আশ্চর্য্য এই দেখা গেল ইঁহার কয়েকটি সন্তান পাগল হইয়া গেল। ইঁহার অতিরিক্ত সিদ্ধি পান ও ভোজন তাহার কারণ হইতে পারে। যাহা হউক আমার শৈশবে ও আমার গ্রাম ত্যাগ করিবার সময়ে, আমাদের গ্রাম শিক্ষাদি বিষয়ে ২৪ পরগণার দক্ষিণ প্রদেশে একটা অগ্রগণ্য গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮৫৬ সালের আষাঢ় মাসে বাবা আমাকে কলিকাতায় আনিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে আমাকে ডেভিড হেয়ারের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া ইংরাজী শিখাইবেন; কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন যে তিনি সংস্কৃত শিক্ষাতে এত বৎসর দিয়াও এবং কলেজ হইতে সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও ২৫ টাকার অধিক বেতন পাইলেন না। সুতরাং বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজীর গন্ধ না হইলে কাজকর্ম্ম পাইবার সুবিধা নাই। কিন্তু তাঁহার অবস্থাতে তাহা করিতে দিল না। তিনি তখন বর্দ্ধমান জেলায় আমদপুরে পণ্ডিতি করিয়া আসিয়া কলিকাতা বাঙ্গলা পাঠশালাতে ২৫ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম্ম করিতেন। অতএব পুত্রকে উৎকৃষ্টরূপে ইংরাজী শিখাইবার যে বাসনা ছিল, তাহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। কেবল তাহাই নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ; তিনি আমার মাতুলের সহাধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন; তিনি সপ্তাহের মধ্যে তিন-চারিদিন আমাদের বাসাতে আসিতেন, এবং আমাকে নিকটে পাইলেই দুইটা আঙ্গুল চিম্‌টার মত করিয়া আমার পেট টিপিতেন; সুতরাং বিদ্যাসাগর আসিয়াছেন শুনিলেই আমি সেখান হইতে পলাইতাম। যাহা হউক, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; তিনি আমার বাবাকে আমাকে হেয়ারস্কুলে না দিয়া সংস্কৃত কলেজেই দিতে বলিলেন; তদনুসারে আমাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করা হইল। ঐ কলেজে আমার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যাপকতা করিতেন।

আমি আসিয়া আমার মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাসাতে উঠিলাম। আমার মাতামহ সে সময়ে পীড়িত হইয়া স্বীয় গ্রামের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। আমি আসিয়া চাঁপাতলা সিদ্ধেশ্বরচন্দ্রের লেনের নিকটস্থ মহাপ্রভুর বাড়ী নামক এক বাড়ীতে মাতুলের বাসাতে রহিলাম। ঐ বাড়ীর বাহিরে নীচের তালাতে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ দুইজনের কাষ্ঠনির্ম্মিত দুই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ছিল; এবং হরেকৃষ্ণ বাবাজী নামক এক বাবাজী ঐ উভয় মূর্ত্তির সেবক ছিলেন। ঐ বাবাজী ঐ বাড়ীর মালিক ছিলেন। আর সেই বাড়ীর এক ঘরে একটী চিত্রকর থাকিতেন, তিনি বাবুদের ছবি আঁকিতেন। তাঁহার ঘরে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি ছিল। আমি স্কুল হইতে আসিয়া তাঁহার ঘরে অনেকক্ষণ থাকিতাম; নিমগ্নচিত্তে ছবিগুলি দেখিতাম। আমার ছবি দেখার নেশা সেই অবধি অদ্য পর্য্যন্ত যায় নাই। আমাকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ছবির মধ্যে রাখিয়া দিলে বোধ হয় আহার নিদ্রা ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকিতে পারি।

আমরা বাড়ীর ভিতর উপরতলায় থাকিতাম। সেই উপরতলার একপার্শ্বে আমার মাতুলগ্রামের আর-কয়েকটি ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহারা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। সে পুরুষের বাসা, সমস্ত দিনের মধ্যে একটি মেয়েমানুষের মুখ দেখিতে পাইতাম না। স্বসম্পর্কীয় ও স্বগ্রামের অনেকগুলি যুবককে আমার মাতুল অন্ন দিতেন। তাঁহারা সকলে ঐ বাসাতে থাকিতেন। একএকটী ভীষণাকৃতি মর্দ্দ; কেহ দেড়-কুনিকা, কেহ দুইকুনিকা চাউলের ভাত খায়; কেহ পড়ে, কেহ বা কিছু কাজ করে, কেহ বা নিষ্কর্ম্মা বসিয়াখায়। আমার বাবা সংস্কৃত দশকুমারচরিত হইতে নাম সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাহারও নাম "দর্পসার," কাহারও নাম "দর্পনারায়ণ", কাহারও নাম "চণ্ডবর্ম্মা" রাখিয়া-

ছিলেন। সেই নামে তাহাদিগকে ডাকিতেন। তদ্ভিন্ন প্রত্যেকের ভোজনের পাথরের পৃষ্ঠে নরুন দিয়া খুদিয়া কে কত কুনিকা চাউলের ভাত খায়, তাহাও লিখিয়া দিয়াছিলেন। থালা ঘটী-বাটি সর্ব্বদা চুরি যাইত বলিয়া আমার মাতামহ থালা বাটির পাট উঠাইয়া দিয়া প্রত্যেকের জন্য এক-একখানি মেটে পাথর কিনিয়া দিয়াছিলেন। অতিরিক্ত লোক আসিলে শালপাতা কিনিয়া তাহা দেওয়া হইত। আমি আসিলে আমার একখানি মেটে পাথর আসিল। প্রত্যেককে আপন আপন পাথর মাজিতে হইত।

পুরুষ পুরুষের সঙ্গে থাকিলে তাহাদের আলাপ আমোদ, কথা বার্ত্তাতে লাজ-সরম থাকে না। বাসার লোক আমাকে দেখিয়াও কিছু সংকোচ করিত না। অবাধে সকল প্রকার আলাপ করিত। আমার বাবা দেখিতে পাইলে, কখনও কখনও তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেন, কখনও কখনও আমাকে তাড়াইয়া দিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সহিত নিরন্তর বাস করিয়া ও এই-সকল অভদ্র আলাপ নিরন্তর শুনিয়া আমার মহা অনিষ্ট হইয়াছিল, এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি; আমার অকালপক্বতা জন্মিয়াছিল। গ্রামের লোকে তাহার পর হইতে আমার "শিবে জেঠা" নাম দিয়াছিল। আমি অল্পবয়স্ক বালক হইয়াও কিরূপে বয়োবৃদ্ধদিগের সহিত জেঠাম করিতাম, তাহা স্মরণ করিয়া এখন লজ্জা হয়। তদ্ভিন্ন ঐ পুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অনেক খারাপ বিষয় শিখাইয়াছিল, যাহার অনিষ্ট ফল পরজীবনেও অনেকদিন ভোগ করিয়াছি। এই পুরুষদের সঙ্গে বাস ও অভদ্র আলাপাদি দ্বারা আর-একটি অনিষ্ট এই হইয়াছে যে আমার রীতি নীতি আলাপ সম্ভাষণ প্রভৃতিতে ভদ্রতা ও সৌজন্য সমুচিতরূপে ফুটিতে পায় নাই। বন্ধুরা আমাকে ভালবাসেন বলিয়া

আমার আলাপ সম্ভাষণে সৌজন্যের প্রতি তত দৃষ্টি রাখেন না। কিন্তু আমি সময়ে সময়ে অনুভব করি যে, আমার আলাপ আচরণ ভদ্রতার অনুরূপ নহে। এমন কি, যে নারীজাতির প্রতি আমার এত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, তাঁহাদের প্রতিও সমুচিত সৌজন্য প্রকাশ করি না।

এই হরেকৃষ্ণ বাবাজীর বাড়ীতে স্মরণীয় বিষয়ের মধ্যে আর-একটী কথা আছে। তখন কলিকাতার অবস্থা এইরূপ ছিল যে কেহ প্রথমে আসিলে, একবার গুরুতর পীড়াতে পড়িতে হইত। আমিও আসিয়া ২।১ মাসের মধ্যে কঠিন জ্বর রোগে আক্রান্ত হইলাম। দেশে আমার মাকে সে সংবাদ দেওয়া হইল না। এই জ্বরের বিষয়ে আমার এই মাত্র স্মরণ আছে যে আমাকে একখানা ভাঙ্গা রথের চূড়ার উপরে বসাইয়া ভাপ্‌রা দেওয়া হইয়াছিল। সে সময়ে ভাপ্‌রা দিয়া জ্বর ছাড়ান, ও মাথাব্যথা হইলে জোঁক লাগান চিকিৎসার প্রণালী ছিল।

আর-একটা ঘটনা বোধ হয় এই সময়েই ঘটিয়া থাকিবে। আমার বাবা তখন আমাকে "হা-কালা" বলিয়া ডাকিতেন। কারণ এই। যখন আমি হাঁ করিয়া থাকিতাম, অর্থাৎ একমনে কিছু কাজ করিতাম, তখন পশ্চাৎ হইতে ডাকিলে শুনিতে পাইতাম না। বাবা অনেক সময় ডাকিয়া ডাকিয়া শেষে রাগিয়া আসিয়া মারিতেন। বাবার বিশ্বাস জন্মিল যে আমি কালা হইয়া যাইতেছি; আর এইরূপ বিশ্বাস জন্মিবার কিছু কারণ ছিল। ছেলেবেলায় মধ্যে মধ্যে আমার কান পাকিত। যাহা হউক বাবা আমাকে কালা ভাবিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের আউট ডোরে লইয়া গেলেন। তখন ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী আউট ডোরে বসিতেন। তিনি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে বলিলেন, "ছোক্‌রা, তুমি আমার দিকে পিছন করে দাঁড়াও তো?" আমি তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। তখন

একখোলো চাবি মাটীতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "কিছু শুনিলে কি?" আমি বলিলাম, "চাবি ফেলে দিয়েছেন।" তখন তিনি হাসিয়া বাবাকে বলিলেন, "এ ছেলে তো কালা নয়।" বাবার সে কথা মনঃপূত হইল না। তিনি আমাকে বাড়ীতে আনিয়া অন্য কোনও ডাক্তারের পরামর্শে, আমার কানে পিচকারী দিয়া, নাপিত ডাকিয়া কান পরিষ্কার করাইয়া আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তখন মাসে মাসে নাপিত ডাকিয়া আমার কান খোঁটান হইত। নাপিতেরা তখন কুঠীওয়ালা বাবুদের ন্যায়, বেনিয়ান পরিয়া, পাগ্‌ড়ী মাথায় দিয়া পথে পথে ঘুরিত। একজন নাপিত এলেন, যেন কেরাণীবাবু এলেন। এই শ্রেণীর নাপিতের হস্তে, আমার অন্যমনস্কতার জন্য, অনেক নিগ্রহ হইয়াছে।

হরেকৃষ্ণ বাবাজীর বাড়ীর বাসা অল্পদিনের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া গেল। মাতুল মহাশয় উঠিয়া সিদ্ধেশ্বর-চন্দ্রের লেনে এক বাড়ীতে গেলেন। সেখান হইতে ১৮৫৮ সালে "সোমপ্রকাশ" প্রকাশিত হয়। বাবা আমাকে লইয়া বহুবাজার জেলিয়া-পাড়া নামক গলিতে বাস করিলেন। ইহাও পুরুষের বাসা। বাসার লোকেরা কর্ম্মস্থল হইতে আসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেন ও গল্প করিতেন; ধীরে সুস্থে রাঁধিতে যাইতেন; আমি যে একটী ছোট বালক আছি, তার যে শীঘ্র শীঘ্র আহার করা চাই, ইহা কাহারও মনে থাকিত না। তাঁহাদের রাঁধিতে রাত্রি প্রায় ৯টা-৯॥ টা হইয়া যাইত। আমি ততক্ষণ জাগিয়া থাকিতে পারিতাম না। কেতাব হাতে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। আহারের সময় সকলে আমাকে টানাটানি করিত; কোনও রূপে তুলিতে পারিত না। অবশেষে বাবা প্রহার করিতেন; তখন নিদ্রা ভঙ্গ হইত; কাঁদিতে কাঁদিতে আহার করিতে যাইতাম। সেই বাসাতে হরিনাভির রামগতি

চক্রবর্ত্তী নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকিতেন। তিনি জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার মায়ের খুড়া। সেই সূত্রে তাঁহাকে দাদামশাই বলিয়া ডাকিতাম! তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আমার বাবা আমাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি আমাকে রক্ষা করিতেন এবং তাহা লইয়া বাবার সঙ্গে বকাবকি করিতেন। এই কারণে আমি তাঁহাকে আমার রক্ষক মনে করিতাম।

জেলিয়া-পাড়াতে যখন আমাদের বাসা, তখন ১৮৫৭ সালের মিউটিনী ঘটে; এবং আমাদের কলেজ পটলডাঙ্গা হইতে উঠিয়া গিয়া বহুবাজার রোডের তিনটা বাড়ীতে থাকে। মিউটিনী থামিলেও ঐ স্থানে কলেজ কিছুকাল থাকে, তৎপরে নিজ আলয়ে উঠিয়া আসে। ইতিমধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করেন। আমি পেট টিপুনীর ভয়ে পলাইয়া বেড়াইতাম বটে, কিন্তু তাঁহাকে অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতাম। তিনি তখন আমাদের আদর্শ পুরুষ। ১৮৫৬ সালের শেষভাগে যেদিন প্রথম বিধবা বিবাহ দেওয়া হয়, সেদিন আমি বাসার লোকের সঙ্গে সে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি ভিড়! সুকিয়া ষ্ট্রীটের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে ঐ বিবাহ হয়। বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে আমাদের বাসাতে সর্ব্বদা বিচার হইত; এবং বাসার অনেকে তার পক্ষ ছিল। সুতরাং আমি জ্ঞানোদয় হইতেই এই সংস্কারের পক্ষপাতী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন চলিয়া গেলেন, আমরা বালকেরা পর্য্যন্ত মহা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার কাজে ই বি কাউয়েল সাহেব আসিলেন। তিনি সাধুতার মূর্ত্তি ছিলেন। সকলেরই মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিতাম। তিনি আমাদিগকে বড় ভালবাসিতেন; আমরা খেলা করিতেছি দেখিলে তিনি সুখী হইতেন।

তাঁহার বিষয়ে এই সময়ের একটী ঘটনা মনে আছে। একদিন আমাদের ক্লাসের ছোক্‌রারা একটা ছোট কাঠের সিঁড়ী লইয়া আর-এক ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে একটার ছুটার সময় ভয়ানক দাঙ্গা করিল। আমি তখন খেলিতেছিলাম। আমাকে ক্লাসের ছেলেরা দাঙ্গার জন্য ধরিয়া আনিল। যে কয়জন বালক সিঁড়ী লইয়া টানাটানি করিয়াছিল আমি তাহার মধ্যে একজন ছিলাম, সুতরাং কীল দেওয়া অপেক্ষা কীল খাওয়া আমার ভাগ্যে অধিক ঘটিয়াছিল। ছুটীর পর স্কুল আবার বসিলে এ বিষয়ের তদন্ত আরম্ভ হইল। কাউয়েল সাহেব বড় বাড়ী হইতে তদন্ত করিতে আসিলেন। তিনি যখন ক্লাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, কে কে দাঙ্গাতে ছিলে উঠিয়া দাঁড়াও, তখন তাঁহার সেই সাধুতাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আমি যেন আর না দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না। কে যেন ঠেলা দিতে লাগিল। কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ক্লাসের আর কোনও ছেলে উঠে না; ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। অবশেষে সাহেব বলিলেন, "তবে কি আমি বুঝিব তোমরা কেহ দাঙ্গাতে যাও নাই! যে যে গিয়াছ উঠিয়া দাঁড়াও।" আমি আর না দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব বলিলেন, "তুমি কি একা দাঙ্গাতে গিয়াছ?" আমি বলিলাম, "ক্লাসের সকলেই গিয়াছিল।" ইহার পর সাহেব ক্লাসসুদ্ধ বালকের ২৲ দুই টাকা করিয়া জরিমানা করিলেন, এবং আমাকে তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া বড় বাড়ীতে তাঁর ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি সত্য বলিয়াছ বলিয়া মার্জ্জনা করিলাম, কিন্তু দাঙ্গাতে গিয়া ভাল কর নাই।" আরও অনেক সদুপদেশ দিলেন। তিনি যখন আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "তুমি ভাল ছেলে, আমি তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছি," তখন ভাল ছেলে হইবার বাসনা যে মনে কত প্রবল হইল তাহা বলিতে পারি না।

ফলতঃ আমি তখন মিথ্যা বলিতে পারিতাম না, বড় জোর মৌনী থাকিতাম; অসত্য বলিতাম না। ইহারই কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালের আর-একটী কথা স্মরণ আছে, তাহা এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করি। তখন আমি সিদ্ধেশ্বর-চন্দ্রের লেনে মাতুলের নিকট থাকি। বাসার বড় বড় ছেলেরা আমাকে তামাক খাইতে শিখাইয়াছিল। নিজে তামাক খাইয়া আমার হাতে হুঁকাটী দিয়া বলিত, "টান্।" প্রথম প্রথম টানিয়া ঘুর লাগিত, তবু সখের জন্য টানিতাম। একদিন তামাক টানিয়া বড়মামার নিকট বাজারের পয়সা আনিতে গিয়াছি, তিনি তামাকের গন্ধ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তামাক খাস্?" আমি মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলাম, "হাঁ।" তৎপর তিনি প্রশ্ন করাতে যেরূপে যেরূপে তামাক খাইতে শিখিয়াছি ও যতবার খাই সমুদয় বর্ণনা করিলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম তের বৎসরের অধিক হইবে না। মাতুল শুনিয়া বাসার লোকের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং আমাকে তামাক না খাইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন। আমি তদবধি আর তামাক খাই নাই। কিন্তু একবার একটী মিথ্যা বলিয়া মাতুলকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলাম, তাহা যথাস্থানে বলিব।

জেলিয়াপাড়াতে অবস্থিতি-কালের একটি কৌতুকজনক ঘটনা স্মরণ আছে। আমাদের ক্লাসে গঙ্গাধর নামে একটী ধনী-সন্তান পড়িত। সে বড় মোটা ছিল। এজন্য ক্লাসের ছেলেরা তাহাকে "গঙ্গাধর হাতী" বলিত। গঙ্গাধর পড়াশুনাতে বড় মনোযোগী ছিল না। সেজন্য ওঠা-নামার সময় উপরে উঠিতে পারিত না। একদিন কিন্তু ঘটনাক্রমে গঙ্গাধর ফার্ষ্ট হইয়া গেল। তখন তার আমাদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি দেখে কে? তাহা আমার সহ্য হইল না। পরদিন আমি তাহার নামে কবিতা বাঁধিয়া ক্লাসে উপস্থিত। একটার ছুটির সময় সমস্ত ক্লাসের ছেলেদিগকে ও তন্মধ্যে গঙ্গাধরকে দণ্ডায়মান করিয়া, সেই

কবিতা পাঠ করা হইল। সমুদয় কবিতাটী আমার মনে নাই। চারি পংক্তি মাত্র স্মরণ আছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইজার চাপকান গায় ইস্কুলে আসে যায়
নাম তার গঙ্গাধর হাতী,
বড় তার অহঙ্কার, ধরা দেখে সরাকার
চলে যেন নবাবের নাতী।

কবিতা যখন পড়া হইল, তখন ছেলেদের করতালিতে ও অট্টহাস্যে সমুদয় স্কুলের ছেলে জড় হইল। গঙ্গাধর অপমানে কাঁদিয়া ফেলিল; এবং মাষ্টার মহাশয়ের নিকট নালিশ করিল। কুমারখালির চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাগোবিন্দ মৈত্র তখন আমাদের ইংরাজীর মাষ্টার ছিলেন। তিনি কবিতাটী আমার হাত হইতে লইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেন; এবং আমার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার কবিতা বেশ হয়েছে, কিন্তু মানুষকে গালাগালি দিয়ে কবিতা লেখা ভাল নয়।" ইহার পর আমার কবিতা লিখিবার উৎসাহ বাড়িয়া গেল। ফলতঃ আমি যে কত ছোট বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহা মনে নাই। বর্ণপরিচয় হইলেই মা আমাকে কৃত্তি-বাসের রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন। অথবা নিজে মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। সেই-সকল কবিতা আমার কানে লাগিয়া ছিল। তৎপরে কলিকাতাতে আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা কোনও প্রকারে হাতে পাইলেই গিলিয়া খাইতাম। তৎপরে আমার বাবা কবিতার রসগ্রাহী মানুষ, তিনি বন্ধুদের সহিত ভারতচন্দ্র প্রভৃতির কবিতার সমালোচনা করিতেন। এই-সকল কারণে আমার শৈশব হইবে কবিতা লিখিবার বাতিক জাগিয়া থাকিবে। আমার দশ বৎসর বয়সের লিখিত খাতা পরে দেখিয়াছি, তাহাতে কয়েকটি কবিতা

লিখিত আছে। সেগুলি এরূপ উৎকৃষ্ট যে অতটুকু বালকের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না। অনুমান করি, সেগুলি অন্য কোনও স্থান হইতে নকল করিয়া লইয়াছিলাম। তাহাতেও এই প্রমাণ হয় যে, নয় দশ বৎসর বয়সেও ভাল কবিতা দেখিলেই নকল করিয়া লইতাম।

এই দশ এগার বৎসর বয়সের আর-একটি কৌতুকজনক ঘটনা স্মরণ হয়। আমাদের স্কুলের সন্নিকটের গলিতে একটী বালিকা ছিল। সে আমার সমবয়স্কা, দেখিতে যে খুব সুন্দরী ছিল, তাহা নহে, কিন্তু তাহার মুখখানি আমার বেশ লাগিত। সে তাহাদের বাড়ীর উঠানে খেলা করিত। আমি আর-একটী বালকের সঙ্গে রোজ তাহাকে দেখিতে যাইতাম। সে তার মার ভয়ে পথের বালকের সহিত বড় বেশী কথা বলিত না; কিন্তু সে জানিত যে আমরা তাহাকে দেখিতে ও তাহার সঙ্গে কথা কহিতে ভালবাসি, তাই সে আমাদের কণ্ঠস্বর শুনিলেই বাহিরে আসিত ও এটা ওটা যাহা দিতাম গোপনে লইত। আমি বোনের মত তাহাকে কাছে চাহিতাম, কিন্তু তাদের বাড়ীর লোকে তাহা দিত না। বহুবাজার পাড়া হইতে কলেজ উঠিয়া গেলে আমরা তাহাকে হারাইলাম।

এই সময়ের স্মরণীয় বিষয় আর-একটী আছে। আমার দুইটী সহাধ্যায়ী বালকের মাতারা এই সময়ে আমার মাসীর কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম; সর্ব্বদা তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতাম; তাঁহাদের কন্যাদের সঙ্গে ভাইবোনের মত খেলিতাম। ইহাতে আমার জননীর ও ভগিনীর অভাব দূর হইত। ভাল জিনিস কিছু গৃহে হইলেই তাঁহারা আমাকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন। পাছে আমি কুসঙ্গে পড়ি এই ভয়ে তাঁহারা কলেজের ছুটীর দিনে আমাকে নিজেদের বাড়ীতে রাখিতেন।

এই জেলিয়া-পাড়াতে থাকিবার সময় আমাদের পরিবারে দুইটী দুর্ঘটনা ঘটে; প্রথম উন্মাদিনীর মৃত্যু, দ্বিতীয় আমার প্রপিতামহদেব রামজয় ন্যায়ালঙ্কারের স্বর্গারোহণ। একবার গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ীতে গেলাম। যাইবার সময় কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া বাড়ীতে যাই। প্রথমদিন চাঙ্গড়িপোতায় মামার বাড়ীতে গিয়া একরাত্রি যাপন করিলাম, পরদিন প্রত্যূষে পদব্রজে যাত্রা করিয়া বাড়ীতে গেলাম। বার বৎসরের বালকের পক্ষে ১৮ মাইল পথ হাঁটিয়া যাওয়া বড় সহজ কথা নহে। আমি তো গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। উন্মাদিনীকে আমি এমনি ভালবাসিতাম যে বাড়ীতে গিয়া যখন দেখিলাম উন্মাদিনী ঘরে নাই, তখন যেন সব শূন্য দেখিলাম। মাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন সে বাহিরে আমের বাগানে গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সেই দিকে দৌড়। মা চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ওরে বোস, ওরে দাঁড়া, তাকে ডাক্‌চি," কেবা তাহা শোনে। আমি একেবারে গিয়া উন্মাদিনীকে বুকে তুলিয়া ঘরে আনিয়া তবে নিঃশ্বাস ফেলিলাম। এই উন্মাদিনীই সেই গ্রীষ্মকালে মারা পড়িল। বাবা একদিন তাহাকে সঙ্গে করিয়া জমিদারবাবুদের বাগানে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার প্রিয়নাথ রায়চৌধুরীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। তিনি উন্মাদিনীকে আদর করিয়া লীচু খাওয়াইলেন। উন্মাদিনী আনন্দিত অন্তরে হাসিতে হাসিতে বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই তাহার দারুণ কলেরা রোগ দেখা দিল। একবার ভেদ একবার বমি হইয়াই যেন চুপসিয়া গেল। তার বমিতে আস্ত আস্ত লীচু উঠিল। সে কথা এইজন্য বলিতেছি যে তাহার মৃত্যুতে এত আঘাত পাইয়াছিলাম, যে তদবধি আজ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল ভাল মনে লীচু খাইতে পারি নাই। লীচু খাইতে গেলেই উন্মাদিনীর কথা মনে হয়। প্রাতে ৯টার সময় পীড়া জন্মিয়া অপরাহ্ণ ৩টার মধ্যে

উন্মাদিনীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাহাকে যখন নিকটস্থ পুকুরে নামাইল, তখন আমি গিয়া তার সম্মুখে দাঁড়াইলাম, মনে হইল সে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে এবং তাহার দুই চক্ষে জলধারা পড়িতেছে। সেই চক্ষের জলধারা এই দীর্ঘকাল ভুলিতে পারি নাই। উন্মাদিনী চলিয়া গেলে গৃহ শূন্য দেখিলাম। তৎপরে আমার তিন ভগ্নী জন্মিয়াছে, এবং তদ্ভিন্ন পরের মাকে মাসী পরের বোনকে বোন অনেকবার করিয়াছি, কিন্তু শৈশবের সেই বিমল আনন্দের স্মৃতি হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। বোধহয় ইহার পূর্ব্ব বৎসর পূজার সময় আমার প্রপিতামহদের স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুশয্যার কথা আমার স্মরণ নাই। বোধহয় তখন বাড়ীতে ছিলাম না। উন্মাদিনী সম্বন্ধে তাঁহার একটী কার্য্য স্মরণ আছে। উন্মাদিনী যখন পাঁচ ছয় মাসের মেয়ে, তখন মা তাহাকে তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহার হাতখানি লইয়া উন্মাদিনীর উপরে রাখিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এই মেয়ে হয়েছে দেখ, পদধূলি দেও, আশীর্ব্বাদ কর।" প্রপিতামহদেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মারে দয়াময়ি! ভুলতে না পেরে আবার এসেছিস্।" প্রপিতামহের দয়াময়ী ও করুণাময়ী নাম্নী দুইটী কন্যা শৈশবেই গত হইয়াছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, সেই দয়াময়ী পুনরায় আসিয়াছে। তদবধি উন্মাদিনীকে তিনি দয়াময়ী বলিয়া ডাকিতেন, উন্মাদিনী বাবার প্রদত্ত নাম।

এই জেলিয়াপাড়ার বাসায় থাকিতে থাকিতে আমার প্রথমবার বিবাহ হয়, সাল তারিখ মনে নাই। তখন ঠিক কত বয়ঃক্রম ছিল, তাহাও স্মরণ নাই। ১২।১৩ বৎসরের অধিক হইবে না। আমার মাতুলালয়ের সন্নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের ৺ নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ীর সহিত আমার প্রথম বিবাহ হয়। প্রসন্নময়ীর বয়ঃক্রম তখন দশ বৎসরের অধিক হইবে না। আমাদের দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের কুলপ্রথা

অনুসারে প্রসন্নময়ীর বয়ঃক্রম যখন একমাস ও আমার বয়ঃক্রম যখন দুই বৎসর তখন তাঁহার সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। এই বিবাহকালীন সকল বিষয় আমার স্মরণ নাই। এইমাত্র স্মরণ আছে যে, আমি কানে মাকড়ী, গলায় হার, হাতে বাজু ও বালা পরিয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম। বাবা বাজনা ও আলো করিয়া আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। আমাকে লইয়া যেই আসরে বসাইল, অমনি গ্রামের সমবয়স্ক বালকেরা আসিয়া "ওরে তুই কি পড়িস? কি পড়িস?" বলিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। আমি অল্পক্ষণ মধ্যে বরোচিত লজ্জা ভুলিয়া গিয়া তাহাদের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম; এবং আমাকে তাহারা ঠকান দূরে থাক, আমিই তাহাদিগকে ঠকাইয়া দিলাম। ইহা স্মরণ আছে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "ছেলেটি বড় জেঠা"। তৎপরে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলে সমবয়স্কা বালিকাদিগের কানমলা আরম্ভ হইল। সেইবার ঠকিয়া গেলাম। কানমলার পরিবর্তে কান মলিয়া দিতে পারিলাম না। নারীদলে আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। এত মেয়ে একত্র দেখিয়া ভ্যাবা-চাকা লাগিয়া গেল।

বিবাহের পর পরদিন যখন এক পাল্‌কীতে বরকন্যা দিয়া গৃহাভিমুখে বিদায় করিল, তখন আমার মুস্কিল বোধ হইতে লাগিল। মেয়েটী ঘোম্‌টা দিয়া সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, হাত পা ছড়াইতে পারি না, কিছু বলিতে পারি না, মহা বিপদ। অবশেষে পথিমধ্যে একটা পড়ো বাগানে গিয়া পাল্‌কী নামাইল; আমি বাহির হইয়া বাঁচিলাম। বাহির হইয়া দেখি লিচু গাছে-লিচু পাকিয়া রহিয়াছে। গাছে উঠিয়া লিচু পাড়িয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। খাইতে খাইতে মনে হইল, মেয়েটী একা বসে আছে, তারও তো খিদে পেয়েছে তাকে গোটা কতক লিচু দিই। এই ভাবিয়া কতকগুলি লিচু লইয়া প্রসন্নময়ীর অঞ্চলে ফেলিয়া দিয়াই দৌড়, যদি কেহ দেখিতে পায়।

ক্রমে পাল্‌কী গ্রামের প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইল। আমার পাড়ার খেলিবার সঙ্গী বালকগণ আগ বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছে। পাড়ার দুইটী বালক আমার বড় অনুগত ছিল। তাহারা আসিয়া পাল্‌কীর দ্বার খুলিয়া সরু গলাতে বলিল, "ওরে তোর রবা কুকুর ভাল আছে।" শুনিয়া দুর্ভাবনা দূরে গেল, ভারী খুসী হইলাম। এই রবার বিবরণ একটু দেওয়া আবশ্যক। রবা একটী কুকুরের বাচ্ছা, মাদী কুকুর। শীতের ছুটীর সময় বাড়ীতে আসিয়া একটী বালকের নিকট হইতে লইয়া তাহাকে পুষিয়াছিলাম। যদিও মাদী কুকুর, তথাপি তাহার নাম দিয়াছিলাম "রবার্ট"। ইহারও একটু বিবরণ আছে। কুকুরটী যখন আসিল সঙ্গী বালকগণ জিজ্ঞাসা করিল "ওর নাম কি হবে?" আমি নাম দিলাম "রবার্ট।" তাহার মর্ম্ম এই আমার উপর ক্লাসের ছেলেরা তখন "চেম্বার্স ফার্ষ্ট বুক অব রীডিং" পড়িত। তাহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম যে রবার্ট একজনের নাম। সেইটা মনে ছিল। পাড়ার বালকদিগের নিকট তো বাহাদুরি দেখান চাই, তাই নাম দিলাম রবার্ট। আমি সহর হইতে গিয়াছি, আমার বাক্য তখন বেদবাক্য, তাই তার নাম হইল রবার্ট। শিশুদের মুখে রবার্ট ঘুচিয়া দাঁড়াইল রবা। আমি রবাকে লইয়া পাড়ার বালকদিগের সঙ্গে সুখেই ছিলাম, আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল বিবাহ দিতে। আমার ভাবনা হইল রবাকে দেখে কে? মার উপরে বিশ্বাস হইল না, কারণ মা তখন কুকুর ভালবাসিতেন না। কাজেই পাড়ার বালকদিগের প্রতি তার ভার দিয়া আসিয়াছিলাম। তাহারাই তাহাকে কয়েকদিন খাওয়াইয়াছিল ও দেখিয়াছিল। তাই আসিয়া সংবাদ দিল "রবা ভাল আছে।"

ক্রমে পাল্‌কী বাড়ীতে উপস্থিত হইল। পাড়ার মেয়েরা বৌ দেখিতে আসিল। মা হলু দিয়া ধানদূর্ব্বা ফুল চন্দন ঠাকুরের চরণামৃত প্রভৃতি

দিয়া বৌ ঘরে তুলিলেন। আমি পাল্কী হইতে নামিয়াই তাড়াতাড়ি রবাকে দেখিতে ছুটিলাম। বড় পিসী "ওরে খা, ওরে খা" করিয়া পশ্চাতে ছুটিলেন। কে বা মিষ্ট খায়, কে বা বৌ লইয়া মেয়েদের মধ্যে বসে, তখন রবা প্রসন্নময়ী অপেক্ষা বহুগুণে আমার প্রিয়। এখন এইসব স্মরণ হইয়া হাসি পায়।

বিবাহ-উৎসব শেষ হইতে না হইতে এক দুর্ঘটনা ঘটিল যাহার স্মৃতি অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে। আমার বিবাহের কয়েকদিন পরেই আমার জ্ঞাতিসম্পর্কে এক জ্যাঠার এক কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইল। তখনও প্রসন্নময়ী আমাদের বাড়ীতে আছেন, বাপের বাড়ী ফিরিয়া যান নাই; এবং তাঁহার পিত্রালয় হইতে যাঁহারা সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ তখনও আছেন। আমার ঐ জ্যাঠতুতো বোনের বিবাহ উপস্থিত হইলে, একদিন আমাদের পাড়ার ছেলেরা বরযাত্রদিগের সহিত কৌতুক করিবার জন্য পঞ্চবর্ণের গুঁড়া দিয়া আসন প্রস্তত করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সেখানে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে আমার বড়পিসীর মেজোছেলে রামযাদব চক্রবর্ত্তীর সহিত আমার হঠাৎ বিবাদ বাধিয়া গেল। দুইজনে জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি ও ঘুষাঘুষি করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মা এই সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিলেন; এবং দুইজনের কানে ধরিয়া থাবড়া দিয়া বিবাদ ভাঙ্গিয়া দিলেন। মেজদাদা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীতে গিয়া নিজের মাকে বলিল, "মামীমা মায়ে পোয়ে পড়ে আমায় মেরেছে।" বড়পিসী প্রকৃত ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিলেন না; ছেলেদিগকে ডাকিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করিলেন না; একেবারে রাগিয়া আগুন হইয়া গেলেন; এবং আমার এক পিসতুতো বোনের সঙ্গে একত্র হইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমার মায়ের প্রতি গালাগালি বর্ষণ

করিতে লাগিলেন। দুই ননদ ভাজে খুব ঝগড়া হইয়া গেল। ইহার পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মা আমাকে বলিলেন, "আজ তোমার কপালে অনেক নিগ্রহ আছে। ভাত দিচ্ছি, শীগ্‌গির খেয়ে ভট্‌চাযি্য-পাড়ায় যাত্রা হবে, সেখানে গিয়ে রাত্রে যাত্রা শোনো। কর্ত্তার রাগ পড়ে গেলে সকাল বেলায় আস্‌বে।" মা যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। বাবা সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী আসিতেছিলেন, পথ হইতে বড়পিসীর গালাগালি শুনিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। গিয়া বলিলেন, "তোরা কাকে এমন করে গালাগালি দিস্‌ যে রাস্তা হতে শোনা যায়?" আর কোথায় যায়! বড়পিসী বাবার কাণে মার নামে অনেক কথা ঢালিয়া দিলেন। বাবা আর কাহারো কাছে কিছু শুনিলেন কি না জানি না, আমার মায়ের উপরে কি বড়পিসীর উপরে রাগ করিলেন, তাহাও জানি না। তাঁহার মনে চিরদিন এই একটা ভাব ছিল যে তাঁহার পুত্র এমনি সাধু ছেলে হবে যে তার নামে কেহ কখনও কোন অভিযোগ করিবে না; তাহার কোনও দোষ কেহ দেখাইবে না; সে সকল দোষের ও সকল অভিযোগের উপরে থাকিবে। সেই ভাবের ব্যাঘাত হইল বলিয়া রাগিয়া গেলেন কি না জানি না। যাহা হউক যখন মায়ের ত্বরাতে আমি রান্নাঘরের এককোণে বসিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিতেছি, এমন সময়ে বাবা আসিয়া বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইলেন। হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে পাজীটা কোথায়?" আমার মা দুই হাত দিয়া রান্না-ঘরের দরজার দুই কাঠ ধরিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন "সে ঘরে নাই।" আমি বুঝিলাম বাবা যদি রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে আসেন, তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিবেন না, বাধা দিয়া রাখিবেন। কিন্তু বাবা সেদিকে আসিলেন না, বলিলেন, "দা-খানা দাও দেখি?" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দা কেন?" বাবা রাগিয়া

উঠিয়া বলিলেন, "সে কথায় কাজ কি? দাও-না।" মা দা-খানা বাহির করিয়া দিলেন। বাবা দা লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া পিছনের দ্বার দিয়া খানা খন্দ বন জঙ্গল পার হইয়া ভট্‌চাযি্য-পাড়ায় যাত্রাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মা আমাকে মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া ভিড়ের ভিতর সর্ব্বদা থাকিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া ভিড়ের ভিতর বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে মন হইতে ভয় ভাবনা চলিয়া গেল। নিশ্চিন্ত মনে বেড়াইতেছি, রাত্রি আট-টা সাড়ে আটটার সময় কে আসিয়া পিছন হইতে আমার ঘাড়ের কাপড় ধরিল। আমি বলিলাম "কেরে?" স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, বাবা সেখানে আসিয়া ধরিবেন। কিন্তু ফিরিয়া দেখি—বাবা। তিনি আমার পিঠে দু ঘুষা দিয়া বলিলেন, "খবর্‌দার কাঁদ্‌তে পারবি না।" সে ঘুষা খাইয়া কান্না গিলিয়া খাওয়া আমার পক্ষে মুস্কিল হইয়া পড়িল। কি করি কান্না গিলিতে লাগিলাম। বাবা সে অবস্থায় আমাকে বাড়ী লইয়া গেলেন, এবং উঠানের মধ্যে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "দাঁড়িয়ে থাক, নড়িস্ নে, আমি আস্‌চি।" এই বলিয়া আমাকে মারিবার জন্য যে বাঁশের ছড়ি কাটিয়া গোলার গায়ে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা খুঁজিতে গেলেন। মা যে তৎপূর্ব্বেই সে ছড়ি পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা জানিতেন না। আমি ২।৪ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিতে না থাকিতেই আমার মা, বড়পিসী, পিস্‌তুতো দিদী, বিবাহ-বাড়ীর লোকেরা আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়া, বলিতে লাগিলেন, "ওরে! পালা পালা, মার খাবার জন্যে কেন দাঁড়িয়ে থাকিস্!" আমি বলিতে লাগিলাম, "না, আমি যাব না, বাবা যে আমাকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বলে গিয়েছেন।" এই বলে প্রায় আধ ঘণ্টাকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ওদিকে বাবা আপনার ছড়িগাছা না পাইয়া কি দিয়া মারিবেন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। অবশেষে আর কিছু না পাইয়া একখানা চেলা কাঠ লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই কাঠ লইয়া যখন আমাকে মারিতে আসিলেন, তখন বড়পিসী আমার ও বাবার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, বলিলেন "ওরে ডাকাত! দে কাঠ দে। ওই কাঠের বাড়ী মার্‌লে কি ছেলে বাঁচ্‌বে!" এই বলিয়া বাবার হাত হইতে কাঠ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই ভাই বোনে হুটোপুটি লাগিয়া গেল। বাবা বড়পিসীকে এরূপ এক ধাক্কা মারিলেন যে তিনি তিন চারি হাত দূরে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন আমার মা প্রস্তরের মূর্ত্তির ন্যায় অদূরে দণ্ডায়মানা, সাড়া নাই, শব্দ নাই, নড়া নাই, চড়া নাই। বাবার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে তিনি বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখ কি? ছেলে মেরে ফেল্‌তে হয় মেরে ফেলো, আমি এক পাও নড়্‌বো না।" বাবা বলিলেন "আচ্ছা তবে দ্যাখো।" এই বলিয়া সেই চেলা কাঠ দিয়া আমাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আরো কেহ কেহ আমাকে বাঁচাইবার জন্য আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মাথায় ও পিঠে চেলাকাঠ পড়াতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চেলাকাঠের কয়েক ঘা খাইয়াই আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আর মানুষ চিনিতে পারি না। বোধ হইতে লাগিল আমার চারিদিকে মুখগুলো ঘুরিতেছে। তৎপরেই আমি অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চৈতন্য হইল। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি উঠান হইতে তুলিয়া আমাকে ঘরের দাওয়াতে শোয়ান হইয়াছে; এবং দুই তিন জন লোক তার্পিন তেল দিয়া আমার গা মালিস করিতেছে। বাবা আপনি তেল জোগাইতেছেন ও তাহাদের সাহায্য করিতেছেন। আমি জাগিয়া মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিলাম, শুনিলাম তিনি আমাকে

অচেতন হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর নিকটস্থ জঙ্গলে গিয়া পড়িয়া আছেন। আমার চেতনা হইবা মাত্র লোকে তাঁহাকে আনিবার জন্য গেল। একজনের পর আর-একজন গেলে তিনি কাহারও কথাতে বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন, "কৃষ্ণচরণ নাপিত যদি আসিয়া বলে যে ছেলে বেঁচে আছে তবে আমি যাব, আর কারু কথাতে যাব না।"

এই কৃষ্ণচরণ নাপিত পাড়ার একজন বৃদ্ধ দোকানদার ছিলেন। তিনি বড় ভক্ত ও ধর্ম্মভীরু মানুষ ছিলেন। পাড়ার লোকে তাহাকে "ভক্ত কৃষ্ণচরণ" বলিয়া ডাকিত। সেই রাত্রে কৃষ্ণচরণের নিকট লোক গেল। বৃদ্ধ লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে আসিলেন এবং আমার সহিত কথা কহিয়া মাকে ডাকিতে গেলেন। মা তাঁর কথা শুনিয়া জঙ্গল হইতে উঠিয়া আসিলেন এবং "বাবারে তুই কি আছিস্!" বলিয়া আমার শয্যা-পার্শ্বে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে আমার যখন চেতনা হইল তখন আমি আমার স্বভাব সিদ্ধ জ্যাঠাম করিয়া বলিতে লাগিলাম "আমি মেজ দাদার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করেছিলাম, মারামারি করেছিলাম, দোষ হয়েছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু লঘুপাপে এত গুরুদণ্ড দেওয়া বাবার পক্ষে কি ভাল হয়েছে? আমার স্ত্রী ও শশুরবাড়ীর লোকেরা বাড়ীতে রয়েছে, পাশের বাড়ীতে কুটুম্বরা এসেছে, তাদের সমুখে এত মারা কি বাবার পক্ষে ভাল হলো?" এই কথা বলিতে না বলিতে দেখিতে পাইলাম বাবা অদূরে মাটীতে নাক ঘসিয়া নাকে খৎ দিতেছেন। এখানে এ কথা বলা আবশ্যক যে তাহার পরে তিনি সহস্র উত্তেজনা সত্বেও আমার বা আমার ভগ্নীদের গায়ে আর হাত তোলেন নাই। এমন কি আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া উপবীত পরি-ত্যাগ করিলেও তিনি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছেন, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া-

ছেন, কিন্তু আমার গায়ে হাত দেন নাই। ইহাতেই সকলে বুঝিবেন তাঁহার অনুতাপ ও প্রতিজ্ঞা কিরূপ ঐকান্তিক ছিল।

ইহার কিছুদিন পরেই আমার পিতা আমাদের গ্রামের স্কুলের হেড-পণ্ডিতের কর্ম্ম পাইয়া কলিকাতা বাঙ্গলা পাঠশালার কর্ম্ম হইতে বদ্‌লী হইয়া বাড়ীতে যান। তখন আমাকে আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাসাতে রাখিয়া যান। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্ব্বদা আসিতেন; এবং আমার মাতুলের সহিত কি পরামর্শ করিতেন। পরে শুনিলাম সোমপ্রকাশ নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইতেছে তাহার পরামর্শ চলিতেছে। যথাসময়ে সোমপ্রকাশ কাগজ বাহির হইল। বাসাতে ধুম পড়িয়া গেল। বাড়ীতেই ছাপাখানা খোলা হইল, কাগজ ছাপা ও কাগজ বিলির জন্য অনেক লোক বাসাতে থাকিতে আরম্ভ করিল। হৈ-হাই গোলমাল সমস্ত দিন ও রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত। তাহার ভিতরে আমি বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, আমার খাওয়া-দাওয়া বা কে দেখে, পড়াশোনার প্রতিই বা কে দৃষ্টি রাখে! আমি সেই পুরুষের দলে পড়িয়া রাঁধি, বাসন মাজি, এবং কোনও প্রকারে নিজের পড়াশুনা করি। তদুপরি বাসার বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকগণের আলাপ আচরণ কিছুই আমার মত বয়সের ছেলের শুনিবার ও দেখিবার উপযুক্ত নহে। অধিক কি একজন যুবক আমাকে অতি অসৎ কার্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। সে-সকল স্মরণ করিলে এখন লজ্জা হয়, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে একেবারে অসৎপথগামী হই নাই।

সপ্তাহের মধ্যে বাসার অন্নাশ্রিত লোকগুলি মাতুলের ভয়ে অনেক শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকিত; নিজ নিজ কাজে মনোযোগ করিতে বাধ্য হইত। মাতুল মহাশয় শনিবার দেশে যাইতেন। শনিবার রাত্রি

ও রবিবার সমস্ত দিন বাসা আর-এক মূর্ত্তি ধারণ করিত। কেহ গাঁজা, কেহ মদ খাইয়া ঢলাঢলি করিত। মাতুল খরচের জন্য যে-কিছু পয়সা দিয়া যাইতেন তাহা এইরূপে ব্যয় করিয়া ফেলিত; আমাদিগকে অনেক রবিবার ভাতেভাত খাইয়া কাটাইতে হইত। প্রশংসার বিষয়, আমাকে তাহারা অনেক সময় একটা কিছু ছল করিয়া অন্য কোনও বাসায় থাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিত। তথাপি যাহা দেখিতাম ও শুনিতাম তাহা বালকের দেখা কোনও প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে। ঈশ্বরকে আজ অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি যে, সেই-সকল দৃষ্টান্তের মধ্যে তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমি একদিনের বিবরণ বলিতেছি।

বাসার অন্নাশ্রিত আত্মীয়দিগের মধ্যে একজনকে সকলে "মামা" "মামা" বলিয়া ডাকিত। ঐ মামা, সম্পর্কে আমার মায়ের-মামা তবু আমিও মামা বলিয়া ডাকিতাম। বলিতে কি চাকর, বাকর, দোকানি-পসারি কেহই তাহাকে আসল নামে ডাকিত না, সকলেই মামা মামা বলিয়া ডাকিত। মামা ইংরেজী লেখাপড়া শেখে নাই, কম্পোজিটরি, বিলসরকারি প্রভৃতি করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিত। মামার সুরাপান ও অন্যান্য দোষ ছিল। একদিন রবিবার সন্ধ্যার পর একজন আত্মীয় আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মামা সুকিয়া ষ্ট্রীটের এক গণিকালয়ে মাতাল হইয়া বমি করিয়া পড়িয়া আছে, গণিকারা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসার লোক বলিয়া তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া গালি দিতেছে। বারাঙ্গনার মুখে মাতুলের নাম, ইহা যেন আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমি মামাকে ধরিয়া আনিবার জন্য বাসার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাঁহারা নেশা করিয়া বুঁদ হইয়া ছিলেন, কেহই আমার কথার প্রতি

কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে আমি যেদো নামক এক চাকরকে সঙ্গে করিয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটের সেই গণিকালয়ের অভিমুখে বাহির হইলাম। গিয়া দেখিলাম, এক গোলপাতার ঘরের স্ত্রীলোকের দাওয়াতে মামা বমি করিয়া ভাসাইয়াছে ও অর্দ্ধ অচেতন অবস্থাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা যাইবামাত্র স্ত্রীলোকটী গালাগালি আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম "চাকর সঙ্গে এনেছি, বমি পরিষ্কার করচি ও ওকে তুলে নিয়ে যাচ্চি, গালাগালি দিও না।" এই বলিয়া বমি পরিষ্কার করাইয়া, যেদো চাকরকে মামাকে তুলিয়া আনিতে বলিয়া নিজে দ্রুতপদে বাসার অভিমুখে যাত্রা করিলাম; কারণ তখন যদিও কলিকাতার পথে ঘাটে বাসাতে মাতাল দেখিতাম, তথাপি মাতালের প্রতি কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও ভয় ছিল, তাহাদের কাছে ঘেঁষিতাম না। বাসাতে আসিয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি। অনেকক্ষণ পরে যেদো চাকর আসিয়া সজোরে দোর নাড়িতে লাগিল। দ্বার খুলিয়া দেখি, মামা সঙ্গে নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে মামাকে অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিয়া একখানা ছোরা আনিয়া দ্বারের নিকট বসিল, বলিল মামা আসিলেই তাহাকে কাটিবে। মনে বুঝিলাম পথে দুজনে মারামারি করিয়াছে। আমি মহাবিপদে পড়িয়া গেলাম। আমি জানিতাম যেদো চাকর গাঁজাখোর। সে যাহা ভয় দেখাইতেছে করিতে পারে। বাসার লোককে ডাকাডাকি করিলাম, কেহই উঠিলেন না, বলিলেন "মরুক, হতভাগারা।" আমি নিরুপায় হইয়া বাহিরের দরজার ভিতরের দিকে এক তালা লাগাইলাম। যেদো উঠিয়া আমার হাত ধরিল, "তালা লাগাও কেন?" আমি বলিলাম "তালার চাবি তো ভিতরে আমাদের কাছে রৈল, মামার হাতে তো রৈল না। এলে খুলে দেব, তার ভয় কি?" যেদো তাই বুঝিল এবং ছোরা লইয়া

বাহিরের দরজার কাছে বসিয়া রহিল। আমি বাড়ীর ভিতরে উপরের ঘরে শুইতে গেলাম। গিয়া শুনি মামা বাসার পশ্চাতে অপর এক গণিকা-ঘরে গিয়া মাতালি সুরে এক গান ধরিয়াছে। সে রাত্রে মামা আর বাসায় আসিল না।

পরদিন মাতুল মহাশয় সহরে আসিলে আমি এই বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলাম। তিনি কুপিত হইয়া বাসা হইতে ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন।

ইহার পরে আমার মাতামহী ঠাকুরাণী ও আমার বড়মাসী আসিয়া কিছুদিন কলিকাতাতে ছিলেন। তাঁহাদের পদার্পণে বাসা পবিত্র হইয়া গেল। মাতুল মহাশয়ের শনিবার বাড়ী যাওয়া বন্ধ হইল। মামীঠাকুরাণী মাতুলের তৃতীয় পক্ষের পত্নী, আমা অপেক্ষা চারি পাঁচ বৎসরের বড়। তিনি মাতামহীকে গোপন করিয়া আমাকে মিঠাই আনিতে পয়সা দিতেন, মিঠাই আনিয়া গভীর রাত্রে দুইজনে খুব খাইতাম। এ পেটুকের সেই সময়টা যে কি সুখেই গিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

ইহার কিছুদিন পরেই মাতলা রেলওয়ে খুলিল। সোমপ্রকাশ যন্ত্র কলিকাতা হইতে চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলের বাসভবনে উঠিয়া গেল। আমাদের বাসা আবার ভাঙ্গিল। আমি দুদিন ইহাদের সঙ্গে, দুদিন উহাদের সঙ্গে, এইরূপ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অগ্রে বলিয়াছি বড়মামার কাছে একবার একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ এখানে দিতেছি। আমার দুইজন সহাধ্যায়ী বন্ধুর জননীকে আমি মাসী বলিতাম ও তাহাদের বোনকে বোন বলিতাম। তাঁহারা বাস্তবিক আমাকে মাসীর ন্যায় ভালবাসিতেন। এই দুই বন্ধুর মধ্যে এক জনের বাড়ীতে আমরা কয়েকটা বালক একবার এক ছুটীর দিনে সম্মিলিত হইয়াছিলাম। নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে একটা বালক একখানা

বোতল-ভাঙ্গা কাঁচ লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ ভাই, এই কাঁচ যদি কেহ চিবাইয়া ভাঙ্গিতে পারে, তবে তাকে এখনি একটাকা দি।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা দাও, আমি চিবাচ্ছি।" এই বলিয়া তার হাত হইতে কাঁচখানা লইয়া চিবাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন দুইপাটী দন্তের মধ্যে কাঁচখানা রাখিয়া ভাঙ্গিতে যাইব, অমনি ডানদিকের নীচের ঠোঁট কাটিয়া দুখানা হইয়া গেল। এই অবস্থায় মাতুলের বাসাতে দৌড়িলাম। বড়মামা দেখিয়া ভয়ে আকুল হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলাম, যে, একখানা চাকু ছুরী বাহাদুরী করিয়া দাঁত দিয়া তুলিতে গিয়াছিলাম। ছুরিখানা কিয়দ্দূর উঠিয়া সবেগে ঠোঁটের উপর বসিয়া গেল। মামা তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং ডাক্তার ডাকিয়া আমার ঠোঁট সেলাই করাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার নিকট এই একটী মিথ্যা কথা কহিয়াছিলাম। এখনও স্মরণ হইয়া লজ্জা হইতেছে, কারণ আমি আর তাঁহার নিকট কখনও কোনও মিথ্যা কথা বলিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আমার সত্যবাদিতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। বলিতে কি আমাকে তিনি কিরূপ বিশ্বাস করিতেন তাহা যখন ভাবি, আমার মন আশ্চর্য্যান্বিত হয়। পাছে তিনি ক্লেশ পান, এই ভয়ে সর্ব্বদা কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতাম। তিনি দৃঢ়চেতা, কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষ ছিলেন, তামাক পর্য্যন্ত খাইতেন না; ধীর গম্ভীরভাবে সকল কাজ করিতেন, দিন রাত্রি পাঠে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহাকে না দেখিলে, তাঁহার চক্ষের সমক্ষে বর্দ্ধিত না হইলে, আমার মনে যত সাধুভাব জাগিয়াছিল, তাহা জাগিত না। তাঁহার নিকট এই মিথ্যা কথা বলিয়া বহুদিন কষ্টভোগ করিয়াছি।

মাতুলের কলিকাতার বাসায় থাকিবার কালের আর একটী হাস্যজনক ঘটনা আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বালককালে আমার অতিশয় অন্যমনস্কতা ছিল। কিরূপে একবার গাছের পাখী দেখিতে দেখিতে

হাতীর পায়ের তলায় পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম, কিরূপে আমি তন্মনস্কচিত্তে পড়িতে বসিলে বাবা আমাকে ডাকিয়া ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া আসিয়া প্রহার করিতেন এবং আমার হা-কালা নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই মাতুলের বাসায় থাকিবার সময় একদিন আমি বাড়ীর ভিতরের উপরের ঘরে তন্মনস্কচিত্তে পাঠে মগ্ন আছি, এমন সময়ে বড়মামা শয়ন করিবার জন্য উপরে আসিতেছেন। আমি তন্মনস্কচিত্তে পড়িতে বসিলেই কোমরের কাপড় খুলিয়া যাইত। সেইরূপ কাপড় খুলিয়া পড়িয়াছে, আমি পাঠে মগ্ন আছি। বড়মামার জুতার ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনিতেছি। কিন্তু চেতনা হইতেছে না, কাপড় সাম্‌লাইয়া পরিতেছি না। অবশেষে বড়মামা যখন সেই-ঘরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন আমি সজাগ হইয়া কোমরের কাপড় সাম্‌লাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। বড়মামা বলিলেন, "তুই কি ঘুমুচ্ছিলি? বসে ঘুমুচ্ছিলি কেন, শুতে তো পারতিস্?" আমি বলিলাম "না, ঘুমাই নি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "অমন নাড়ি-মাড়ি দিয়ে উঠ্‌লি কেন?" আমি বলিলাম "আমি মনে কর্‌লাম ছুঁচো আসছে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ছুঁচো কি জুতো পায়ে দিয়ে আসে?" এই লইয়া বাড়ীর লোকের মধ্যে হাসাহাসি পড়িয়া গেল। অবশেষে বড়মামা আমার পাঠে মনোযোগ ও চিত্তের একাগ্রতার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

মাতুল মহাশয় বাসা উঠাইয়া দেশে গেলে আমার পিতা আসিয়া আমাকে সুকীয়া ষ্ট্রীটে বাদুড়বাগানে এক আত্মীয়ের বাসাতে রাখিয়া গেলেন। তিনি আমার মাতার পিস্‌তুতো ভাই। তিনি কম্পোজিটারি কাজ করিতেন, এবং একখানি সামান্য গোলপাতার ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতেন। এরূপ স্থির রহিল যে তিনি প্রাতে ও আমি বৈকালে পাক করিব। কিন্তু কার্য্যকালে এই দাঁড়াইল যে আমাকেই দুই বেলা পাক

করিতে হইত। কেবল তাহা নহে, বাসন মাজা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি সমুদয় কাজ আমার উপর পড়িয়া গেল। অনেক সময়, আমাকে বাম হস্তে পাঠ্যপুস্তক ও দক্ষিণ হস্তে ভাতের কাঠি লইয়া রন্ধন ও পাঠ একসঙ্গে চালাইতে হইত। আমি বহুকাল পরে সেই সময়কার একখানি পুস্তক পাইয়াছি তাহাতে বামহস্তের হলুদের দাগ এখনও রহিয়াছে। অনুমানে বোধ হয় বাটনা বাঁটিয়া তৎপরে সেখানি পড়িবার জন্য লইয়াছিলাম, সেই জন্য হলুদের দাগ লাগিয়াছে।

এই স্থানে কিছুদিন বাসের পর আমার পিতা আসিয়া আমাকে ভবানীপুরে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে রাখিয়া গেলেন। এই সদাশয় সাধু পুরুষ কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। ইনি বর্দ্ধমান জেলার আমদপুর নামক গ্রামের জমিদার কুড়োরাম চৌধুরীর পৌত্র। ইঁহাদের বংশ সৌজন্য সদাশয়তা সচ্চরিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় চরিত্রগুণে সর্ব্বজনের সমাদৃত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাতে যে সাধুতা ও সদাশয়তা দেখিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। ইনি এবং ইঁহার পরিবারস্থ সকলে আমাকে আপনাদের স্বসম্পর্কীয় লোকের ন্যায় দেখিতেন। বাবা কলিকাতা বাঙ্গলা পাঠশালাতে আসিবার পূর্ব্বে ইঁহাদের গ্রামে পণ্ডিতী কর্ম্ম করিতেন। সেই সূত্রে ইঁহাদের সহিত আলাপ ও বন্ধুতা জন্মে। ইঁহারা এরূপ সদাশয় লোক যে সেই বন্ধুতাটুকুর খাতিরে আমাকে বাড়ীর ছেলের মত করিয়া লইলেন। আমি একজন গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, ইঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি, আমার প্রতি ইঁহাদের ব্যবহার দেখিলে তাহা মনে হইত না। আমাকে বাড়ীর ছেলে মনে হইত।

তাঁহারা আমাকে "ভট্টি" "ভট্টি" করিয়া ডাকিতেন। ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। আমার স্বগ্রামের অল্পশিক্ষিত একজন ব্রাহ্মণ যুবক,

ইঁহাদের ভবনে বাসকালে একবার আমাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে আপনার নাম স্বাক্ষর করিবার সময় ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে ভট্টার্য্য লিখিয়াছিলেন। তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে খুব হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তদবধি আমারও উপাধি ভট্টাচার্য্য বলিয়া বাড়ীর লোকে আমাকে "ভট্টার্য্য" "ভট্টার্য্য" বলিতে লাগিলেন। ভট্টার্য্যটা ক্রমে ভট্টা হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে চাকর-বাকর সকলে ভট্টিবাবু ভট্টিবাবু বলিতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর কর্ত্তাদের মুখে এই ভট্টি নামটি আমার মিষ্ট লাগিত। কারণ তাহাতে অকপট স্নেহ ও আত্মীয়তা প্রকাশ পাইত।

তাঁহারা আমাকে কিরূপ আপনার লোক ভাবিতেন, তাহার একটা দৃষ্টান্ত এই স্থানেই দেওয়া ভাল। তাঁহারা একবার তাঁহাদের ভাঁড়ারের চাবি আমাকেই দিলেন। প্রাতে পড়িতে বসিবার পূর্ব্বে তুমি ভাঁড়ারের দোর খুলিয়া চাকরদিগকে ডাকিয়া, নিজের চোখে দেখিয়া সমুদয় জিনিস-পত্র বাহির করিয়া দিয়া পড়িতে বসিবে। চাবি তোমার কাছেই থাকিবে। সেই বিস্তীর্ণ পরিবারের ভাঁড়ার এক বৃহৎ ব্যাপার ছিল। ৬০।৭০ জন খাবার লোক ; ১০।১৫ জন চাকর ; ৪।৫টা ঘোড়া ; ৮।১০টা গরু বাছুর। মানুষদের খাবার চাল, ডাল, তেল, নুন, ঘোড়ার দানা, ভুষি প্রভৃতি, গরুদের ভূষি, খইল, কলাই প্রভৃতি সমুদয় সেই ভাঁড়ারে থাকিত। প্রতিদিন কোন্ জিনিস, কি পরিমাণ দিতে হইবে তাহা একটা কাগজে লিখিয়া তাঁহারা ভাঁড়ারের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিয়াছিলেন। আমি প্রাতে গিয়া, ভাঁড়ারের দ্বার খুলিয়া চাকরদিগকে ডাকিয়া, সমুদয় জিনিস ওজন করিয়া দিতাম। দিয়া চাবি লইয়া গিয়া উপরে পড়িতে বসিতাম। তারপর সমস্ত দিন আমার সঙ্গে ভাঁড়ারের সম্পর্ক থাকিত না। ওই জিনিষ পত্রের সঙ্গে চাকর বাকরের তামাকও দেওয়া হইত।

একদিন আমার স্কুল বন্ধ। সেদিন আমি বাড়ীতে আছি। রাঁধুনী বামন আসিয়া আমাকে বলিল "ভট্টবাবু আমাদের আর একটু তামাক দিন।" আমি প্রথমে বলিলাম "যা তামাক দিবার কথা কাগজে লেখা আছে, তাতো দিয়েছি, আবার কেন চাও?" পরে ভাবিলাম একটু তামাক বই তো নয়, দিয়া আসি। ভাবিয়া তামাক দিতে গেলাম। ভাঁড়ার খুলিয়া তামাক দিতেছি, এমন সময় নবীন ঠাকুর আমাকে বলিল "ভট্টবাবু আমাদের সঙ্গে লাগলে এখানে টি'কতে পার্ব্বেন না।" রাঁধুনী বামুনের কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, ভাঁড়ারের চাবি আমার হাতে না রাখাই ভাল; চাকর বাকর আমাকে অন্নাশ্রিত জানিয়া তেমন খাতির করে না; পদে পদে তাহাদের সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া পরদিন চাবিটা তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিলাম। প্রকৃত কারণটা আর কাহাকেও বলিলাম না; কেবলমাত্র মহেশচন্দ্র চৌধুরীর খুল্লতাত-পুত্র শ্রীশচন্দ্র চৌধুরীকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাকে গোপন রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমি যখন চাবি ফিরাইয়া দিতে গেলাম, তখন কর্ত্তাদেব মধ্যে একজন বলিলেন, "কেন ফিরিয়ে দিচ্চ? তোমার উপর আমাদের পূর্ণবিশ্বাস, তোমার উপর এ ভার থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি।" এই কথা যখন উঠিল, তখন শ্রীশ আসিয়া তাঁহাদের নিকট সমুদয় কথা ব্যক্ত করিলেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা উঠিল। তাহা শুনিতে শুনিতে আমি পাইখানা অভিমুখে চলিলাম। যাইবার সময় দেখিয়া গেলাম বড়দা (অর্থাৎ মহেশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়) বারাণ্ডার একধারে বসিয়া স্নানের পূর্ব্বে দাঁতন করিতেছেন। এদিকে আমি পায়খানাতে গিয়া প্রবেশ করিতে না করিতেই চাকর গিয়া বলিল, "ভট্টবাবু, শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন। ভয়ানক কাণ্ড বেধেছে। বড়বাবু (মহেশবাবু) আপনাকে ডাক্‌ছেন।" আমি পায়-

খানার দ্বার হইতে ফিরিয়া গেলাম। গিয়া দেখি, বড়দা রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সিংহগর্জ্জনে নবীন ঠাকুরকে বলিতেছেন, "রাখ্ রাখ্, হাতা বেড়ি রাখ্; এখনি ঘর হতে বের্ হয়ে যা, নতুবা গলাধাক্কা দিয়ে বের্ করে দেব।" আমি গিয়া কাছে দাঁড়াইলে আমাকে বলিলেন, "কি ভাই, নবীনঠাকুর তোমাকে কি বলেছে, বল ত?" আমি বলিলাম, "বেশী কিছু বলে নাই, সামান্য একটা কথা বলেছে, সে জন্য রাগ কোর্‌চেন কেন?" বড়দা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ! কি বলেছে তাই বল না। সামান্য কি বেশী আমি বুঝ্‌বো।" তখন আমি বলিলাম, "ও বলেছে 'ওদের সঙ্গে লাগ্‌লে আমি টিক্‌তে পার্‌ব না।" বড়দা বলিলেন "বল্‌তে বাকী রেখেছে কি? দুঘা জুতা মার্‌লে কি সন্তুষ্ট হতে? ওই জন্যেই লোকে তোমাদের অপমান কর্‌তে সাহস পায়।" এই বলিয়া নবীন ঠাকুরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যা এখানকার কর্ম্ম গেল, এখানে তো তুই টিক্‌তে পার্‌লিই না, তারপর গ্রামে টিক্‌তে পারিস কি না পরে ভাব্‌ব।" (তাঁহারা আমদপুর গ্রামের জমিদার ছিলেন ও নবীন তাঁহাদের প্রজা ছিল)।

নবীন তাঁহাদের গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া গিয়া পথের ধারে বাজারে এক দোকান আশ্রয় করিল। আমি স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইলেই দেখিতাম নবীন বিষণ্ণমুখে দোকানে বসিয়া আছে। আমার মনে মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম আমি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে—এও গরীব ব্রাহ্মণ; আমার জন্য এ ব্যক্তির কর্ম্ম যায়, এটা প্রাণে সহ্য হয় না। অবশেষে একদিন বড়দা কোর্ট হইতে আসিয়া বাহিরের উঠানে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে নবীনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে গেলাম। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, গায়ে পড়িয়া কথা কহিতে ভয় হইত;

সুতরাং আমি নীরবে বলি বলি করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইতে লাগিলাম। তিনি আমাকে পশ্চাতে বেড়াইতে দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "কি ভাই আমাকে কিছু বল্‌বে না কি?" আমি বলিলাম "আপনি নবীন ঠাকুরকে মাপ করুন নতুবা আমার মন খারাপ হচ্ছে।" তিনি বলিলেন "ছিঃ! তোমরা বড় milky-minded! সে আপনার কাজের ফল ভুগুক। দু দশ দিন যেতে দাও না।" আমি বলিলাম, "সে নিরাশ্রয় হয়ে বাজারের দোকান আশ্রয় করেছে, মাথা রাখ্‌বার স্থান নাই, খাবার সম্বল নাই, এটা আমার সহ্য হচ্চে না।" তখন তিনি চাকর পাঠাইয়া নবীন ঠাকুরকে বাজার হইতে ডাকাইয়া আনাইয়া বলিলেন "দেখ্ রে দেখ্ তুই, কি মানুষের অপমান করেছিস্! তোর জন্য আমার কাছে মাপ চাচ্ছে। এর জন্যই তোকে আস্‌তে দিলাম। যা, কাজ কর্‌গে যা।" নবীন স্বীয় কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইল, আমার প্রাণের উদ্বেগ চলিয়া গেল। সেদিনকার সে ঘটনা ও মহেশচন্দ্র চৌধুরীর অকৃত্রিম ভালবাসা, চিরদিন স্মৃতিতে জাগিয়া রহিয়াছে।

ইহাঁদের ভবনে আসিয়া আমি অনেক প্রকারে উপকৃত হইলাম। প্রথম মহেশ বাবুর চরিত্র আমার সম্মুখে আদর্শের ন্যায় রহিল। আমি যখনি তাঁহাকে দেখিতাম, আমার অন্তরে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিত। দ্বিতীয়তঃ এখানে আসিয়া রাঁধা ভাত ও পড়িবার উপযুক্ত গ্রন্থ-সকল পাইয়া আমার পড়া-শুনার বিশেষ সুবিধা হইল। যদিও বাসাতে আমার ন্যায় অনেকগুলি ছাত্র প্রতিপালিত হইতেছিল, এবং অনেক সময় আমাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া একসঙ্গেই বাস ও পাঠাদি করিতে হইত, তথাপি আমার যে স্বাভাবিক নিবিষ্টচিত্ততা আছে, তাহার গুণে আমার পাঠের বিশেষ ক্ষতি হইত না। তৃতীয়তঃ এখানে

আসিয়া সমপাঠী কতকগুলি বালক পাইলাম, তাঁহাদের দেখা-দেখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে আমার আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা অতীব প্রবল হইল। চতুর্থতঃ আমাদের বাসার নিকট ব্রাহ্মসমাজগৃহ হওয়াতে আমি মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাদি শুনিতে ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতে লাগিলাম। আমি বোধ হয় ১৮৬২ সালে ভবানীপুরে যাই। কারণ এখানে Destiny of Human Life বিষয়ে কেশববাবুর যে ইংরাজী বক্তৃতা হয় তাহা শুনিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্গীয় অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় এখানকার ব্রাহ্ম-সমাজে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যে উপদেশ দিতেন তাহার কতকগুলিও শুনিয়াছিলাম। তখন হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের দিকে মনে মনে একটু আকর্ষণ হয়। এই আকর্ষণের আরও দুইটী কারণ ছিল। প্রথম, ভবানীপুরে আমার এক সহাধ্যায়ী বন্ধু থাকিতেন, তাঁহাকে আমি অতিশয় ভালবাসিতাম। তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি আমাকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং সমাজে যাইতে বলিতেন। দ্বিতীয়তঃ আমাদের বাসগ্রামে ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আন্দোলন উঠিয়াছিল। শিবকৃষ্ণ দত্ত নামে একজন যুবক সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বার্ত্তা আমাদের গ্রামে লইয়া যান, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার পিতা ব্রজনাথ দত্ত একজন উদারচেতা বিষয়ী লোক ছিলেন। পণ্ডিতগণের সহিত সর্ব্বদা শাস্ত্র আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লইতেন, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে সময়ে আমাদের গ্রামের বড় উন্নতির অবস্থা ছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম আচার্য্য আরাধ্য ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রদ্ধেয় বন্ধু কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু, রমানাথ ঘোষ প্রভৃতি শিবকৃষ্ণ দত্তের দৃষ্টান্ত ও প্রভাবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অনুসারে অনুষ্ঠানাদি

করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেজন্য গ্রামে মহা আন্দোলন ও এই যুবকদিগের প্রতি মহা নির্য্যাতন উপস্থিত হয়। সেই নির্য্যাতনের মধ্যে ইহাঁরা বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন। সেজন্য আমরা গ্রামবাসী যুবকগণ মনে মনে ইহাঁদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম। ১৮৫৯ সালে আমাদের গ্রাম-প্রবাসী টাকীনিবাসী ডাক্তার প্রিয়নাথ রায় চৌধুরীর যত্নে ও ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে এক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হওয়া মাত্র আমার মা আমার ভগিনীদিগকে তাহাতে প্রেরণ করিলেন। প্রিয়নাথবাবু গ্রাম হইতে চলিয়া গেলে, স্কুলটি রক্ষার ভার ব্রাহ্ম-যুবকগণের উপরে পড়িল। গ্রামের জমিদারগণ যখন ব্রাহ্মদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন তখন বালিকা-বিদ্যালয়টী উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মগণ বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণার্থ একখণ্ড জমি মৌরশী-পাট্টাতে লইয়াছিলেন। জমিদার বাবুরা সেই জমি হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। ইহাতে ব্রাহ্মদের প্রভাব বাড়িয়া গেল। তখন অন্য প্রকার নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। একজন ব্রাহ্ম-যুবক "পাড়াগাঁয়ে একি দায় ধর্ম্ম রক্ষার কি উপায়?" নাম দিয়া এক নাটক রচনা করিলেন। তাহাতে জমিদারবাবুদিগকে লোক-চক্ষে উপহাসাস্পদ করিবার চেষ্টা করা হইল। বিবাদটা আরও পাকিয়া গেল। অবশেষে জমিদার বাবুরা বাড়ীতে বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া বালিকা-বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাইতে নিষেধ করিলেন। অধিকাংশ গৃহস্থই সে নিষেধ শুনিল, শুধু আমার বাবা ও মা শুনিলেন না। তাঁহারা উভয়ে তেজী মানুষ, অতিশয় ন্যায়পরায়ণ সত্যপরায়ণ লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রিয় লোক, তাঁহারা লোকের বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতির অনেক দোষগুণ আমার পিতাতে ছিল।

তিনি বলিলেন, "কি! আমার মেয়ে পড়াব কি না, তার হুকুম অন্যে দিবে? যদি কাহারও মেয়ে স্কুলে না যায়, আমার মেয়ে যাবে।" এই বলিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের পণ্ডিতকে বলিলেন, "কেবল আমার মেয়ে আস্‌বে ও তুমি আস্‌বে, স্কুল কখনও বন্ধ করো না। তাহলে গভর্ণমেণ্টের কাছে রিপোর্ট করে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্দ করে দেব।" বাস্তবিক কিছুদিন আমার ভগিনীদ্বয় ও পণ্ডিত মহাশয় এই তিন জনকে লইয়া স্কুল চলিল। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার হওয়াতে বাবা অগ্নি-সমান জ্বলিয়া উঠিলেন এবং ব্রাহ্মদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তখন তিনি বাড়ীর লোকের সমক্ষে ব্রাহ্মদের প্রশংসা করিতেন। ইহাও আমার ব্রাহ্ম-সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইবার অন্যতম কারণ।

জমিদার-বাবুদের এই বালিকা-বিদ্যালয় তুলিয়া দিবার চেষ্টার একটু ইতিবৃত্ত আছে, তাহা এখানে বর্ণনা করাই ভাল। বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য একটা ঘর নির্ম্মাণার্থ উমেশচন্দ্র দত্ত, হরনাথ বসু ও কালীনাথ দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্ম-যুবকগণ যখন খাজনা করিয়া একটু জমি লইলেন এবং তাহাতে একটা ঘর নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন জমিদার-বাবুরা তাহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিধিমতে সে কার্য্যে বাধা দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম-যুবকগণ স্কুল-ঘর নির্ম্মাণের জন্য শাল্‌তি করিয়া সুন্দরবনের ভিতর হইতে খুঁটি ও বেড়ার হেঁতাল প্রভৃতি আনাইলেন। গ্রামের পূর্ব্বপার্শ্বে খালের মধ্যে শাল্‌তি আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্ম-যুবকগণ সংবাদ পাইয়া খুঁটি প্রভৃতি আনিতে গেলেন। গিয়া দেখেন চারিদিকের শ্রমজীবী লোকের প্রতি জমিদার-বাবুদের হুকুম গিয়াছে যে খুঁটি প্রভৃতি কেহ বহিয়া দিবে না। তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান করিয়া এবং প্রলোভন দেখাইয়াও মুটে মজুর

পাইলেন না। অবশেষে কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু প্রভৃতি কাঁধে করিয়া খুঁটি প্রভৃতি বহিয়া স্কুলের জমিতে লইয়া যাইতে লাগিলেন। গ্রামের লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিল এবং চারিদিকে আলোচনা আরম্ভ হইল। কিন্তু তাঁহারা খুঁটি প্রভৃতি আনিয়া দেখেন যে ঘর নির্ম্মাণের জন্য যে ঘরামিদিগকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারা জমিদার-বাবুদের আদেশে ঘরামির কাজ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। তখন ব্রাহ্ম-যুবকগণ কোমর বাঁধিয়া নিজেরাই ঘরামির কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই কাজে প্রবৃত্ত রহিলেন। তাঁহারা জমি মাপিয়া, খুঁটী প্রভৃতি পুঁতিয়া রাত্রে ঘরে গেলেন। প্রাতে আসিয়া দেখেন যে তাঁহাদের পোঁতা খুঁটী প্রভৃতি নাই, তৎপরিবর্ত্তে জমির এক পার্শ্বে একখানি ছোট খড়ের ঘর বাঁধা রহিয়াছে; দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিকটবর্ত্তী পাড়ায় কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে শুকর মোল্লা নামক জমিদার-বাবুদের এক চাকর রাতারাতি ঐ ঘর বাঁধিয়া ভোরে ব্রাহ্ম-যুবকদের খুঁটিগুলি তুলিয়া কাঁধে করিয়া লইয়া গিয়াছে। বালিকা-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয় এবং অপর গ্রাম হইতে শ্বশুরালয়ে-যাওয়া এক যুবক ভোরে উঠিয়া ঐ খুঁটি প্রভৃতি লইয়া যাইতে দেখিয়াছে।

ইহার পর ব্রাহ্ম-যুবকগণ আদালতে শুকর মোল্লার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সেই মাম্‌লা মজিলপুর গ্রামের পাঁচ ছয় ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী বারিপুর গ্রামের আদালতে হইল। শুনিতে পাওয়া যায় জমিদার-বাবুরা ঐ মামলার জন্য শুকর মোল্লার নামে স্কুলের এক জাল দলীল প্রস্তুত করিয়াছিলেন; মাম্‌লা উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সে স্থানের সর্ব্বপ্রধান উকীলদিগকে নিযুক্ত করিয়া মামলা চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে ব্রাহ্ম-যুবকগণ কলিকাতার ব্রাহ্ম-বন্ধুদিগকে

বলিয়া কতিপয় নবীন ব্রাহ্ম উকীল সংগ্রহ করিলেন; তদ্ভিন্ন মাম্‌লা দেখিবার কৌতূহলবশতঃ কলিকাতা হইতে অনেক ব্রাহ্মযুবক বারিপুরে গেলেন। আদালতগৃহে ব্রাহ্ম দর্শকের ভিড়ের কথা শুনিয়া জমিদার-বাবুরা না কি বলিয়াছিলেন—"ও মা! আমরা ভেবেছিলাম গ্রামের ঐ কয়েকটা ছোঁড়াই বুঝি ব্রাহ্ম, দেশে এত ব্রাহ্ম আছে তা ত জান্‌তাম না।" যাহা হউক, মাম্‌লার শেষে শুকর মোল্লার কয়েক মাসের জন্য কয়েদ হইল। সে কয়েদ হইয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী আলিপুর সহরের জেলে আসিল। তখন আমি ভবানীপুরে থাকিতাম। আমার গ্রামবাসী ব্রাহ্মযুবক হরনাথ বসু মহাশয় কালীঘাটে থাকিতেন; শুকর মোল্লা মনীবের আদেশে অন্যায় কাজ করিয়া কয়েদ হইয়াছে, ইহার জন্য হরনাথ বাবু বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি কয়েদখানায় শুকর মোল্লাকে দেখিতে ও তাহার জন্য খাবার লইয়া যাইতে লাগিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, আমি তখনও প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিই নাই, কিন্তু সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু প্রভৃতি ব্রাহ্ম যুবকদিগকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। হরনাথ আমাকে শুকর মোল্লার কয়েদের জন্য দুঃখিত দেখিয়া, প্রতি রবিবার আলিপুর জেলখানায় গিয়া শুকর মোল্লাকে মিঠাই প্রভৃতি খাওয়াইয়া আসিবার ভার আমার প্রতি দিলেন। আমি তাহাই করিতে লাগিলাম। এই জন্য শুকর মোল্লার কয়েদের কথা আমার মনে আছে। আমি যখন প্রতি রবিবার গিয়া আলিপুর জেলে শুকর মোল্লাকে খাওয়াইতেছি, তখন গ্রামে জমিদার-বাবুদের শাসনে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠান বন্ধ হইয়াছে, কেবল আমার পিতামাতার দৃঢ়চিত্ততার গুণে আমার দুই ভগিনীকে লইয়া পণ্ডিত স্কুল চালাইতেছেন।

এখন নিজের জীবন-বিবরণ আবার বলি। চৌধুরী মহাশয়দিগের ভবনে অবস্থান-কালে ১৮৬৪ সালে আশ্বিন মাসে মহাঝড় ঘটে। সেই ঘটনা স্মৃতিতে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। সেটা পূজার ছুটির সময়, বোধ হয় পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিন। অনেকে পূজার সময় কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইতেছিল, সুতরাং পথে ঝড়ে পড়িতে হয়। আমার স্বগ্রামের একটী যুবক ও আমি দুইজনে ঝড়ের পূর্ব্বদিন শাল্‌তি করিয়া কালীঘাট হইতে বাসগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করি। সে দিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া জোরে বায়ু বহিতে আরম্ভ হয় ও বৃষ্টি নামে। সেই বায়ু ও বৃষ্টিতে আমরা কোনও প্রকারে শাল্‌তিতে বসিয়া রাত্রি কাটাইলাম, শয়নের সুখ আর হইল না। পরদিন প্রত্যূষে যখন মেঘের অন্তরালে ঊষার আলোক দেখা দিল, তখন দেখিলাম আমাদের শাল্‌তি, মগরাহাট নামক স্থানের উত্তরে জালাসি নামক দ্বীপগ্রামের কিঞ্চিৎ উত্তরে, বিশাল জলা ও ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে, ঝড় ও তরঙ্গের আঘাতে আন্দোলিতহইতেছে। বায়ুর বেগ এত অধিক যে সম্মুখদিকে এক পা অগ্রসর হওয়া কঠিন। কোনও প্রকারে শাল্‌তির চালকদ্বয় জালাসি গ্রামের বাজারের ধারে গিয়া শাল্‌তি লাগাইল। আমরা লাফাইয়া তীরে উঠিলাম এবং একটী দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম আমাদের ন্যায় আরও কয়েক জন শাল্‌তির যাত্রী নানাস্থান হইতে আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছে। তখনও কাহারও মনে হয় নাই যে ঝড় অবিলম্বে ভীষণ সাইক্লোনের আকার ধারণ করিবে। সকলে পরামর্শ হইতে লাগিল যে, সকলে মিলিয়া খিচুড়ী রাঁধিয়া খাওয়া যাক। যাত্রীদের মধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণ এই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন দুই-জনের জন্য রাঁধাও যা, দশজনের জন্য রাঁধাও তা। আমরা কৃতজ্ঞ-

চিত্তে সেই দুর্য্যোগের দিনে খিচুড়ী খাইতে পাইব বলিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলাম। কিন্তু দেবতা আর-একপ্রকার বন্দোবস্ত করিলেন। খিচুড়ীর পরামর্শ শেষ হইতে না হইতে, দোকানদারের সহিত চাউল দাউলের মূল্য নির্দ্ধারণ হইতে না হইতে, হুঁ হুঁ করিয়া সাইক্লোনের বায়ু ডাকিয়া আসিল। আমাদের চক্ষের সমক্ষে কয়েকখানি চালাঘর পড়িয়া গেল। অবশেষে যে দোকানে আমরা বসিয়া ছিলাম, সে ঘর কাঁপিতে লাগিল। আমরা বিপদ গণনা করিয়া কোমর বাঁধিতে লাগিলাম। তখনও দেখি যাত্রীদের মধ্যে একব্যক্তি তুড়ি দিয়া মন-আনন্দে "বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের" ইত্যাদি কীর্ত্তনটী গাইতেছেন। তাঁহাকে বলা গেল "মশাই গান রাখুন, কোমর বাঁধুন ; এ ঘর যে পড়ে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "রেখে দেও ঘর পড়া, গাইতে বড় ভাল লাগ্‌ছে ; শোন শোন কীর্ত্তনটা শোন।" আর শোন, চড় চড় করিয়া ঘর হেলিতে লাগিল, আমরা দৌড়িয়া বাহিরে গেলাম, সে ভদ্রলোকটী চাপা পড়িলেন। যেই ঘরের বাহির হওয়া অমনি আমাদিগকে ঝড়ে উড়াইয়া কোথায় লইয়া গেল! সৌভাগ্যক্রমে আমার স্বগ্রামবাসী সেই যুবক বন্ধুটার সহিত আমি হাতে হাত বাঁধিয়াছিলাম, আমাদের দুইজনকে অধিক দূরে লইয়া যাইতে পারিল না। একখানা দোকানঘর পড়িয়া গিয়া তাহার দুখানা চাল মাটীতে পড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আমরা দুজনে গিয়া তাহার উপরে পড়িলাম। পড়িয়া ভাঙ্গা ঘরের খুঁটি ধরিয়া ঝড় ভোগ করিতে ও থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখি সেই কীর্ত্তনকারী ভদ্রলোকটী পূর্ব্বকার দোকানঘরের চাল ফুঁড়িয়া উপরে উঠিতেছেন। আমাদিগকে অদূরে দেখিয়াই তিনি হাসিতে লাগিলেন, এবং অতি কষ্টে আমাদিগের নিকট আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বড় পিতৃপুণ্যে বেঁচে গেছি, আপনারা বোধ হয় ভাব্‌ছিলেন মারা

পড়েছি। আরও কিছুদিন কর্ম্মভোগ বাকি আছে কি না, এখন কেন যাব?" বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। তাঁর সেই হাসি আমার আজও মনে আছে। কতবার ভাবিয়াছি, এরূপ সুখে দুঃখে প্রসন্ন চিত্ত পাওয়া বড় সৌভাগ্যের বিষয়। কতকগুলি মানুষ এরূপ আছে, যাহা-দিগকে কিছুতেই বিষণ্ণ করিতে পারে না। ইহাদের অবস্থা স্পৃহণীয়।

কিয়ৎক্ষণ তিনজনে ঝড় ভোগ করিয়া পরামর্শ করা গেল, যে, অদূরে রাণীরাসমণির কাছারি বাড়ী দেখা যাইতেছে,—সে গ্রামটা তাঁরই জমিদারী,—সেই কাছারিতে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাউক। তিনজনে হাত-ধরাধরি করিয়া বাহির হইলাম। কাছারিবাড়ীর নিকটস্থ হইতে না হইতে সমগ্র বাড়ী ভূমিসাৎ হইল। চারিদিকের প্রাচীর পর্য্যন্ত ধরাশায়ী হইয়া সমভূম হইয়া গেল। তখন বাত্যার প্রকোপ, দুর্দ্দান্ত দৈত্যের বিক্রমের ন্যায় হইয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, গ্রামের একখানিও গৃহ দণ্ডায়মান নাই, সমুদয় সমভূম হইয়াছে। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে অদূরে একখানি গৃহ তখনও দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইল। স্থির করা গেল যে, সেখানে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাউক। গিয়া দেখি সেই গ্রামের স্ত্রীলোক বালকবালিকাতে সে ঘর পরিপূর্ণ। ঘরখানি নূতন ছিল বলিয়া তখনও দণ্ডায়মান আছে। সেই গৃহস্বামী অতিবৃদ্ধ, তাহার যুবক পুত্র বৃদ্ধ পিতামাতাকে তাড়াতাড়ি খাওয়াইয়া, ঘরের ভিতরে পূরিয়া বীরের ন্যায় কোমর বাঁধিয়াছে, এবং সেই ঝড়ে ছুটাছুটি করিয়া চারিদিকের স্ত্রীলোক বালকবালিকা সংগ্রহ করিয়া সেই ঘরে পুরিতেছে। আমরা ঘরের নিকটে পৌছিয়া দেখি স্ত্রীলোকে ঘর পরিপূর্ণ। আমাদের সঙ্গের ভদ্রলোকটি ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন, আমাদের দুই বন্ধুর কিরূপ সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। আমরা দ্বার হইতে ফিরিয়া পার্শ্বের দাবাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। তৎক্ষণাৎ সে দাবার চালটী আমা-

দের মাথার উপরে পড়িয়া গেল। তখন আমরা ভাবিলাম যে, এরূপে ঘরচাপা পড়িয়া মরা অপেক্ষা বাহিরের উঠানে বসিয়া ঝড় খাওয়া ভাল। এই ভাবিয়া বাহিরে যাইতেছি, এমন সময় গৃহের ভিতর হইতে এক বৃদ্ধা রমণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বাবা! তোমরা কোথায় যাও, এত লোকের যদি জায়গা হয়ে থাকে, তোমাদের দুজনেরও হবে।" তখন আমরা বাধ্য হইয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোক বালক-বালিকার ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, সেখানে না ঢুকিলেই ভাল ছিল। ক্রমে বেলা অবসান হইল। অপরাহ্ণ চারিটার পর ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। গ্রামস্থ যাহারা সেই গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা "বাবারে, মারে" করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় ভবনের উদ্দেশে যাত্রা করিল। আমাদের শাল্‌তির চালক দুইজন আমাদের বিছানা ও কিছু কিছু জিনিষ পত্র মাথায় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, শাল্‌তি খাল হইতে লইয়া এক পুকুরের ধারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, দড়ি ছিঁড়িয়া পুকুরের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। তখন আর উদ্ধার করিবার সময় নাই। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। তাহাদিগকে সেই ভাঙ্গা দাবাতে কোনও প্রকারে রাত্রিযাপন করিতে বলিয়া আমরা সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভাঙ্গা ঘরে রাত্রিযাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তাহারা পোদ নামক হীনজাতীয় লোকের ব্রাহ্মণ।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। সেই গৃহের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বীরপ্রকৃতি-সম্পন্ন যুবক পুত্র সমস্ত দিনের অনাহার ও গুরুতর শ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িল। পিতা মাতা ব্যাকুল হইয়া অনুরোধ করিতে লাগিল, "ওরে তুই মুখ হাত ধুয়ে ওই চৌকীর নীচে তোর ভাত আছে খা।" তখন আমরা সেই ঘরে নয়জন,—আমরা বিদেশীয়

পাঁচজন, ও বুড়োবুড়ী, যুবক পুত্র ও গর্ভিণী পুত্রবধূ এই চারিজন। পিতামাতার অনুরোধ ও ব্যগ্রতা দেখিয়া যুবকটি বলিল, "বাবুরা সমস্ত দিন অনাহারে আছেন, ওঁরা ঘরে বসে থাকবেন, আর আমি খাব, তা কি হয়?" কোনওরূপেই সে খাইবে না। ইহাতে আমরা বাহিরের লোক চটিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "সে কি কথা! এই বিপদে কি কেউ আতিথ্য করতে পারে? তুমি সমস্ত দিন ছুটাছুটি করেছ, তুমি ঐ ভাত খাও, কিছুই অন্যায় হবে না।" সে তাহা শুনিল না, বসিয়া রহিল। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা তোমাদের ঘরে আমাদের খাবার মত কিছু আছে কি না?" যুবক বলিল, "চাউল আছে, তা ভিজে গিয়েছে।" উত্তর, "আচ্ছা ভিজা চাউল আমাদিগকে দাও।" সেই ভিজা চাউল লইয়া আমি সকলকে দিলাম; বলিলাম, "ভাল লাগুক না-লাগুক আপনারা খান, তা না হলে ও-ব্যক্তি খাবে না।" আমরা ভিজা চাউল খাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। হঠাৎ মনে হইল, শালতিতে একহাঁড়ি মাষকলাই বাড়ীর জন্য লইয়া যাইতেছিলাম, সমস্ত দিন ভিজিয়া তাহাতে কল বাহির হইয়াছে। আমি সেই ভিজা কলাই আনিয়া সকলকে চাউলের সঙ্গে খাইতে দিলাম। আমাদের আহারটা বড় মন্দ হইল না। তৎপরে শয়নের ব্যাপার। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে যতগুলি লেপ কাঁথা মাদুর ছিল, সমুদয় সমাগত কম্পান্বিত বালক-বালিকাদিগকে চাপা দিবার জন্য দিয়াছিল। সমুদয় ভিজিয়া গিয়াছে, কেবল দুইটা সেঁত্‌লা মাদুর তখনও শুক্‌নো আছে। গৃহস্বামীর পুত্র প্রস্তাব করিল যে, তাহার একটাতে তাহারা সপরিবারে শয়ন করিবে, আর-একটাতে আমরা পাঁচজন শয়ন করিব। আমার সঙ্গের লোকেরা তাহাতে সম্মত হইয়া আদরের সহিত মাদুরটা লইলেন। তাহা লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হইল। আমি

বলিতে লাগিলাম "ছি! ছি! ও মাদুর নেবেন না, ওরা মাদুরে শুক।" এই প্রস্তাবে সঙ্গের পথিকেরা হাসিতে লাগিলেন, "আমরা পাঁচজনে এক মাদুরে শুই, ওরা চারজনে আর-এক মাদুরে শুক। এ বিপদে আর ভদ্রতা কর্‌বার সময় নাই।" এই কথাতে আমি রাগ করিয়া মাদুরের বাহিরে কাদাতে শুইয়া অগাধ নিদ্রা দিলাম।

পরদিন প্রাতে যখন চক্ষু খুলিলাম, তখন দেখি বেশ রোদ উঠিয়াছে। আমার অগ্রেই আর সকলে জাগিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছিলেন। আমি বাহিরে গিয়া দেখি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার যুবক পুত্রটি আমাদের শাল্‌তির চালকদ্বয়ের সঙ্গে পুকুরে ডুবিয়া ডুবিয়া শাল্‌তিখানি তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়া তাহাকে ওপ্রকার জলে ডুবিতে বারণ করিলাম, কিন্তু সে সে-কথার প্রতি কর্ণপাত করিল না। ক্রমে তিনজনে শালতিখানি তুলিল। চালকদ্বয় তাহার জল ছেঁচিয়া পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল, ব্রাহ্মণযুবক কুলীর ন্যায় মাথায় করিয়া আমাদের জিনিসপত্র বহন করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমি চাহিয়া দেখি যে সেই সময়ে পথে পতিত একটা ভগ্ন বোল্‌তার চাকের উপরে পা দেওয়ায় তাহার পায়ে অনেকগুলি বোল্‌তা কামড়াইয়াছে, তাহার পা ফুলিয়া উঠিতেছে, তবু সে সেই কাজ করিতেছে। তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞতার উদয় হইল, তাহা আর ভাষায় বর্ণন করিবার নহে। আমি ব্রাহ্মণ-তনয়কে পরে অর্থসাহায্য করিয়াছিলাম, এবং পরে যখনই শাল্‌তি করিয়া বাড়ী যাইতাম, সেই গ্রামে উঠিয়া তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিয়া যাইতাম। সে গ্রামটা যেন আমার তীর্থস্থানের ন্যায় হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে একবার গিয়া আর তাহাদের উদ্দেশ পাইলাম না।

আবার নিজের কার্য্যবিবরণ বলি। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের

বাড়ীতে থাকিতে থাকিতে ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ সালে এই ভবানীপুরের একটী ভদ্রসন্তান কোনও গুরুতর অপরাধে দ্বীপান্তরে প্রেরিত হয়। সেই ঘটনাতে ভবানীপুরের লোকের চিত্তকে অতিশয় আন্দোলিত করে। আমারও চিত্তকে অতিশয় আন্দোলিত করে। সেইপ্রকার মনের ভাব লইয়া কবিতা লিখিতে বসি। কবিতাটি মাতুলের সংবাদপত্রে "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" নাম দিয়া প্রকাশ করি। এই প্রথম কবিতা লেখা নয়। ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে সোমপ্রকাশে ও প্যারীচরণ সরকারের সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিতাম। লোকে পড়িয়া প্রশংসা করিত। তাহাতে কবিতা লিখিতে উৎসাহিত হইতাম।

এই সময়ে প্যারীচরণ সরকার মহাশয় এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ও সুরাপান-নিবারিণী-সভার সভাপতি ছিলেন। কবিতা-লেখা সূত্রে তাঁহার সহিত আমার একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রফেসরী করিতেন এবং এডুকেশন গেজেট সম্পাদন করিতেন। আমি তাঁর কাগজে প্রথমে কয়েকটী ছোট ছোট কবিতা মুদ্রিত করি। তাহাতে তিনি প্রীত হন; এবং আমাকে লিখিতে উৎসাহিত করেন। তৎপরে এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমার কবিত্বশক্তিকে আর-একদিকে লইয়া গেল। আমাদের ভবানীপুরে একজন বিলাত-ফেরত ডাক্তার আসিয়া বসিলেন, তাঁহার হাব-ভাব চাল-চলন সবই ইংরাজী ধরণের। তিনি নিজের দ্বারে এক সাইনবোর্ড দিলেন, তাহাতে ডট বলিয়া নিজের উপাধি লিখিলেন। এই লইয়া আমাদের যুবকদলে হাসাহাসি পড়িয়া গেল। অমনি আমি বাঙ্গালীর সাহেবীয়ানার উপর বিদ্রূপ বর্ষণের জন্য বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী সাজিয়া "এস এন ডট" নাম লইয়া এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখিতে লাগিলাম, বাঙ্গালীর প্রিয় যাহা তাহার উপরে বিদ্রূপ-বর্ষণ করিতে লাগিলাম,

এবং ইংরাজী যাহা-কিছু তাহার উপর আদর দেখাইতে লাগিলাম, স্বদেশী ভাবাপন্ন হইয়া আর একজন কবিতাতে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কবিতা-যুদ্ধ চলিতে লাগিল, চারিদিকে একটা চর্চ্চা উঠিয়া গেল। আমার কবিতাতে কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, আমিও স্বদেশীভাবাপন্ন, কেবল সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে বিদ্রূপ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছি। ঐ-সকল কবিতার দুই এক ছত্র মনে আছে। তাহা দেখিলে সকলে হাসিবেন। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কবি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশংসা করাতে আমি বঙ্গভূমির প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

বিদ্যার সাগর তব মূর্খের প্রধান,
টীকিদার ভট্টাচার্য্য নাহি কোন জ্ঞান।

ইংরাজ মেয়েদের প্রশংসা করিয়া লিখিলাম :—

ধবলাঙ্গী তাম্রকেশী বিড়াল-লোচনা,
বিবাহ করিব সুখে ইংরাজ-ললনা।

এই সূত্রে প্যারীবাবুর নিকট আমার একটা পসার দাঁড়াইল। তাহার একটা ফল মনে আছে। ইহা বোধ হয় ইহার কিছু দিন পরে ঘটিয়া থাকিবে। একবার আমার বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামবাসী প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্যতম ছাত্র নবীনচন্দ্র সেনের লিখিত একটী কবিতা আনিয়া আমাকে দেখাইলেন। কবিতাটী পড়িয়া আমার বড় ভাল লাগিল। আমি উমেশের সঙ্গে নবীনবাবুর বাসাতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম; এবং সেই কবিতাটী এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহিত করিলাম। আমার অনুরোধে তিনি কবিতাটী আমার হাতে দিলেন। আমি কাটিয়া কুটিয়া তাহাতে নিজে কিছু যোগ করিয়া প্যারীবাবুর হাতে দিয়া

আসিলাম। তিনি তাহা এডুকেশন গেজেটে ছাপিলেন এবং নবীনকে ডাকিয়া উৎসাহিত করিলেন। পরে নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের কবিতা-গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে পড়িয়া দেখিয়াছি, তাহাতে সেই কবিতাটী আছে এবং, যতদূর মনে হয়, আমার প্রক্ষিপ্ত দুই চারি পংক্তি এখনও রহিয়াছে। আমার এখন স্মরণ করিয়া হাসি পায়, আমি সেই অল্প বয়সে কাব্য-জগতে কিরূপ মুরুব্বি হইয়া উঠিয়াছিলাম।

প্যারীবাবুর সংশ্রবে আসিয়া আমার আর-এক উপকার হইল। সুরাপানের উপর আমার দারুণ বিদ্বেষ জন্মিল। তাহার একটী প্রমাণ আমার মনে আছে। আমি অগ্রেই বলিয়াছি, ভবানীপুরে যে চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয়ে আমি থাকিতাম, তাঁহারা সকলেই সাধু সদাশয় লোক ছিলেন, তাঁহাদের বিমল চরিত্রের প্রভাব আমাকে অনেক পরিমাণে গঠন করিয়াছে। তাঁহাদের একজন স্বসম্পর্কীয় লোক ছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদের সঙ্গে দুই চারি দিন যাপন করিতেন। তিনি একটা সওদাগর আফিসে একটা বড় পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন: অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন এবং দুই হস্তে ব্যয় করিতেন। বন্দুক ছোড়া, শিকার করা, সদলে নৌকাযোগে জলপথে বিচরণ করা, প্রভৃতি আমোদে অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। এই-সব কারণে তিনি আমার ন্যায় যুবকদের চক্ষে একটা "হিরোর" মত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটু দোষ ছিল, তিনি সুরাপান করিতেন। একবার অপরাপর কয়েক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সঙ্গে গঙ্গার চড়াতে কয়েকদিন বাস করিতে গিয়াছিলাম। প্রতিদিন পাখী শিকারের সময় সঙ্গে যাইতাম, কিন্তু তাঁহাকে কখনও মাতাল অবস্থাতে দেখি নাই। যাহা হউক, তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদাই সুরাপান করিবার জন্য প্ররোচনা করিতেন; বলিতেন পরিমিত সুরাপান করিলে শরীর ভাল থাকে,

মনে স্ফূর্ত্তি থাকে, কাজের শক্তি বাড়ে, ইত্যাদি। আমার যেন স্মরণ হয় যে, তাঁহার প্ররোচনায় একদিন কি দুই দিন একটু একটু সুরাপান করিয়াছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য জগদীশ্বরের কৃপা! তৎপরেই মনে মহা নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। প্যারীচরণ সরকার মহাশয়কে, মাতুল মহাশয়কে ও পিতাঠাকুরকে স্মরণ করিয়া মহা লজ্জিত হইলাম এবং সুরাপান নিবারণের জন্য দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হইলাম। তদবধি আমি সুরাপান নিবারণের পক্ষে রহিয়াছি।

সে যাহা হউক, মাতুলের হস্তে যখন নির্ব্বাসিতের বিলাপের প্রথম কয়েক পংক্তি মুদ্রিত করিবার জন্য দিয়া আসিলাম, তখন ভয়ে-ভয়েই দিয়া আসিলাম। মনে হইল তিনি ডাকিয়া তিরস্কার করিবেন। মনে করিয়াছিলাম, দুই একবার লিখিয়া সমাপ্ত করিব, কিন্তু প্রথমবার কয়েক পংক্তি বাহির হইলে, তিনি কলেজে আমাকে ডাকিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং আরও কবিতা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অতিশয় উৎসাহিত হইয়া গেলাম। অমনি আরও লিখিতে বসিলাম। এইরূপ সপ্তাহের পর সপ্তাহ সোমপ্রকাশে কবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল। কয়েকবার প্রকাশিত হইতে না হইতে চারিদিকে সমালোচনা উঠিয়া গেল। পথে ঘাটে, ভাড়াটে গাড়িতে লোকে বলিতে লাগিল, "এ শ্রীশিঃ কে হে?" আমার লাঙ্গুল স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। নিজের মনে মনে মস্ত একটা কবি হইয়া দাঁড়াইলাম। বাস্তবিক তখন আমার কবিতার মধ্যে একটু নূতনত্ব ছিল। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাঁধা মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোলা অমিত্রাক্ষর ছিল না, কিন্তু দুইয়ের মধ্যস্থলে যাহা তাহাই ছিল। ভাবকে ছন্দের বশবর্ত্তী না করিয়া ছন্দকে ভাবের বশবর্ত্তী করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই জন্য ইহা তখন সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

সাল ও তারিখ মনে নাই, এই ভবানীপুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয়ে বাসের কালে, একবার আমার পিতাঠাকুর মহাশয় একখানি সরকারি কাগজ আমার নিকট পাঠাইয়া আদেশ করিলেন তাহা আমাকে স্বয়ং গিয়া স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেবের হাতে দিতে হইবে। তদনুসারে একদিন কলেজে যাইবার পথে আমি উড্রো সাহেবের আপীসে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার আপীস-গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সাহেব তখন পাশের ঘরে আহারে বসিয়াছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরেই উপস্থিত হইলেন। আমি অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে কাগজখানি দিলাম। তিনি কাগজখানি লইতে চাহিলেন না, বলিলেন, "তুমি আপীসঘরের বাহিরে জুতা খুলিয়া এস নাই কেন?"

আমি। এ ঘরে প্রবেশ করিবার সময় জুতা খুলিতে হয় এ নিয়ম যে আছে তা তো জানিতাম না, তাহা হইলে এ ঘরে প্রবেশ করিতাম না।

ব্যাপারখানা এই—তখন আমার এমনি দারিদ্র্য ও দুরবস্থা যে, আমাকে চটি জুতাই সর্ব্বদা পরিতে হইত, বুট জুতা পরা ভাগ্যে ঘটিত না। সুতরাং সেদিন চটি জুতা পায়ে দিয়াই কলেজে যাইবার পথে সাহেবের আপীসে গিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়াই সাহেব চটিয়াছিলেন।

উড্রো সাহেব। তুমি জুতা পরিয়া এ ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে অপমান করিয়াছ। তুমি জুতা খুলিয়া এস।

আমি। না সাহেব, আমি জুতা খুলিব না। আমি কিরূপে আপনার অপমান করিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পায়ে জুতা রহিয়াছে, আপনার কেরানী বাবুর পায়ে জুতা দেখিতেছি। আপনারা যদি খোলেন তবে আমি খুলিতে পারি।

উড্রো সাহেব। ও যে বুট জুতা।

আমি। বুট জুতা পায়ে দিয়ে এলে আপনার মান থাকিত, আর চটি জুতা পায় দিয়া আসাতে আপনার মান গেল, এ নূতন কথা, ইহা আমি কিরূপে বুঝিব ?

উড্রো সাহেব। হাঁ, আমার আপীসের এ নিয়ম আছে, তাহা তুমি কি জান না ?

আমি। না সাহেব ! আমার জন্মে এমন নিয়ম শুনি নাই।

উড্রো সাহেব। তুমি জুতা খুলিবে কি না বল ?

আমি। না সাহেব খুল্‌ব না।

উড্রো সাহেব। তবে তোমার চিঠি নেব না।

আমি। এই কাগজ আপনার ডেস্কের উপর রৈল, ও আপনাদেরই কাগজ, নেন নেবেন, না নেন না নেবেন। আমার কাজ আমি করে গেলাম।

এই বলিয়া ডেক্‌সের উপর কাগজ রাখিয়া আমি যাইতে উদ্যত। সাহেব বলিলেন, "শোন শোন দাঁড়াও।" আমি দাঁড়াইলাম।

সাহেব। রাজা রাধাকান্ত দেব অত্যন্ত পীড়িত, তুমি কি শুনেছ ?

আমি। হাঁ সাহেব, শুনেছি।

সাহেব। আমার গাড়ি জোতা হচ্চে, আমি এখনই তাঁকে দেখ্‌তে যাব, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে ?

আমি। না সাহেব, আমাকে কলেজে যেতে হবে; বেলা হয়ে যাচ্চে।

সাহেব। আচ্ছা, যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও, তাঁর ঘরে প্রবেশ কর্‌বার সময় জুতা খুল্‌বে কি না ?

আমি সেখানে জুতা খুলিবার কারণ বলিতে যাইতেছি, সাহেব

বাধা দিয়া বলিলেন, "হাঁ" কি "না" বল, আমি আর কিছু শুন্‌তে চাই না।

আমি। হাঁ সাহেব, সেখানে খুল্‌ব।

সাহেব। তবে আমার এখানে খুল্‌বে না কেন?

আমি। আপনি কারণ শুন্‌বেন না, তবে আমি কি কর্‌ব?

কারণটা শুনিলে বলিতাম যে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বৈঠকখানাতে জাজিম পাতা থাকে; সকলেই জুতা খুলিয়া প্রবেশ করে; সুতরাং আমাকেও এইভাবে প্রবেশ করিতে হইত। কিন্তু সাহেব যখন আমার কথাতে কান দিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিলাম, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ঘরের বাহির হইলাম। সাহেব আবার ডাকিলেন, "ছোক্‌রা শোন শোন।" আমি আবার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

সাহেব। তুমি একটা কথা শুনেছ—নিজের মান যদি চাও অপরের মান আগে রাখ।

আমি। সাহেব, ও খুব ভাল কথা, আমি অনেক দিন শুনেছি।

এই বলিয়া আবার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ত্বরিত পদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া কলেজের দিকে ছুটিলাম।

বড়মামা বৈকালে আমাকে ডাকাইয়া সমুদয় কথা শুনিলেন। বলিলেন, উড্রোসাহেব যে তোমাকে জুতা খুলাইতে পারেন নাই ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার ভাগিনার মত কাজ করিয়াছ। তৎপরে তিনি সোমপ্রকাশের জন্য ইহার একটি বিবরণ লিখিয়া দিতে বলিলেন। আমি "উড্রোসাহেব ও চটিজুতা" হেডিং দিয়া ইহার একটি বিবরণ লিখিয়া দিলাম। পরবর্ত্তী সোমবারে "ফল্‌না সাহেব ও চটিজুতা" হেডিং দিয়া বড়মামা সেটী বাহির করিলেন, এবং বেচারি উড্রোসাহেবের উদ্দেশে অনেক উত্তম মধ্যম তিরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। পরে শুনিতে

পাইলাম, উড্রোসাহেব তাহা পাঠ করিয়া আমার প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন; এবং আপীসের বাবুদিগকে বলিলেন, এই ছেলে কলেজ থেকে বাহির হইয়া যদি কর্ম্মপ্রার্থী হয় আমাকে জানাইও। আমি উড্রোসাহেবের ন্যায় সদাশয় পুরুষের বিষ নয়নে পড়িয়া গেলাম ভাবিয়া বড় দুঃখ হইল। তিনি অতি সদাশয় মানুষ ছিলেন বলিয়া এ কথা তাঁর মনে ছিল না; কারণ পরবর্ত্তী সময়ে আমি যখন ভবানীপুরের সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল হইতে হেয়ার স্কুলে আসি, তখন তিনিই উদ্যোগী হইয়া আমাকে আনিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাঁহার আদেশ-মত আমার নাম তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন নাই; করিলে কি দাঁড়াইত জানি না। উড্রোসাহেব যেরূপ সদাশয় পুরুষ ছিলেন, এবং আমার ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বান স্কুলের কাজে যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে সবিশেষ বিবরণ জানিলেও কিছু বলিতেন না এইরূপ মনে হয়। আমার মাতুল মহাশয় সোমপ্রকাশে আন্দোলন করিয়াছিলেন বলিয়াই কথাটা আমার মনে রহিয়াছে।

আমি যখন কবিতারসে নিমগ্ন আছি, তখন এক পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটিল। কোনও বিশেষ কারণে আমার পিতা আমার পত্নী প্রসন্নময়ীর ও তাঁর বাড়ীর লোকের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন তাঁহাকে আর আনিবেন না। তাঁহাকে একেবারে বর্জ্জন করা যখন স্থির হইল, তখন এই প্রশ্ন উঠিল, যে, আমি ত একমাত্র পুত্রসন্তান, বংশরক্ষার উপায় কি হইবে? অতএব আমার পুনরায় বিবাহ দেওয়া স্থির হইল। আমার এরূপ বয়স হইয়াছিল যে বহুবিবাহকে মন্দ বলিয়া জানি। প্রসন্নময়ীর প্রতি তখন আমার যে বড় ভালবাসা ছিল, তাহা নহে। তবে তাঁহার ও তাঁহার বাড়ীর লোকের সামান্য অপরাধে তাঁহাকে গুরুতর সাজা

দেওয়া হইতেছে ইহা অনুভব করিয়াছিলাম। আমি কিরূপে এইরূপ কঠিন ব্যবহারে সহায়তা করি ইহা ভাবিয়া মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু বাল্যাবধি পিতাকে এরূপ ভয় করিতাম যে, তাঁহার ইচ্ছাতে বাধা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। তথাপি আমি নিজে ও জননীর দ্বারা তাঁহাকে জানিতে দিয়াছিলাম যে এরূপ বিবাহে আমার মত নাই। এখানে একটী ঘটনা উল্লেখ-যোগ্য। বাবা আমাকে বিবাহ দিতে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে লইতে ভবানীপুরে মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে আসিলেন, এবং আমাকে লইয়া গেলেন। পথে আমার দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে বুঝাইতে চলিলেন। আমি তাঁহাকে বড় ভয় করিতাম, তাঁহার মুখের উপর কিছু বলিতে পারিতেছি না, সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি। অবশেষে আমাদের গ্রামের দুই ক্রোশ উত্তরবর্তী বারাসত গ্রামে যাইবার সময় আমি বাবাকে বলিলাম, "বাবা আপনি মনে করিতেছেন আমার স্ত্রীকে বিদায় করিয়া দিয়া আমার শ্বশুরবাড়ীর লোকদিগকে সাজা দিবেন; কিন্তু ফলে এ সাজা আমাদিগকেই পেতে হবে, আমার বোধ হয় এরূপ কাজ না করাই ভাল।" যেই এই কথা বলা, অমনি বাবা ফিরিয়া দাড়াইলেন এবং নিজের পায়ের জুতা হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন—"তুই এখান হতে ফিরে যা, আর এক পা তুলেছিস কি এই জুতা মারবো।" আমি বলিলাম, "চলুন বাড়ীতে গিয়ে মার সাম্নে কথা হবে। আমার বক্তব্য যা তা আমি বল্লাম, তারপর করা না করা আপনার হাত।" তারপর দুজনে বাড়ীতে যাওয়া গেল। আমি গিয়া মাকে বলিলাম "মা, এ কি হচ্ছে? আমার স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের উপর রাগ করে এ কি করা হচ্ছে?" মা বলিলেন "জানিস ত আমার কাঁধের উপর একটা বৈ মাথা নাই, আমি বাধা দিয়ে

রাখ্‌তে পার্‌ব না, যা জানে করুক।" বাবা আমাদের আপত্তির প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না। আমাকে ধরিয়া বিবাহ দিতে লইয়া গেলেন। এই দ্বিতীয় বিবাহ বর্দ্ধমান জেলার দেপুর নামক গ্রামের অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিরাজমোহিনীর সহিত হইল। বিবাহটা ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ কোন্ সালে হইয়াছিল ঠিক মনে নাই।

এই বিবাহের পরেই আমার মনে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। একটী নিরপরাধা স্ত্রীলোককে অন্যায়রূপে গুরুতর সাজা দেওয়া হইল, এবং আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই অন্যায় কার্য্যের প্রধান পুরুষ হইলাম, ইহা ভাবিয়া লজ্জা ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পিতার আদেশে বিবাহ করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমি এই ভাবিয়া মনকে প্রস্তুত করিয়াছিলাম যে রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস করিয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন, আমি না হয় পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া চিরকাল কষ্ট পাইব। কিন্তু এই অনুতাপের মুহূর্ত্তে সে চিন্তা আর আমাকে বল দিতে পারিল না। আমি মনে করিতে লাগিলাম, মানুষ আপনার কাজের জন্য আপনিই দায়ী, হাজার গুরুর আদেশ হইলেও পাপের অংশ কেহ লয় না। আত্মনিন্দাতে আমার মন অধীর হইয়া উঠিল। সে তীব্র আত্মনিন্দার কথা মনে হইলেও এখন শরীর কম্পিত হয়। আমি আমুদে উপহাস-রসিক বন্ধুতাপ্রিয় মানুষ ছিলাম, আমার হাস্য-পরিহাস কোথায় উবিয়া গেল। আমি ঘন বিষাদে নিমগ্ন হইলাম। পা ফেলিবার সময় মনে হইত যেন কোনও নীচের গর্ত্তে পা ফেলিতে যাইতেছি। রাত্রি আসিলে মনে হইত আর প্রভাত না হইলে ভাল হয়।

এই অবস্থাতে আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাস কখনও করি নাই। আমার স্মরণ আছে, এই সময়ে আমার

পিতা আমার নিকট অনেক সময় সংস্কৃত নাস্তিক দর্শনের রীতি অবলম্বনে নাস্তিকতা প্রচার করিতেন। বলিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় আস্তিক নহেন, ইত্যাদি। ইহা লইয়া পিতা-মাতাতে কখনও কখনও ঝগড়া হইয়াছে দেখিয়াছি। বাবার সঙ্গে এরূপ বিচারে প্রবৃত্ত আছি দেখিলে, মা বাবার প্রতি রাগ করিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতেন। বলিতেন, "রাখ রাখ তোমার নাস্তিক দর্শন রাখ, ছেলের মাথা খেও না।' কিন্তু নাস্তিকতা আমার মনে ভাল লাগিত না; মনে বসিত না। আমি বালক-কাল হইতে পাড়ার সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে আলোচনা করিতে ভাল বাসিতাম। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে কখনও গুরুতররূপে চিন্তা করি নাই। ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনার অভ্যাস ছিল না। এই মানসিক গ্লানির অবস্থাতে তাহা করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার মানসিক অবসাদের কথা অবগত হইয়া আমাকে একখানি থিওডোর পার্কারের Ten Sermons and Prayers পাঠাইয়া দিলেন। পার্কারের প্রার্থনাগুলি যেন আমার চিত্তে নবজীবন আনিল। আমি প্রতিদিন রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একখানি খাতাতে একটী প্রার্থনা লিখিয়া পাঠ করিয়া শয়ন করিতে লাগিলাম। কেবল তাহাই নহে; দিনের মধ্যে প্রত্যেক দশ পনর মিনিট অন্তর ঈশ্বর স্মরণ করিতাম ও প্রার্থনা করিতাম। দুঃখের বিষয় আমার সে প্রার্থনার খাতাখানি হারাইয়াছে। নতুবা ধর্ম্মজীবনের শৈশবের সেই আধ আধ ভাষা আজ দেখিতাম।

প্রার্থনা করিতে করিতে হৃদয়ে দুইটী পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম। প্রথম, দুর্ব্বলতার মধ্যে বল আসিল; আমি মনে সংকল্প করিলাম,

"কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা, যায় যাক থাকে থাক ধন মান প্রাণ রে।" আমি ধর্ম্মের আদেশ ও হৃদয়বাসী ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলিবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম। দ্বিতীয়, ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজে ঈশ্বরের উপাসনাতে যাইব স্থির করিলাম। যাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু পাছে আমাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করেন, পাছে লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, এই ভয়ে উপাসনা আরম্ভ হইলে যাইতাম ও উপাসনা ভাঙ্গিবার অগ্রেই চলিয়া আসিতাম।

এই সময় হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে আমার একটু একটু করিয়া যোগ হইতে লাগিল। আমার সমাধ্যায়ী বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যিনি পরে বিলাতে গিয়া ডাক্তার হইয়া আসিয়াছিলেন) তখন ব্রাহ্মদের নিকট সর্ব্বদা যাইতেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কথা আমাকে আসিয়া বলিতেন; এবং ব্রাহ্মদের প্রকাশিত পত্রিকাদি আনিয়া আমাকে পড়িতে দিতেন। কিন্তু আমাকে ব্রাহ্মদের কাছে লইতে চাহিলে লজ্জাতে যাইতে চাহিতাম না। একদিনের কথা স্মরণ হয়। উমেশ আমাকে ও যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (যিনি পরে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন) ভজাইয়া কেশববাবুর কলুটোলার বাড়ীতে লইয়া গিয়া দেখা করাইয়া দিতে চাহিলেন। আমি কেশব বাবুর বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেলাম, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে পা বাড়াইতে পারিলাম না, উমেশের হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেলাম। আর-একবার উমেশ ও আমি চিৎপুর রোড দিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে বৃষ্টি আসিল। তখন কেশববাবু চিৎপুর রোডে কলিকাতা কলেজ নামে একটী কলেজ খুলিয়াছিলেন। আমরা বৃষ্টির ভয়ে ঐ কলেজের বারাণ্ডার নীচে গিয়া দাঁড়াইলাম। উমেশ আমাকে ভিতরে যাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; আমি লজ্জাতে ভিতরে যাইতে

পারিলাম না। এমন সময় একটী পশ্চিমে বেহারা উপর হইতে নামিয়া আসিল। আমরা কেশববাবুর কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিতে লাগিল—"কেশববাবু মানুষ নয় দেবতা, তাঁর কাছে চল, ছুটী কথা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।" তার প্রভু-ভক্তি দেখিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা কেশববাবুর কল্পিত নিন্দা আরম্ভ করিলাম। তাহাতে সে অতিশয় বিরক্ত হইল; এবং অবশেষে আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া কেশববাবুর দীর্ঘজীবন জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। আমি দেখিয়া স্তব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বলিলাম, "উমেশ, এ সামান্য মানুষ নয়, যাঁর চাকর এত দূর আকৃষ্ট হতে পারে।" তখন উমেশ আবার আমাকে কেশববাবুর নিকট যাইবার জন্য চাপিয়া ধরিল; কিন্তু আমি লজ্জাবশতঃ যাইতে পারিলাম না।

ইহার পরে উমেশ যোগেন্দ্র ও অপরাপর ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে আমি আমাদের পূর্ব্বতন সহাধ্যায়ী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত এই বন্ধুদ্বয়ের বাসাতে মধ্যে মধ্যে যাইতে লাগিলাম। ইহাঁরা এক সময় আমাদের সঙ্গে একশ্রেণীতে পড়িতেন; কিন্তু তখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারক হইয়াছিলেন। একদিন রাত্রে বিজয় ও অঘোর আমাকে আর ভবানীপুরে যাইতে দিলেন না, নিজেদের বাসাতে রাখিলেন। আমার স্মরণ আছে যে সে রাত্রে তাঁহাদের বাসাতে অন্ত্যজাতীয়া স্ত্রীলোকের রাঁধা ভাত মাটীর সানকে খাইয়া সমস্ত রাত্রি এত গা ঘিনঘিন করিয়াছিল যে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারি নাই।

প্রার্থনা আমাকে বল আনিয়া দিল যে বলিয়াছি, তাহার অর্থ এই যে, মানুষের ভয় আমার মন হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল এবং নিজ বিশ্বাস অনুসারে চলিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। পিতা কলিকাতায় আসিয়া শুনিলেন যে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনাতে যাইতেছি।

একদিন আমাকে ডাকিয়া সমাজে যাইতে নিষেধ করিলেন। আমি ধীরভাবে বলিলাম, "বাবা, আপনি জানেন আপনার আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করি নাই, আপনার সকল আজ্ঞা পালন করিতে রাজি আছি, কিন্তু আমার ধর্ম্মজীবনে হাত দিবেন না। আমি ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনাতে যাওয়া ত্যাগ করিতে পারিব না।" পরের বাসাতে পিতা আর কোন কথা বলিলেন না; কিন্তু এই উত্তর তাঁহার এমনি নূতন ও ভয়ানক লাগিল, যে, পরে শুনিয়াছি, সেদিন অনেক কাঁদিয়াছিলেন; আর দুই তিন দিন তাঁহার কলিকাতাতে থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু তৎপর দিনই দেশে চলিয়া গেলেন।

পরে শুনিয়াছি তিনি বাড়ীতে পৌঁছিলে তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আমার মা ভীত হইয়া গেলেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখ এত ম্লান কেন, ছেলে কেমন আছে?" বাবা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "সে মরেছে।" অমনি আমার মা, "কি বলগো! ওগো কি বলগো!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া পাশের বাড়ীর মেয়েরা ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "কৈ শিবুর ব্যায়রামের কথা ত শুনি নাই।" তখন বাবা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সে মরার মধ্যে। সে ব্রাহ্মসমাজে যেতে আরম্ভ করেছে, আমি বারণ কর্‌লেও শুন্‌বে না।"

যাহা হউক প্রার্থনার দ্বারা যেমন বল পাইলাম তেমনি আশাও পাইলাম। আমার অন্তরাত্মা বলিতে লাগিল, ঈশ্বর আমাকে পাপী বলিয়া ত্যাগ করিবেন না। আমার বোধ হয় পার্কারের সরস ও আশান্বিত ভক্তি এবিষয়ে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, ব্যাকুল প্রার্থনা বিফলে যায় না তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। ভগবানের প্রেরণা প্রাণে পাইয়া মন আনন্দে মগ্ন হইতে লাগিল। তদবধি

প্রার্থনাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তৎপরে আমি অনেক প্রলোভনে পড়িয়াছি, সময়ে সময়ে পতিত হইয়াছি, অনেক অন্ধকার দেখিয়াছি, কিন্তু প্রার্থনাতে বিশ্বাস আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। সকল সংগ্রামের মধ্যে দুর্ব্বলতাতে বল, নিরাশাতে আশা,নিরানন্দে আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি সেই মঙ্গলময় পুরুষ তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। (যেমন যে ছেলেটা চলিতে পারে না, বারবার পড়িয়া যায়, তার নিজের ধরার অপেক্ষা না রাখিয়া যেমন পিতা বা মাতাকে নিজে তাহাকে শক্ত করিয়া ধরিতে হয়, তেমনি যেন মনে হয় সেই মঙ্গলময় পুরুষ দেখিয়াছেন যে এ পাপী ও দুর্ব্বল মানুষটা নিজে ধরিয়া চলিতে পারে না; যখনি তাঁহাকে ভুলিতেছে, তখনি পতিত হইতেছে; তাই তিনি বারবার ধূলা ঝাড়িয়া চক্ষের জল মুছাইয়া তুলিয়া ধরিতেছেন।)

বল ও আশা পাইয়া আমি নিজ বিশ্বাস অনুসারে চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলাম। এই বার আমার কঠিন সংগ্রাম আসিল। ইহার পূর্ব্বে গ্রীষ্মের ছুটীতে বা পূজার বন্দে বাড়ীতে গেলেই আমাকে ঠাকুর পূজা করিতে হইত। আমাদের কুলক্রমাগত কতকগুলি ঠাকুর ছিল। বাবা সচরাচর তাহাদের পূজা করিতেন। আমি বাড়ীতে গেলে তিনি সেই কার্য্যভার আমার উপর দিয়া অপরাপর গৃহকার্য্য করিবার জন্য অবসর লইতেন। যেবারে আমার হৃদয় পরিবর্ত্তন হইয়া আমি বাড়ীতে গেলাম, সেবার প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলাম যে আর ঠাকুর পূজা করিব না। গিয়াই মাকে সে সংকল্প জানাইলাম। মা ভয়ে অবশ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন একটা মহা সংগ্রাম আসিতেছে। আমাকে অনেক বুঝাইলেন; অনেক অনুরোধ করিলেন। আমি কোনও মতেই প্রস্তুত হইতে পারিলাম না। ধর্ম্মে প্রবঞ্চনা রাখিতে পারিব না বলিয়া করযোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা

করিলাম। অবশেষে সেই সংকল্প যখন বাবার গোচর করা হইল, তখন আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গমের ন্যায় তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কুপিত হইয়া আমাকে প্রহার করিয়া ঠাকুরঘরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য লাঠি হস্তে ধাবিত হইয়া আসিলেন। আমি ধীরভাবে বলিলাম, "কেন বৃথা আমাকে প্রহার করিবেন? আমি অকাতরে আপনার প্রহার সহ্য করিব। আমার দেহ হইতে এক একখানা হাড় খুলিয়া লইলেও আর আমাকে ওখানে লইতে পারিবেন না।" এই কথা শুনিয়া ও আমার দৃঢ়তা দেখিয়া তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলেন এবং প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কুপিত ফণীর ন্যায় ফুলিতে লাগিলেন। অবশেষে আমাকে পূজার কাজ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া নিজে পূজা করিতে বসিলেন। সেই দিন হইতে আমার মূর্ত্তি পূজা রহিত হইল। আমি সত্যস্বরূপের উপাসক হইলাম। কিন্তু আমাদের পারিবারিক আন্দোলন গ্রামবাসী আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আমাকে সকলেই নির্য্যাতন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তৎপরে বাবা আমাকে গ্রামস্থ ব্রাহ্মদিগের সহিত মিশিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমি অন্য সময়ে মিশিতাম না। কিন্তু যে দিন তাঁহারা সকলে উপাসনা করিবেন বলিয়া সংবাদ দিতেন, সেদিন বাবা গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বেই গিয়া উপাসনাতে যোগ দিতাম, আসিয়া তিরস্কার ও গঞ্জনা সহ্য করিতাম। তখন কেহ ব্রহ্মোপাসনা করিবে শুনিলে চারি পাঁচ মাইল হাঁটিয়া গিয়া যোগ দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই কষ্টকর ছিল না।

অথচ এই সময়ে গ্রামের কতিপয় ব্রাহ্ম, ভবানীপুরের দুই চারিজন ব্রাহ্ম ও বিজয় অঘোর ভিন্ন আর কোনও ব্রাহ্মের সহিত আমার আত্মীয়তা ছিল না; কাহারও সঙ্গে মিশিতাম না, লজ্জাতে কাহারও সহিত আলাপ করিতে চাহিতাম না।

১৮৬৭ সালের শেষভাগে আমি ভবানীপুরের চৌধুরী মহাশয়দিগের বাটী হইতে ঐ স্থানের একটী ভদ্রপরিবারের অনুরোধে তাঁহাদের সহিত কলিকাতা শাঁকারিটোলাতে এক বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলাম। তাহার ইতিবৃত্ত এই। জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটী ভদ্রলোক ভবানীপুরে বাস করিতেন। মহিম নামে তাঁহার একটী ছেলে সংস্কৃত কলেজে পড়িত ও আমাদের সঙ্গে এক গাড়িতে কলেজে যাইত। সেই সূত্রে জগৎবাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়। জগৎবাবুর সাধুতা সদাশয়তা সৌজন্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে; আমার প্রতিও তাঁহার পুত্রবৎ স্নেহ জন্মে। তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাঁহার গৃহিণীর সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দেন। আমি অগ্রেই বলিয়াছি, পঠদ্দশাতে সহরে থাকিতে আমার সহধ্যায়ীদের কাহারও কাহারও মাকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম; এবং মাসীর ন্যায় স্নেহ পাইতাম। বলিতে কি সে সময়ে আমাকে যেরূপ কুসঙ্গের মধ্যে বাস করিতে হইত, স্মরণ করিলে এই মনে হয় যে, সেই মাসীদের স্নেহের গুণে ও তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবেই আমি এই-সকল কুসঙ্গের অনিষ্টফল হইতে বাঁচিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি জগৎবাবুর পত্নীকেও মাসী বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। আমাকে ইঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে যে কি ভালবাসিতে লাগিলেন তাহা বাক্যে বর্ণনা হয় না। শেষে এমনি দাঁড়াইল যে, আমি দুই চারি দিন দেখা না করিলে মাসী ডাকিয়া পাঠাইতেন; এবং আমাকে কঠিন ছেলে বলিয়া তিরস্কার করিতেন; এটা ওটা খাওয়াইতেন; ঘরকন্নার কথা কত শুনাইতেন; আমার নিকট কিছুই গোপন রাখিতেন না। আমি আপ্যায়িত হইয়া বাসায় ফিরিতাম। হায়, তাঁহাদের কঠিন ছেলে ব্রাহ্মসমাজের কাজে ও নানা বিষয়ে মাতিয়া কোথায় গিয়া পড়িল,

তাঁহারা কোথায় গিয়া পড়িলেন! মাসীকে আর কতকাল দেখিলাম না! এখন ভাবিয়া দেখি, মাসী যে আমাকে কঠিন ছেলে বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিয়াছিলেন। আমি মানুষের নিকট যতটা প্রেম পাইয়াছি ততটা প্রেম দিতে পারি নাই। এ জীবনে নানা সংগ্রামের মধ্যে বাস করিয়াছি, তাহা বোধ হয় আমার প্রেমিক বন্ধুদের প্রতি সমুচিত প্রেমের অভাবের একটা কারণ। নির্য্যাতন, বিদ্বেষ, বিবাদ প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়া মন উত্তাপের মধ্যে বাস করিয়াছে, প্রেমের সুশীতল বায়ু সেবন করিবার সময় পায় নাই।

যাহা হউক, আমি এই মাসীর এত স্নেহের এই মাত্র প্রতিদান করিতাম যে তাঁহাদের মহিমকে রোজ কাছে আনিয়া পড়া বলিয়া দিতাম। ১৮৬৭ সালের শেষভাগে ইঁহারা কলিকাতার শাঁকারিটোলাতে একবাড়ীতে গিয়া থাকিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তখন মাসী আমাকে সঙ্গে যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। আমি তাঁহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। আমরা আসিয়া শাঁকারিটোলাতে বাস করিতে লাগিলাম। আমি ও মহিম বাহিরবাড়ীতে এক দ্বিতীয়তল গৃহে বাস করিতাম। সে ঘরটী বাহিরবাড়ীতে হইলেও ঠাকুরদালানের ছাদের উপর দিয়া অন্দর মহল হইতে সে ঘরে যখন ইচ্ছা আসা যাইত। সুতরাং মাসী কাজকর্ম্ম হইতে একটু অবসর পাইলেই আমার ঘরে আসিয়া বসিতেন, এবং আমার ও মহিমের পড়া দেখিতেন, এবং নানা ভাল কথায় কাল কাটাইতেন।

আমরা এই বাড়ীতে আসার পর মাসীর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ১৫।১৬ বৎসরের বালিকা তাঁহাদের নিকট আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। সে ২।১দিনের মধ্যেই আমাকে দাদা করিয়া লইল, এবং চুম্বকে যেমন লৌহ লাগে তেমনি যেন আমাতে লাগিয়া গেল। পিতামাতা ঐ বালিকাটীকে শৈশবে একজন

পরিণতবয়স্ক বিপত্নীক ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বালিকাটি বোধ হয় পতির নিকট বা পতিগৃহে ভাল ব্যবহার পাইত না। কারণ শ্বশুরবাড়ীর কথা তুলিলেই দরদর ধারে তাহার দুই চক্ষে জলধারা বহিত; এবং তাহা দেখিয়া বাল্যবিবাহের প্রতি আমার ঘৃণা বাড়িয়া যাইত। আমি সাবধান হইয়া বালিকাটীর নিকট তাহার শ্বশুরবাড়ীর কথা তুলিতাম না, তাকে পড়াশোনায় গল্পগাছায় ভুলাইয়া রাখিতাম। বালিকাটী প্রাতে গৃহকর্ম্মে পিসীর সহায়তা করিত; আমার নিকট আসিতে পারিত না; কিন্তু বৈকালে আমি ও মহিম কলেজ হইতে আসিলেই সে আমাদের গৃহ আশ্রয় করিত; সন্ধ্যার পর আহার করিয়াই আমাদের ঘরে আসিত এবং রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত থাকিত। আমি তাহাকে ও মহিমকে পড়াইতাম, লিখিতে শিখাইতাম; ভাল ভাল গল্প শুনাইতাম; আমার সেই পূর্ব্বকালের উন্মাদিনীর অভাব যেন কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ হইত। অনেক দিন এরূপ হইত যে, আমি পড়িতে বসিতাম, সে ও মহিম ঘুমাইয়া পড়িত। আমি শয়নের পূর্ব্বে তাহাকে তুলিয়া বাড়ীর ভিতর দিয়া আসিতাম। সে যেন অনিচ্ছাক্রমে বাড়ীর মধ্যে যাইত।

আমি এইখানে থাকিতে থাকিতে আমার বন্ধু যোগেন্দ্র (যিনি পরে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) বিধবাবিবাহ করেন এবং আমি ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যোগেন্দ্রের সঙ্গে থাকিবার জন্য যাই। কিরূপে সে বিবাহ ঘটে পরে বলিতেছি। যাইবার সময় মাসীকে বিশেষতঃ সেই বালিকাটীকে ছাড়িয়া যাইতে বড় ক্লেশ হইয়াছিল, সে জন্য সে বিচ্ছেদটা মনে আছে। সে যেন আমার স্নেহ পাইয়া প্রাণ দিয়া আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, সেই আলিঙ্গনপাশ ছিঁড়িয়া যাওয়া আমার পক্ষে ক্লেশকর হইয়াছিল। আমি যখন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার সংকল্প জানাইলাম, তখন মেয়েটী কয়দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোক ফুলাইয়া

ফেলিল। অবশেষে যখন আমি জিনিসপত্র লইয়া বিদায় হই তখন বলিল, "দাদা, একটু দাঁড়াও, একবার ভাল করে প্রণাম করি।" এই বলিয়া তাহার অঞ্চলটী গলায় দিয়া গলবস্ত্র হইল এবং আমার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে ও আমার চরণে প্রণত হয় এবং ডাক ছাড়িয়া কাঁদে; আমিও তার সঙ্গে কাঁদি। সেই যে কাঁদিয়া বাল্যবিবাহকে ঘৃণা করিতে করিতে সে বাড়ী হইতে বিদায় লইলাম, সেই ঘৃণা অদ্যাপি আমার মনে জাগ্রত রহিয়াছে। কেহ দশ এগার বৎসরের মেয়ের বিবাহ দিতেছে দেখিলে মনে বড় ক্লেশ হয়। কি আশ্চর্য্য! বাল্যবিবাহের অনিষ্টফল পূর্ব্বে কত দেখিয়াছিলাম; শাশুড়ীর হাতে বৌয়ের প্রাণ গেল, কতবার শুনিয়াছিলাম; বালিকা পত্নী বিরাজমোহিনীকে হাত পা বাঁধিয়া সপত্নীর উপরে ফেলিয়া দিল ইহাও দেখিয়াছিলাম; কিন্তু ঐ মেয়েটির চক্ষের জলে শিশু বালিকাদিগকে হাত পা বাঁধিয়া দান করার উপরে আমাকে যেরূপ জাতক্রোধ করিল এরূপ অগ্রে করে নাই। কোন্ ঘটনাতে মানুষের মনে কোন্ ভাব আসে ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। হায় হায়! ঘটনাচক্রে মেয়েটী কোথায় গেল, আমি কোথায় গিয়া পড়িলাম! তৎপরে বহু বৎসর পরে একদিন বিধবাবেশে মলিনবস্ত্রে দীনহীনার ন্যায় শিশুকোলে তাহাকে ভবানীপুরের গলিতে কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইতে দেখিয়াছিলাম। সে আমাকে দেখিয়াই "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল; কিন্তু আমার চিনিতে বিলম্ব হইল। দাঁড়াইয়া তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিলাম ও চক্ষের জল ফেলিলাম। সেই দেখা শেষ দেখা!

১৮৬৮ সালের প্রথমে আমরা এক বিধবা-বিবাহ দিলাম, তাহার ইতিবৃত্ত এই;—ঈশানচন্দ্র রায় নামক নদীয়া-কৃষ্ণনগর-নিবাসী ও কলিকাতা-প্রবাসী একটী যুবক তখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পাঠ করিতেন।

তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মাতা ও একটী বিধবা ভগিনী ছিলেন। আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (যিনি পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন) ঐ মেয়েটীকে পড়াইতেন। হেমদাদার নিকট আমি মেয়েটীর প্রশংসা সর্ব্বদা শুনিতাম। তিনি আমাকে বলিতেন যে, মেয়েটীর ভাই তাহার আবার বিবাহ দিতে চায়। আমি শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবা-বিবাহের পক্ষ। আমি মনে মনে ভাবিতাম আমার আলাপী কি কোনও ছেলে পাওয়া যায় না, যে মেয়েটীকে বিবাহ করিতে পারে। ইতিমধ্যে আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপত্নীক হইলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর পরলোকগমনের দশ বার দিনের মধ্যেই তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার জন্য অস্থির করিয়া তুলিলেন। যোগেন্দ্র আসিয়া আমাকে সেই কথা জানাইলেন এবং আমার পরামর্শ চাহিলেন। আমি বলিলাম—"যাও, যাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। দশ বার দিন হলো তোমার স্ত্রী মরেছে, এর মধ্যে বিবাহের কথা! আর বিয়েই যদি কর, একটা আট নয় বছরের মেয়ে বিয়ে কর্‌বে ত, তাতে আমার মত নেই; তোমার যা ইচ্ছে হয় কর।" যোগেন্দ্র সেদিন বিষণ্ণ অন্তরে ঘরে গেলেন। দুদিন পরে আবার আসিয়া আমাকে ধরিলেন। আমি তাঁহাকে বিধবা-বিবাহ করিবার জন্য নাচাইয়া তুলিলাম। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন আমি হেমদাদার সাহায্যে ঈশানচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। যোগেন্দ্র ও ঈশানের ভগিনী মহালক্ষ্মী পরস্পরের সহিত পরিচিত হইলেন; এবং বিবাহিত হওয়া স্থির করিলেন। মহালক্ষ্মীর বয়স তখন বোধ হয় ১৮ বৎসর হইবে। আমাদের অপেক্ষা ২।৩ বৎসরের ছোট। বিবাহ স্থির হইলে আমি সেই সংবাদ লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ঈশানকে ও তাহার ভগিনীকে

জানিতেন, এবং যতদূর স্মরণ হয় কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। আমার মুখে মহালক্ষ্মীর সহিত যোগেনের বিবাহের সংবাদ পাইয়া তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ দিবেন বলিলেন। বিবাহের দিন স্থির করিয়া প্রায় দুই তিন জন ভদ্রলোককে মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহের সমুদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার যতদূর স্মরণ হয়, কন্যাকে কিছু কিছু গহনা দিলেন।

এই বিবাহের পরেই ভয়ানক নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রের আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্কলারশিপ ও ঈশানের স্কলারশিপ মাত্র ভরসা দাঁড়াইল। তদুপরি চাকর চাকরাণী কেহই থাকে না, দিন চলা ভার। এই অবস্থাতে তাঁহারা আমাকে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের স্কলারশিপের সহিত আমার স্কলারশিপ যোগ করিলে, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে, এবং আমি সঙ্গে থাকিলে অপরাপর নানা প্রকারে সাহায্য হইতে পারে এই আশায় তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে ধরিয়া বসিলেন। আমি বিবাহের ঘটক, আমি তাঁহাদের বিপদের সময় কিরূপে সাহায্যদানে বিরত থাকি। সুতরাং আমি বাবাকে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জুটিলাম। বাবা এই সংবাদ পাইয়া অগ্নিসমান হইয়া উঠিলেন; কারণ জ্ঞাতি কুটুম্ব ও গ্রামের লোক এই সংবাদ পাইলে গোলযোগ করিবে। তিনি আমাকে ইঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য আদেশ করিয়া পত্র লিখিলেন। আমি অনুনয় বিনয় করিয়া লিখিলাম, যে-বিবাহের আমি ঘটক, সেই বিবাহ-নিবন্ধন বিবাহিত দম্পতী যখন ঘোর নির্য্যাতন ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়াছেন, তখন সাহায্যের উপায় থাকিতে সাহায্য না করা অধর্ম্ম; সুতরাং সেরূপ

কাজ আমি করিতে পারিব না। বাবা সে যুক্তির প্রতি কর্ণপাত করিলেন না, পরন্তু লিখিলেন যে তাহা হইলে তিনি আর প্রসন্নময়ীকে বাড়ীতে রাখিতে পারিবেন না এবং আমাকে সস্ত্রীক গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন।

যখন এইরূপ চিঠিপত্র চলিতেছে তখন একদিন বড়মামা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি চাঙ্গড়ীপোতা গ্রামে তাঁহার ভবনে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বাবার এক পত্র আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম বাবা আমাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া বড়মামার শরণাপন্ন হইয়াছেন। চিঠি পড়িয়া আমি ধীরভাবে সমুদয় ঘটনা মাতুলের নিকট বর্ণন করিলাম; কিরূপ নির্য্যাতন, কিরূপ দারিদ্র্য, কিরূপ সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া বলিলাম। বলিয়া তাঁহার উপদেশের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

মাতুলমহাশয় কিছুক্ষণ ধীর গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন—"না, তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পার না। তুমি তাহাদিগকে বিবাহে উৎসাহ দিয়া, বিপদের সময় যদি তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে অধর্ম্মের কাজ হইবে; কাপুরুষতা হইবে; আমার ভাগিনার মত কার্য্য হইবে না।"

আমার হৃদয় হইতে যেন দশ মণ বোঝা নামাইয়া লইল। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহাকে বলিলাম—"আমার বাবাকে এই কথা লিখুন।"

তিনি বাবাকে লিখিলেন যে সে প্রকার অনুরোধ তাঁহার দ্বারা হইতে পারে না। আমি তাহাদের সাহায্য করিতে বাধ্য।

আমার গুরুতর শ্রম আরম্ভ হইল। যোগেন তাঁহার ভগ্নহৃদয়া মাতা ও আত্মীয়স্বজনকে লইয়া ব্যস্ত হইলেন, ঈশানের পাঠ ও নাইট-ডিউটীর

হাঙ্গামাতে অবসরাভাব হইল; এদিকে চাকর চাকরাণী নাই; সুতরাং আমাকেই বাজার করা, তিনতালাতে কাঁধে করিয়া জল তোলা প্রভৃতি সমুদয় গৃহকর্ম্ম করিতে হইত। এই-সকল স্মরণ করিয়া এখন আনন্দ হয়। এ-সকল শ্রম করিতে আমার কিছুই ক্লেশ হইত না, কারণ মহালক্ষ্মীর বিমল ভালবাসাতে আমাকে সরস রাখিত। মানুষ মানুষকে এত ভালবাসে না! যোগেনকে সর্ব্বদাই আত্মীয়স্বজনের কাছে যাইতে হইত, সুতরাং আমিই তার সঙ্গী, তার শিক্ষক, তার সহায়, তার রান্নাঘরের চাকর, সকলি। আমি একদিন অন্যত্র গেলে সে অস্থির হইয়া উঠিত।

একবারকার একটা ঘটনা মনে আছে। একবার আমি যোগেন ও মহালক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া কয়েকদিন বিশ্রাম করিবার জন্য মাতুলালয়ে গেলাম। দুই তিন দিন মাতুলালয়ে মাতামহীর ক্রোড়ে আছি, এমন সময় একদিন রাত্রি দশটার সময় ঈশানের এক জরুরি টেলিগ্রাম পাইলাম, "এখানে তোমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, অবিলম্বে এস।" তখন কি করি! রেলওয়ে ষ্টেশন মাতুলালয় হইতে তিন চার মাইল দূরে। মাঠ দিয়া ষ্টেশনে যাইতে হয়, কিন্তু তখন সমুদায় মাঠ জলে প্লাবিত, পথ পাওয়া দুষ্কর। মাতামহী ঠাকুরাণী ও মামীরা বারণ করিতে লাগিলেন। আমি মহা চিন্তার মধ্যে পড়িলাম। কিন্তু বড়মামা বলিলেন, "জরুরি টেলিগ্রাম যখন করিয়াছে, তখন নিশ্চয় কোনও বিপদ ঘটিয়াছে—তুমি যাও। রাত্রি-শেষে ৩টা কি ৩৷৽টার সময় একটা ট্রেন আছে, সেই ট্রেনে যাও।" আমি তাঁহার উপদেশে সেই রাত্রেই যাত্রা করিলাম। তিনি আমার সঙ্গে এক চাকর ও লণ্ঠন দিলেন। আমি জল ভাঙ্গিয়া কোনও প্রকারে রাত্রি ১২টার সময় ষ্টেশনে পৌঁছিলাম এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়া

শুনি, আমি মাতুলালয়ে গেলে তৎপর দিন যোগেনের মা কলিকাতায় আসিয়াছেন, যোগেন তাঁহাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন কি তাঁহার কাছে রাত্রিযাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঈশানের মা তখন কাশীতে গিয়াছেন। তিনি কন্যার পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়াই কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এদিকে ঈশানের হাঁসপাতালের নাইট-ডিউটী উপস্থিত। মহালক্ষ্মীর কাছে থাকে কে? তাই আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন। আমি আসিয়াই যোগেনের মাকে দেখিতে গেলাম এবং যোগেনকে ও তাঁহার মাকে বলিয়া মহালক্ষ্মীর নিকট রাত্রিযাপন করিতে প্রবৃত্ত করিলাম। তিনি সমস্ত দিন সেখানে যাপন করিয়া রাত্রে বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আসিতে অনেক রাত্রি করিতেন। ঐ সময় আমি আহারান্তে মহালক্ষ্মীর ঘরে বসিয়া তাঁহাকে বাঙ্গলা ও ইংরাজী পড়াইতাম এবং দুজনে ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ ও উপাসনা করিতাম।

ফলতঃ এই কালকে যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল বলিয়াছি, তাহার কারণ এই, এইকালের মধ্যে আমার অন্তরে ধর্ম্মভাব ও ব্যাকুলতা পূর্ণমাত্রাতে কাজ করিতেছিল, অপরদিকে বন্ধুদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা পূর্ণমাত্রাতে ভোগ করিতেছিলাম। বস্তুতঃ আমার প্রতি ঈশান ও যোগেনের প্রীতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও নির্ভরের যেন সীমা ছিল না। লিখিতে লিখিতে একটা কথা মনে হইতেছে, তাহা ইহার অনেক পরের ঘটনা। তখন ঈশান বোধ হয় লক্ষ্ণৌএর বলরামপুর হাঁসপাতালে কর্ম্ম করিতেন। সেই সময় একবার ছুটী লইয়া আসিয়া কলিকাতাতে ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলে, তিনি আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; আর বাড়ীতে আসিতে দিলেন না। বলিলেন, "আমার পরিবার সম্বন্ধে

অনেক কথা আছে, তুমি থাক।" এই বলিয়া তাঁহার পত্নীর বিরুদ্ধে আমার কানে অনেক কথা ঢালিলেন। বলিলেন, "আমি আমার স্ত্রীকে অনেক বুঝাইয়াছি, কোনও ফল হয় নাই, তুমি একবার বোঝাও।" আমি বলিলাম, "তোমার কথাতে কাজ হয় নাই, আমার কথাতে কি হবে?" তিনি বলিলেন, "তোমাকে বড় ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তোমার কথাতে ওর উপকার হতে পারে।" আমি অগত্যা ভৃত্যের দ্বারা প্রসন্নময়ীকে সংবাদ দিয়া সে রাত্রি সেখানে যাপন করিলাম। শয়নকালে গিয়া দেখি ঈশানের শয়নঘরে এক স্বতন্ত্র খাটে আমার শয়নের বন্দোবস্ত। শয়নকালে তাঁহার পত্নী ঘরে আসিলে, তিনি বলিলেন, "আমার কাছে আজ তোমার শুইয়া কাজ নাই, তুমি শিবনাথের কাছে গিয়া শোও; ও তোমাকে কিছু কথা বলিবে। আমি ঘুমাই, তুমি কথা শোন।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার অদ্ভুত কথা, আমার কাছে শোবে কি রকম?" তিনি সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না, পাশ ফিরিয়া শুইয়া অকাতরে নিদ্রা গেলেন। আমি অনেকক্ষণ তাঁহার স্ত্রীর সহিত তাঁহাদের দাম্পত্য বিবাদ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিলাম। তৎপরে তিনি অন্যঘরে ছেলেদের নিকট শয়ন করিতে গেলেন। আমিও নিদ্রা গেলাম।

বন্ধুদের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির বিষয় যখন স্মরণ করি, তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি। কারণ ইহাঁদের সদ্ভাব ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়-মনের অনেক উপকার হইয়াছিল।

এই সময় আমার মাথায় যত রকম আজগুবি মৎলব আসিত, ভারত উদ্ধারের যত রকম খেয়াল ঘুরিত। সকলের উৎসাহদায়িনী ছিলেন মহালক্ষ্মী। এ জীবনে আমার অনেক চেলা জুটিয়াছে; কিন্তু মহালক্ষ্মীর মত চেলা অল্পই জুটিয়াছে। এই সময়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থ পড়িয়া যোগেন কিছুদিনের জন্য নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহা লইয়া

আমার সঙ্গে রোজ তর্ক ও ঝগড়া চলিত। আমি তাঁহাকে আস্তিক করিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু ঝগড়ার ফল এই হইত যে তিনি আরও দৃঢ়তার সহিত নাস্তিকতা প্রচার করিতেন। তিনি হাসিয়া আমাকে বলিতেন, "স্ত্রীটাকে তো চেলা করিয়া লইয়াছ, যত পার ধর্ম্ম তাহাকে ভজাও, আমাকে ছাড় না।" আমি যোগেনকে না পারিয়া মহালক্ষ্মীকেই ভজাইতাম। দুজনে প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা করিতাম।

আমরা তিনটী প্রাণী এমনি "রিফর্ম্মার" হইয়া উঠিয়াছিলাম, যে, আমরা তিনজনে পরামর্শ করিয়াছিলাম যে আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিয়া পুনরায় তাহার বিবাহ দিব। তখনও আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই। এই ১৮৬৮ সালে আমি একবার তাঁহাকে আনিতে যাই। তখন তিনি ১৪।১৫ বৎসরের বালিকা। বোধ হয় আমার পিতা-মাতার পরামর্শ ভিন্ন আনিতে গিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা পাঠাইলেন না। যাহাকে বিবাহ দিব ভাবিতেছি, তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয় বলিয়া তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতাম না। তাঁহাকে যে আনিয়া মহালক্ষ্মীর কাছে রাখিতে পারিলাম না, এজন্য মনে দুঃখ হইল।

যোগেন ও মহালক্ষ্মীর সহিত একত্র বাসকালের আর-একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সে ঘটনাটী এই। যোগেনের বিবাহের কিছুদিন পরে আমরা চাঁপাতলার দিঘীর পূর্ব্ববর্ত্তী একটী বাড়ীতে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলাম। সেখানে বিদ্যাসাগর সপ্তাহে দুই তিন দিন আসিয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন এবং আবশ্যকমত সাহায্য করিতে লাগিলেন। সেই পাড়াতেই পাশের বাড়ীতে একটী ছুতর জাতীয় বিধবা স্ত্রীলোক থাকিত, তার একটী ছয় সাত বৎসর বয়স্কা মেয়ে ছিল, সেটীও বিধবা। তার মা যখন শুনিল যে আমরা মহালক্ষ্মীর বিধবা-

বিবাহ দিয়াছি, তখন তাহার ইচ্ছা হইল যে নিজের বিধবা মেয়েটার আবার বিবাহ দিবে; আমাদিগকে সেই ইচ্ছা জানাইল। মেয়েটী সকাল বিকাল আমাদের বাড়ীতে আসিতে ও আমার সঙ্গে যাপন করিতে লাগিল। আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত এবং আমার গলা জড়াইয়া আমার কোলে বসিয়া থাকিত। একদিন প্রাতে সে আমার গলা জড়াইয়া কোলে বসিয়া আছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিলেন। মেয়েটীকে অগ্রে তিনি দেখেন নাই; আমার কোলে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"ও মেয়েটী কে হে? বাঃ বেশ সুন্দর মেয়েটী ত।" আমি বলিলাম, "ওটী পাশের বাড়ীর একটী ছুতরের মেয়ে, আমাকে দাদা বলে, আমার কোলে বস্‌তে ভালবাসে, ওটী বিধবা, ওর মা ওর বিয়ে দিতে চায়, তাই আমাদের কাছে দিয়েছে।" এই কথা শুনিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় চম্‌কাইয়া উঠিলেন।—"বল কি! ঐটুকু মেয়ে বিধবা!" তার পর তাকে ডাকিলেন—"আয় মা আমার কোলে আয়।" সে ত লজ্জাতে যাইতে চায় না, আমি কোলে করিয়া তাঁহার কোলে বসাইয়া দিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বুকে ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন; শেষে যাইবার সময় মেয়েটীকে ও তাহার মাকে পাল্‌কী করিয়া তৎপরদিন বৈকালে তাঁহার ভবনে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন এবং আমাকে বলিয়া গেলেন—"মেয়েটাকে বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করে দেও, মাহিনা আমি দেব।" পরদিন বৈকাল বেলা মেয়েটী ও তার মাকে পাল্‌কী করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে পাঠান গেল। তাহারা সন্ধ্যার সময় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী ভগবতী দেবীর যে প্রশংসা করিল, তাহা শুনিয়া আমাদের মন পুলকিত হইয়া উঠিল। শুনিলাম ভগবতী দেবী ছুতরের মেয়ে বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করা দূরে থাকুক, মেয়েটীকে কোলে জড়াইয়াছেন,

কাছে বসিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়াছেন, এবং আসিবার সময় দুজনকে কাপড় দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই মেয়েটাকে বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিবার পূর্ব্বেই সেই বাড়ীতে বিষম-কলেরা রোগে মহালক্ষ্মীর মৃত্যু হইল; আমাদের বাসা ভাঙ্গিয়া গেল; আমরা ছড়াইয়া পড়িলাম; মেয়েটার মাও পাশের বাড়ী হইতে উঠিয়া গেল; মেয়েটী আমাদের হাতছাড়া হইল।

এই ১৮৬৮ সালে আমার প্রথমা কন্যা হেমলতার জন্ম হইল। দ্বিতীয়বার বিবাহের পরই আমার হৃদয় পরিবর্ত্তন হইলে, আমি নিরপরাধা প্রসন্নময়ীর প্রতি যে অন্যায়াচরণ হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য ব্যগ্র হই। সে মনের কথা কেবল আমার মাতামহী ঠাকুরাণীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলাম। প্রসন্নময়ীর পিত্রালয় আমার মাতুলালয়ের সন্নিকট। সুতরাং তিনি লোক পাঠাইয়া প্রসন্নময়ীকে নিজ ভবনে আনিলেন। আমাকে সংবাদ দিবা মাত্র আমি গিয়া প্রসন্নময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলাম। তৎপরে বহুদিন প্রসন্নময়ী আমার মাতুলালয়েই থাকেন। আমি শনিবার শনিবার সেখানে যাইতাম।

আমি প্রসন্নময়ীর সহিত মিলিত হইয়াছি জানিয়া আমার পিতা প্রথমে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু পরে আমার অনুনয় বিনয়ে ও মাতাঠাকুরাণীর অনুনয় বিনয়ে আর্দ্র হইয়া প্রসন্নময়ীকে নিজ ভবনে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হন। ১৮৬৭ সালে তিনি আবার আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন। ১৮৬৮ সালের ১১ই আষাঢ় আমার পৈতৃক ভবনে হেমলতার জন্ম হয়। হেম জন্মিলে বাবার সহিত আমার আর-এক মনোবাদের কারণ উপস্থিত হইল। অগ্রেই বলিয়াছি, আমরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলজাত কুলীন ব্রাহ্মণ। আমাদের মধ্যে তখন কুলসম্বন্ধের প্রথা ছিল। তদনুসারে হেমলতার শৈশবেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার কথা। আমি সে পথে বিরোধী হইলাম। তাহার বিবাহ সম্বন্ধ করিতে

নিষেধ করিয়া পিতাকে পত্র লিখিলাম। তাহাতে বাবা কুপিত হইলেন। আমার নিষেধ গ্রাহ্য করিলেন না। আমার অজ্ঞাতসারে গোপনে একটী শিশু বালকের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। আমি শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম।

একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক। ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা দ্বারা আমার হৃদয়-পরিবর্ত্তন ঘটিলে, আমার প্রাণে এক নূতন সংগ্রাম জাগিয়াছিল। সকল বিষয়ে আপনাকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত করিবার জন্য দুরন্ত প্রতিজ্ঞা জন্মিয়াছিল। ইহার ফল জীবনের সকল দিকেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকল বিষয়ে আপনাকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আত্মনিগ্রহের উদ্দেশে, পাঠ্য বিষয়ে মধ্যে মধ্যে অপ্রীতিকর বোধে যে যে বিষয় অবহেলা করিতাম, তাহাতে অধিক মনোযোগী হইলাম। যে যে বিষয়ে আসক্তি ছিল তাহা ত্যাগ করিতে এবং যে-কিছু অরুচিকর তাহা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার মনে আছে অগ্রে অঙ্কে অমনোযোগী ছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ পরীক্ষাতে কখনও একশতের মধ্যে বিশের উপর নম্বর পাইতাম না। ১৮৬৬ সাল হইতে তাহা বদলাইয়া গেল। অঙ্কে এরূপ মনোযোগী হইলাম যে, ১৮৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলাম। তৎপরে সেই প্রতিজ্ঞা ও সেই দৃঢ়ব্রত রহিয়া গেল। এই সময়ে আমি প্রথমে মাংসাহার পরিত্যাগ করি, প্রাণীহত্যা নিবারণের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু মাংসের প্রতি আসক্তি ছিল বলিয়া। মাংসাহারে এমনই আসক্তি ছিল যে ভবানীপুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ীতে বাসকালে প্রায় প্রতি রবিবার প্রাতে কালীঘাট হইতে জীবন্ত পাঁঠা আসিত। ডাক শুনিলেই আমার পড়া-শুনা বন্ধ হইত। তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া রাঁধিয়া পেটে না পূরিতে পারিলে আর-

কিছু করিতে পারিতাম না। কবিতা পড়িতে ও কবিতা লিখিতে অতিরিক্ত ভালবাসিতাম বলিয়া কিছুদিন কবিতা পড়া বন্ধ করিয়া দিলাম, ফিলজফি ও লজিক পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বন্ধুদের সহিত হাসিঠাট্টা ও গল্পগাছা করিতে ভালবাসিতাম, কিছুদিন মনের কান মলিয়া দিয়া মৌনব্রত ধরিলাম। এই মনের কানমলাটা তখন অতিরিক্ত মাত্রায় করিতাম।

বলিতে কি, আমার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতে এই ১৮৬৮ সাল পর্য্যন্ত কালকে শ্রেষ্ঠকাল বলিয়া মনে করি। এই সময় যে ভাবে যাপন করিয়াছিলাম, সেজন্য মুক্তিদাতা প্রভু পরমেশ্বরকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ করি। বিনয়, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা, প্রার্থনাপরায়ণতা প্রভৃতি ধর্ম্মজীবনের অনেক উপাদান এ সময়ে আমার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। আমার যতদূর স্মরণ হয়, তখন আমার মনের ভাব এইপ্রকার ছিল, যে, আমার ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে থাকিয়া, ঈশ্বর যে পথ দেখাইবেন, তাহাতে চলিতে হইবে, ক্ষতি লাভ যাহা হয় হউক। সকল বিষয়ে ও সকল কার্য্যে ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিতাম, এবং যাহা একবার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতাম, তাহাতে দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত দণ্ডায়মান হইতাম। ফলাফল ও জীবন-মরণ বিচার করিতাম না। ইহার নিদর্শন স্বরূপ দুই একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম ঘটনা আমার এল-এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়া। ১৮৬৮ সালের প্রথমে আমরা বিধবাবিবাহ দিই। তাহার ফলস্বরূপ কিরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা অগ্রে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি। বিবাহের কিছুদিন পরেই মহালক্ষ্মীর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে লাগিল। চাকর পাওয়া যায় না, রাঁধুনী পাওয়া যায় না, সেই অবস্থাতেই তাহাকে রাঁধিতে হয়। এদিকে যোগেন আত্মীয়-স্বজনের নির্য্যাতনে অস্থির। ঈশান মেডিকেল

কলেজের ডিউটী লইয়া সর্ব্বদা অনুপস্থিত। সুতরাং চাকরের অনেক কাজ আমার উপর পড়িয়া যাইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাজার করা, কাঁধে করিয়া তিনতালায় জলতোলা প্রভৃতি আমাকে করিতে হইত। এই-সকল করিয়া আমি পড়িবার সময় বড় পাইতাম না। সম্মুখে বৎসরের শেষে পরীক্ষা আসিতেছে, কিন্তু তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিতেছি না। এইরূপে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আমাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। তিনি এই বিধবাবিবাহে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার লেখাপড়া সব গেল দেখিয়া দুঃখিত হইতেছিলেন। তিনি অক্টোবরের প্রথমে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি একটা ভাল কাজে আছ, কিছু বলিতে পারি না, কিন্তু আমি তোমার জন্য চিন্তিত হয়েছি। তুমি আগামী পরীক্ষাতে কলেজের মুখ রাখ্‌বে বলে মনে আশা কর্‌ছিলাম, কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে, তুমি স্কলার্‌শিপ পাওয়া দূরে থাক, পাশ হও কি না সন্দেহ।" তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল, আমি যেন কোন পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়াইয়াছি। আমার সম্মুখে গভীর গর্ত্ত, আর এক পা বাড়াইলেই তাহার মধ্যে পড়িব। আমার সম্মুখে যে কঠিন সমস্যা উপস্থিত তাহা এক নিমিষের মধ্যে চক্ষের সমক্ষে আসিল। মনে হইল স্কলার্‌শিপ যদি না পাই, তাহা হইলে যাহাদের জন্য এতটা সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাদের আর সাহায্য করিতে পারিব না। যোগেন ও মহালক্ষ্মী সাহায্যের অভাবে কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া চক্ষে জল আসিল। "ঈশ্বর রাখ, এই বিপদে রাখ" বলিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া

ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আমার প্রতি একটা অনুগ্রহ করিতে পারেন? তাহা হইলে একবার জীবন মরণ পণ করিয়া দেখি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অনুগ্রহ?" আমি বলিলাম, "আমি মনে করিতেছি কলিকাতা হইতে পলাইয়া ভবানীপুরে থাকিব, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কলেজে আসিব না। একাগ্রচিত্তে পাঠে মন দিব এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইব। কলেজে না আসার জন্য যদি আমার স্কলারশিপ না কাটেন, তাহা হইলেই এইরূপ করিতে পারি।" তিনি বলিলেন, "তুমি কলেজে আস্‌বে না অথচ স্কলারশিপ কাটা হবে না, এটা কলেজের নিয়ম বিরুদ্ধ। ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসা না করে এরূপ করতে পারি না। কি হয় তোমাকে দুদিন পরে বল্‌ব।" তৎপরে তিনি সমুদয় বিবরণ খুলিয়া লিখিয়া ডিরেক্টরের নিকট হইতে অনুমতি আনিলেন এবং আমাকে ছুটী দিলেন।

আমি যোগেন ও মহালক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া আমার শৈশবের আশ্রয়দাতা ভবানীপুরের মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহাদিগের নিকট আড়াই মাসের জন্য একটী ঘর চাহিলাম, যে ঘরে আমি একাকী থাকিব। তাঁহারা দয়া করিয়া তাহা করিয়া দিলেন। আমি সেই ঘর আশ্রয় করিয়া পাঠে একেবারে মগ্ন হইলাম। প্রাতে একবার স্নানাহারের সময় বাহিরে যাইতাম ও রাত্রে আহারের সময় আধঘণ্টার জন্য যাইতাম। নতুবা দিনরাত্রি ঐ ঘরে যাপন করিতাম। এই আড়াই মাসের মধ্যে শয্যাতে যাই নাই। সন্ধ্যার সময় চাকরেরা আলো জ্বালিয়া দিয়া যাইত, সেই আলো সমস্ত রাত্রি থাকিত। বড় ঘুম পাইলে দুই চারি ঘণ্টা পুস্তক মাথায় দিয়া সেই ঘরেই ঘুমাইতাম। যতদূর স্মরণ হয় পাঠের ঘণ্টা এইরূপ ভাগ করিয়া লইয়াছিলাম। অঙ্ক ছয় ঘণ্টা, (দুই ঘণ্টা গ্রন্থ পড়া ও চার ঘণ্টা

অঙ্ক কষা); ইতিহাস ছয়ঘণ্টা, ইংরাজী তিনঘণ্টা, সংস্কৃত একঘণ্টা, লজিক দুইঘণ্টা, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় আঠার ঘণ্টা। এইরূপ পড়িতে পড়িতে শরীর ও মন সময় সময় বড় অবসন্ন হইয়া পড়িত। তখন পড়া ফেলিয়া দিয়া বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিত। সেই সময় যোগেন ও মহালক্ষ্মীর মুখ মনে করিয়া মনে দুরন্ত প্রতিজ্ঞা আসিত। ভাবিতাম, যাহাদের প্রধান উৎসাহদাতা হইয়া এই সংগ্রামের মধ্যে ফেলিয়াছি তাহাদের সাহায্য করিতে না পারিলে কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব? প্রাণ থাক আর যাক, একবার মরণ-বাঁচন চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। অমনি মনে প্রার্থনার উদয় হইত, "হে ঈশ্বর, এই সংগ্রামে আমার সহায় হও।" তখন দিনের মধ্যে বহুবার প্রার্থনা করিতাম। লোকে যেমন শ্রমের মধ্যে বারবার চা খাইয়া সবল হয়, আমি তেমনি বারবার প্রার্থনা করিয়া সবল হইতাম।

এইরূপ শ্রম করিতে করিতে যখন আড়াই মাস পরে পরীক্ষার সময় আসিল তখন দেখিলাম, এক নীচের ঘরে আড়াই মাস বন্দ থাকিয়া শুইয়া শুইয়া কোমরে বাত ধরিবার উপক্রম হইয়াছে। পরীক্ষা দিতে যাইবার সময় একটী বালকের কাঁধে হাত দিয়া পরীক্ষার হলে গেলাম ও পরীক্ষা দিয়া আসিলাম। তখন ডিসেম্বরের শেষে পরীক্ষা হইত। বোধ হয় জানুয়ারীর শেষভাগে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। তখন আমরা মহালক্ষ্মীর পীড়া লইয়া ঘোর সংগ্রামের মধ্যে আছি। হঠাৎ ওলাউঠা পীড়া হইয়া মহালক্ষ্মী মৃত্যুশয্যায় শয়ানা। তাঁহার পীড়া হইলে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্র লইয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমাকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন ও ভাল-বাসিতেন। আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রতিদিন মহালক্ষ্মীকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সাধ্যে যতদূর হয় তাহা করিতে বাকি রাখিলেন না। অবশেষে কয়েকদিনের পর মহালক্ষ্মীর প্রাণ গেল।

তখন তিনি ৮।৯ মাস কাল সসত্বা। এইরূপ অবস্থাতে মৃত্যু হওয়াতে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। মহালক্ষ্মীর মা ইহার কিছু পূর্ব্বে কাশী হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি যখন আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া "বাবারে, এত করেও বাঁচাতে পারলি না রে"—বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, যোগেন বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন, এবং ঈশান পাগলের মত ঘর হইতে বাহির, বাহির হইতে ঘর করিতে লাগিলেন, তখন আমি আর মহালক্ষ্মীর জন্য কাঁদিব কি? ইহাদিগকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সেই ক্ষেত্রেই সংবাদ আসিল যে, আমি এল-এ পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটীর First grade স্কলারশিপ ৩২৲, ইংরাজী ও সংস্কৃতে ইউনিভার্সিটীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করাতে (Duff) ডফ স্কলারশিপ ১৫৲ ও সংস্কৃত কলেজের প্রথম স্কলারশিপ ১২৲ —সর্ব্বসমেত ৫৯৲ পাইয়াছি। যাহাদিগের জন্য সংগ্রাম করিতেছিলাম জগদীশ্বর তাহাদিগকে সরাইয়া লইলেন ভাবিয়া আমার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। কিন্তু তখন বুঝি নাই যে তিনি অন্য এক সংগ্রামের জন্য পূর্ব্ব হইতেই উপায় বিধান করিলেন। সে সংগ্রাম ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা ও পিতৃগৃহ হইতে নির্ব্বাসন। তাহার বিবরণ পরে বলিব।

দ্বিতীয় ঘটনাটী বোধহয় ১৮৬৮ সালের মধ্যভাগে ঘটিয়াছিল। এই ঘটনায় উল্লিখিত উভয় ব্যক্তিই এখন পরলোকে, সুতরাং তাঁহাদের নাম উল্লেখে দোষ নাই। ১৮৬৮ সালে কলিকাতার হাইকোর্টের অন্যতম উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতায় যুবক রিফর্ম্মারদিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তৎপূর্ব্বে তিনি মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া Indian Radical League নামে একটী সভা স্থাপন করিয়া তাহার সভাপতিরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, কোনও পারিবারিক কারণে স্বীয় পিতার সহিত বিবাদ করিয়া

উপেন্দ্র মান্দ্রাজে পলায়ন করেন। মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া উৎসাহের সহিত যুবক সংস্কারকদিগের নেতা হইয়া দাঁড়ান। যোগেন যখন বিধবা-বিবাহ করিলেন, তখন উপেন যোগেনকে ও আমাকে একদিন নিজ সভাতে উপস্থিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিশেষ সম্মানিত করিলেন। যুবক-গণের করতালির ধ্বনিতে আমাদের লাঙ্গুল স্ফীত হইয়া উঠিল। আমরা মস্ত একটা রিফর্ম্মার হইয়া দাঁড়াইলাম। উপেন সংস্কৃত কলেজের ছেলে, আমরাও সংস্কৃত কলেজের ছেলে, সুতরাং এই সময় হইতে উপেনের সহিত আমাদের একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। যোগেন উপেনের কাছে যাইবার জন্য সময় বড় পাইতেন না, কিন্তু আমি ও উমেশচন্দ্র মুখুয্যে আমরা দুজনে সর্ব্বদা তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম ও উপেনের মুখনিঃসৃত ইয়ুরোপীয় ফিলজফি ও সংস্কারের সুসমাচার হাঁ করিয়া গিলিতাম। সময়ে সময়ে আমি উপেনের বাড়ীতে রাত্রিযাপন করিতাম। তাঁহার সহিত একটু বিশেষ যোগ হইবার কারণ ছিল। আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার যে খেয়াল এ সময়ে আমার মাথায় ঘুরিতেছিল, উপেন সে খেয়ালের অংশী হইয়া সর্ব্বদা নানাপ্রকার পরামর্শ করিতেন। একদিন রাত্রে আমি উপেনদের বাড়ীতে শুইয়াছি, উপেন রাত্রে আমাকে বলিলেন, "অত কেন ভাবিতেছ? তোমার দ্বিতীয়া পত্নীকে ঢাকা কি কাশী কি লাহোর কোনও দূর দেশে লইয়া অবিবাহিত বলিয়া বিবাহ দিয়া এস। তারপর তারা সেই দিকেই থাকুক। হলোই বা বেআইনি কাজ?" আমি বলিলাম, "সে যে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা হয়।" উপেন বলিলেন, "মিথ্যা দুই প্রকারের আছে, white lies and black lies. ওটা white lie।" White lie, black lie কথা আমি সেই প্রথম শুনিলাম। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "উপেন, মিথ্যার আবার white black কি রকম?" তখন তিনি আমার নিকটে

white lieএর ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সকল কথা আমার মনঃপূত হইল না। আমি বলিলাম এইরূপ প্রবঞ্চনা করিতে পারিব না। আমি জীবনে আর-একজন মানুষকে white liesএর সমর্থন করিতে শুনিয়াছি। তিনি মাডাম ব্লাভাট্স্কি। তিনি আমার একজন বন্ধুর সমক্ষে white lies সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা বিশিষ্টরূপে অবগত আছি। এইজন্য আনুষঙ্গিকরূপে এ কথার এখানে উল্লেখ করিতেছি। যে দুই ব্যক্তিকে white lies সমর্থন করিতে শুনিয়াছিলাম, সেই দুইজনকেই পরিণামে ঘোর প্রবঞ্চনা অপরাধে অপরাধী দেখিয়াছিলাম। মাডাম ব্লাভাট্স্কি মহাত্মাদের নামে চিঠি জাল করিবার অপরাধে অপরাধী হইয়া এদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, উপেন্দ্রনাথ দাস এদেশে অনেক প্রকার প্রবঞ্চনা করিয়া বিলাতে গিয়া সেই অপরাধে কয়েদ হন। কিন্তু তখন উপেনের white liesএর সমর্থন শুনিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু উপেনকে পরিত্যাগ করি নাই।

বোধহয় এই ১৮৬৮ সালের মধ্যভাগে উপেনের প্রথমা স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হইল। কিরূপে মৃত্যু হইল বুঝিতে পারা গেল না। কারণ ডাক্তার দেখাইবার সময় হইল না। উপেনের মুখে শুনিলাম, হঠাৎ কলেরা হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন।

শোকটা পুরাতন হইতে না হইতে একদিন দুপুর বেলা উপেন কতিপয় বন্ধু সহ সংস্কৃত কলেজে আসিয়া আমাকে এল-এ ক্লাস হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, "তুমি শুনিয়া সুখী হবে, আমি এক বিধবাকে বিবাহ করতে যাচ্ছি। মেয়েটি ভবানীপুরে আছে, চুরি করে আনতে হবে। তার মায়ের মত আছে, কিন্তু মামা অভিভাবক, তাঁর মত নাই।" মেয়ে এইরূপে চুরি করা ভাল কি না, আনিয়া কোথায় রাখা হইবে, কবে কিরূপে বিবাহ হইবে, এ-সকল প্রশ্ন মনে উঠিলই না।

মেয়ে চুরি করিয়াই বিধবা-বিবাহ দেওয়া যাইবে, এই উৎসাহেই কলেজ হইতে বিদায় লইয়া তাঁহাদের সহিত যাত্রা করিলাম। আমরা তিনটী যুবক, গাড়িতে মেয়েটার জায়গা মাত্র আছে। গাড়ি গিয়া ভবানীপুরে এক গলির মোড়ে দাঁড়াইল। কথা ছিল মেয়েটার জ্যেষ্ঠা ভগিনী দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া যাইবে। তাহা হইল না, আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, মেয়েটী আসিল না। পরে সংবাদ পাওয়া গেল, মেয়েটী দিনের বেলা আসিতে পারিল না, সন্ধ্যার পরে আবার আসিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। কার্য্যোদ্ধার না করিয়া বাড়ীতে ফেরা হইবে না, এই পরামর্শ স্থির হওয়াতে আমরা গাড়ি হাঁকাইয়া ইডেন গার্ডেনে গেলাম এবং পাঁউরুটি ও কলা কিনিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া উত্তমরূপে টিফিন করিলাম। সন্ধ্যা অতীত হইলে আবার গাড়ি করিয়া সেই গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রায় রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, মেয়ের দেখা নাই। অবশেষে দুইটী স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম, তাহার একজন ঐ মেয়ে এবং অপর জন ঐ মেয়েটার জ্যেষ্ঠ সহোদরা। মেয়েটী আমাদের গাড়িতে উঠিলেন। যেই উঠা অমনি আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ি হাঁকাইলাম। উপেনের আদেশক্রমে গাড়ি গিয়া তাঁহার সম্পাদিত সম্বাদপত্রের প্রেস ও আপিসের দ্বারে লাগিল। মেয়েটীকে সেখানে গিয়া নামান হইল। সেটা আপিস ও পুরুষদের বাসা। স্ত্রীলোকের বাসের যোগ্য নহে। আমি দেখিলাম মেয়েটী কাঁপিতেছে। তখন আমার হুঁস হইল। আমি উপেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে বিয়ে হবে, আর ততদিন এঁকে কোথায় রাখা হবে?" উপেন বলিলেন, "বিবাহ কাল রাত্রে হবে, আর ওঁকে সে পর্য্যন্ত এখানেই রাখা যাবে।" তখন আমি রাগিয়া উঠিলাম; বলিলাম, "তা কখনই হবে না, এমন জান্‌লে আমি একাজে থাক্‌তাম

না। এই পুরুষের দলে ও মাতালের মধ্যে এঁকে রাখা হবে, তা হতেই পারে না।" এখানে বলা কর্ত্তব্য, উপেন সুরাপান করিতেন না, সুরা দূরে থাক, চুরুট পর্য্যন্ত কখনও খাইতে দেখি নাই। এ সকল বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য্য সংযম ছিল। কিন্তু তাঁর বন্ধুদের মধ্যে সুরাপায়ী ছিল। যতদূর স্মরণ হয় সেই ভবনেই আর-এক ঘরে সুরাপান চলিতেছিল। তাহা দেখিয়া মেয়েটীকে সেখানে রাখা বিষয়ে আমার ঘোর আপত্তি উঠিল। অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর উপেন আমাকে বলিলেন, "তবে তুমি যেখানে পার একরাত্রের জন্য এঁকে রেখে এস ?" আমি মুস্কিলে পড়িলাম, সংস্কারক দলের কোনও পরিবারের সহিত আমার সেরূপ আলাপ ছিল না। মেয়েটিকে কোথায় লইয়া যাই ? কলিকাতার ব্রাহ্মনেতাদিগের মধ্যে কিছুদিন পূর্ব্বে গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাকে অত্যগ্রসর সংস্কারক দলের লোক বলিয়া জানিতাম। সেই রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সেই কন্যাকে গাড়ি করিয়া লইয়া মহলানবিশ মহাশয়ের পরিবারে রাখিতে গেলাম। তিনি আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বিবরণ শুনিয়া কন্যাটীকে একরাত্রির জন্য স্থান দিলেন।

তৎপরদিন খিচুড়ী বিবাহ হইল। এরূপ শোনা গেল, মেয়েটী কায়স্থ জাতীয়া, যদিও পরে জানা যায় যে তাহা নহে, তদপেক্ষা নিম্নজাতীয়া। কায়স্থদের কন্যা, ইহা শুনিয়া উপেনের মনে হইল তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিবাহ করিলে আইনসিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং পরদিন প্রাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিবাহের বন্দোবস্ত হইল। তদনুসারে, পুরোহিত ও ঠাকুর আসিয়া একটা বিবাহক্রিয়া হইল। আবার এদিকে উপেন সহরের বড় বড় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক মহাসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেখানকার জন্য ত কিছু করা চাই। স্থির হইল সেখানে একটু ঈশ্বরোপাসনা হইবে ও বরকন্যা উভয়ে

একটী লেখাপড়াতে স্বাক্ষর করিবেন। কিন্তু উপাসনা করিবে কে? আমি অথবা উমেশ মুখুয্যে। কারণ এই দুইটী ঐ যুবকদলে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত। আমাদের সঙ্গে আর-একজন ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি প্যারী-মোহন চৌধুরী, যিনি পরে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রেরিত দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই তিনজন ব্রাহ্মের মধ্যে কেন যে আমার দ্বারা উপাসনা করান সকলের মত হইয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই। যতদূর মনে হয়, এ পরামর্শ বিবাহের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে স্থির হয় এবং আমি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। আমি ওদিকে কন্যা আনিতে গিয়া একদল মাতালের হাতে পড়িয়া টানাটানির মধ্যে আছি। আমি যে গাড়িতে করিয়া কন্যা আনিতেছিলাম সেই গাড়ি ও আর একখানি গাড়ি একটী ছোট গলির মধ্যে দুই দিক হইতে আসিয়া পাশাপাশি পার হইতে গিয়া চাকায় চাকায় আট্‌কাইয়া গেল। কোনও খানি বাহির হয় না। আমি গাড়ি হইতে নামিয়া চাকা টানাটানি করিতেছি এমন সময় একদল মাতাল আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের মধ্যে একজন আমার পরিচিত। মাতালেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "একি বাবা! রাস্তা আট্‌কেছ কেন?" যখন কারণ নির্দ্দেশ করিলাম, তখন সকলে কাঁধ দিয়া গাড়ি ছাড়াইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। একবার জিজ্ঞাসা করিল, "Is there any gentlewoman, বাবা?" আমি বলিলাম, "হাঁ।" তার পরে আর কেহ গাড়ির দ্বারের কাছেও যায় না, এতই সম্ভ্রম দেখাইতে লাগিল। সকলে পড়িয়া কাঁধ দিয়া গাড়ি ত ছাড়াইয়া দিল। কন্যা চাকরের সহিত বিবাহ-সভাতে ছুটিল। মাতালেরা চারি পাঁচ জনে পড়িয়া আমাকে ধরিল, "এত করে গাড়ি ছাড়ালাম, বাবা কিছু দিতে হবে।" তখন আমার মনে ছিল না যে, আমার পকেটে একটা টাকা আছে, আমি অনেক অনুনয় বিনয়

করিলাম, বিবাহ-সভাতে যাইতে বলিলাম, কিছুতেই রাজি নয়, আমার চাদর কাড়িয়া লইতে উদ্যত। আধঘণ্টা টানাটানির পর মনে হইল যে সঙ্গে একটা টাকা আছে। টাকাটা দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া, বিবাহ-সভাতে যেই গিয়া উপস্থিত, অমনি শুনিলাম, আমাকে সভামধ্যে উপাসনা করিতে হইবে, সকলে উৎসুক অন্তরে অপেক্ষা করিতেছে। সে কি উপাসনা করিবার অনুকূল অবস্থা? আমি শুনিয়া অস্বীকৃত হইলাম। কিন্তু শোনে কে? তৎপূর্বে কখনও প্রকাশ্য স্থানে উপাসনা করিয়াছিলাম এরূপ স্মরণ হয় না। যে লাজুক ছিলাম, বোধ হয় করি নাই। লাজুক ছিলাম এই কথাটি পড়িয়া বন্ধুদের অনেকে হয়ত মনে মনে হাসিবেন। কারণ তাঁহারা আমাকে এ-সকল বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে চিরদিন বেপরোয়া ও বেহায়া দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আমি তখন উপাসনাদি বিষয়ে বাস্তবিক বড় লাজুক ছিলাম। সেই মানুষকে ধরিয়া লইয়া যখন সভামধ্যে চেয়ারে বসাইয়া দিল, তখন কি হইল তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। প্রথমেই গিয়া শুনিলাম, গান হইতেছে, "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর; অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।" যেমন উপাসনার আয়োজন তেমনি গান। পরে শুনিলাম, যাহাকে গান করিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছিল, সে ব্যক্তি ব্রহ্ম-সংগীতের মধ্যে রামমোহন রায়ের গানই জানিত, তাই গাইতেছিল। গান শেষ হইলে আমি প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার প্রার্থনার মধ্যে সভাস্থল হইতে করতালির চটপটা ধ্বনি উঠিতে লাগিল। এই জন্য বিবাহ-অনুষ্ঠানকে খিচুড়ীবিবাহ বলিয়াছি। উপাসনার পর এক কাগজে বরকন্যা স্বাক্ষর করিলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, স্বাক্ষর-কারীদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় বন্ধু আনন্দমোহন বসু একজন ছিলেন। তখন কিন্তু তাঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই।

বিবাহের পর উপেনের সহিত ও তাহার নবপরিণীতা স্ত্রীর সহিত আমার সম্বন্ধ আরও গাঢ় হইয়া আমি সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের সংবাদ লইতাম, এবং কিছু কাজ পড়িলে করিয়া দিতাম। এই সময় হইতে উপেনকে নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা-দোষে লিপ্ত দেখিতে লাগিলাম। ঋণ-শোধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ধার করা, বাড়ীভাড়া করিয়া ভাড়া না দিয়া রাতারাতি লুকাইয়া পলাইয়া অন্য বাড়ীতে যাওয়া, ইত্যাদি। দুই একবার নিজে কর্জ্জ করিয়া টাকা দিয়া এরূপ অবস্থা হইতে তাঁহাকে সপরিবারে উদ্ধার করিতে হইল। তথাপি তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ভাঙ্গিতে অনেক দিন গিয়াছিল। একবার রাত্রি দুইটার সময় উপেন সপরিবারে পলাইয়া কলিকাতা হইতে অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষের বাড়ীতে যান। তখন শিশিরবাবুরা অগ্রসর সংস্কারক ও ব্রাহ্ম ছিলেন। সেই রাত্রে আমি যোগেন ও উমেশমুখুয্যে সশস্ত্র হইয়া তাঁদের স্ত্রীপুরুষকে আগুলিয়া নারিকেলডাঙ্গার খালে নৌকায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। এখন মনে হইলে হাসি পায়। ইহার পর ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র কিছুদিনের জন্য উপেনকে কাশীতে লইয়া যান। সেখানে উপেন গোপনে দেনা করিয়া লোকনাথবাবুকে ঋণগ্রস্ত করিয়া পীড়িত অবস্থায় কলিকাতায় আসেন। আসিয়া কিছুদিন আমার বাড়ীতে থাকেন। তাহার বিবরণ এই। আমি তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, পিতাকর্ত্তৃক গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া, কলিকাতায় কলেজ-স্কোয়ারের উত্তরে একটী গলিতে একজন ব্রাহ্ম-বন্ধুর সহিত এক গৃহে বাস করিতেছিলাম। আমার কলেজের স্কলারশিপ মাত্র ভরসা। তাহাতে একটী ঘর ভাড়া করিয়া কোনও রূপে চালাইতেছিলাম। ইহার মধ্যে উপেন্দ্রনাথ আমাকে সংবাদ না দিয়া, গুরুতর পীড়া লইয়া সপরিবারে কাশী হইতে আসিয়া আমার বাসার দ্বারে উপস্থিত। আমি সংবাদ পাইয়া

উপেনকে সপরিবারে গাড়ি হইতে নামাইয়া, নিজের ঘরে আনিলাম। একজন বন্ধু আমার পাশের ঘরে ছিলেন। তিনি এই বিপদের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ঘর ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র গেলেন। আমি উপেনের চিকিৎসার জন্য অন্নদাচরণ কাস্তগিরি মহাশয়কে ডাকিলাম। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, তিনি বিনা পয়সায় উপেনের চিকিৎসার ভার লইলেন।

সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদাশয়তার এক নিদর্শন পাই, তাহা স্মরণ রাখিবার যোগ্য, সুতরাং তাহা এইখানেই উল্লেখ করিতেছি। আমার বাড়ীতে আসিয়া উপেনের পীড়া বৃদ্ধি পাইল। এমন কি তাহার জীবনের সম্বন্ধে আমরা নিরাশ হইতে লাগিলাম। এই অবস্থাতে উপেন একদিন আমাকে বলিলেন, "যদি আমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পার, বড় ভাল হয়। আমি বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচ্‌ব না।" শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল না, সুতরাং আমি নিজে গিয়া অনুরোধ করিতে পারি না, কি করি? এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। অবশেষে মনে হইল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা শ্রীনাথ দাস মহাশয়কে ধরিয়া আনিতে হইবে। তাই একদিন প্রাতে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি যে উপেনের গূঢ় চরিত্রের কথা শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়া তাহার প্রতি হাড়ে চটিয়া ছিলেন তাহা জানিতাম না। আমি উপেনের সংশ্রবে থাকি ও তাহাকে বাড়ীতে স্থান দিয়াছি শুনিয়া তিনি আমাকে অনেক তিরস্কার করিলেন; বলিলেন, "কি! যাকে দেখ্‌লে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জুতা মার্‌তে ইচ্ছা করে, তার হয়ে তুই আমাকে অনুরোধ করিস্‌?" আমি বুঝিলাম, তাঁহা দ্বারা এ কাজ হইবে না। আমি বলিলাম, "আপনি বাপ-বেটায় দেখা করিয়ে না দিলে আর কারু দ্বারা হবে না। তবে আমি যাই। কি আর

কর্‌ব। উপেনের শেষ অনুরোধটা রাখ্‌তে পারা গেল না।” এই বলিয়া উঠিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাকে বিরস বদনে উঠিতে দেখিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, “যাস্‌নে রোস, মরণকালে বাপকে দেখ্‌তে চেয়েছে, শুভবুদ্ধি হয়েছে, এটাও ভাল, দেখি কিছু কর্‌তে পারি কি না?” একটু চিন্তা করিয়াই বলিলেন, “কাল প্রাতে ৭টা ৮টার মধ্যে তার বাপকে তোর বাড়ীতে আন্‌ব, তুই ঘরে থাকিস।” আমি চলিয়া আসিলাম। তৎপর দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে করিয়া শ্রীনাথ দাস মহাশয়কে আমার বাসাতে আনিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়।

তাহার বিবরণ এই :—সেই দিন প্রাতে সাতটার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইয়া শ্রীনাথ বাবুকে বলিলেন, “শ্রীনাথ! তোমার গাড়ি যুত্‌তে বল দেখি, তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।” শ্রীনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“কোন জায়গায়?” বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন “আঃ! চল না, রাস্তায় বল্‌ব”। শ্রীনাথ বাবু গাড়ি যুতিতে আদেশ করিলেন। দুই জনে গাড়িতে বসিয়া শ্রীনাথ বাবুদের গলি হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—“কোথায় নিয়ে যাচ্ছি জান? তোমার ছেলে উপেন পীড়িত হয়ে কাশী থেকে এসে এক বন্ধুর বাসায় উঠেছে। তার ব্যায়রাম বড় শক্ত, বাঁচে কি না সন্দেহ। সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে তোমাকে দেখ্‌তে চেয়েছে। তাই তার বন্ধুর অনুরোধে তোমাকে নিতে এসেছি।” এই কথা শুনিয়া শ্রীনাথ বাবু রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন—“কোচম্যান, গাড়ি ফেরাও।” তাহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—“গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও, আমি নাম্‌ব।” কোচম্যান গাড়ি থামাইলে তিনি যখন নামিতে যান, তখন শ্রীনাথ বাবু

তাঁর হাত ধরিলেন—"এ কি, তুমি নাম যে?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"আমায় ছাড়, ছাড়! তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ বন্ধুতা। ছেলে যতই বিরাগভাজন হোক, সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে বাবাকে দেখ্‌তে চেয়েছে। তুমি কিরূপ বাপ যে এমন সময়েও দেখা দিতে চাও না!" এই কথা শুনিয়া শ্রীনাথ বাবু ধীর হইয়া বসিলেন এবং কোচম্যানকে গাড়ি চালাইতে বলিলেন। ক্রমে তাঁহারা আমার বাড়ীতে আসিলেন। শ্রীনাথ বাবু পুত্রকে দেখিয়া চলিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে এই বিবরণ শুনিলাম।

যাহা হউক পিতা-পুত্রে দেখা হইল। উপেন পিতাকে কি বলিলেন জানি না। আমি সেখানে ছিলাম না। শুনিলাম মাপ চাহিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণও দেখিলাম, তাহার পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রীনাথ বাবু চলিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় দাঁড়াইয়া আমাকে উপেনের আর্থিক অবস্থার বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাহার কপর্দ্দক মাত্রও সম্বল নাই শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমার হাতে ১০৲ টাকা দিয়া বলিয়া গেলেন, "দেখিস, ওর স্ত্রী পুত্র যেন না ক্লেশ পায়। টাকার অভাব হলে আমাকে বলিস। তুই কিরূপে এত ব্যয় দিবি।" যার প্রতি এত জাতক্রোধ ছিলেন, তাহারই দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষে জলধারা পড়িল। কি দয়া!

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য আছে। এই সময়ে আমি সর্ব্বদা উপেনের সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইতাম বলিয়া আমাকে অনেকে উপহাস বিদ্রূপ ও ভৎর্সনা করিতেন। তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে গোপনে কি শুনিয়াছিলেন, তাহা তখন জানিতাম না; কিন্তু উপেনের পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া সকল প্রতিবাদ যেন ভুলিয়া যাইতাম। ভাবিতাম, এই মেয়েকে এই পথে আনিবার বিষয়ে আমি সাহায্য করিয়াছি,

এখন ক্লেশের মধ্যে দূরে দাঁড়ান কি আমার পক্ষে উচিত হয়? এই জন্য পুত্র সহ বাড়ীতে তাহাকে স্থান দিতাম; নিজে ঋণ করিয়া উপেনের ঋণ শুধিয়া তাহাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে বাঁচাইতাম; সর্ব্বদা তাহাদের বাড়ীতে সংবাদ লইতাম; কিছুতেই আমাকে বিচলিত করিতে পারিত না। তখন তাহাদের জন্য যে ঋণ করিয়াছিলাম, তাহা শুধিতে আমার বহুদিন গিয়াছে। তাহাদের বিষয়ে আমার দায়িত্ব যখন স্মরণ করিতাম, তখন যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইতাম। ইহার কয়েক বৎসর পরে উপেন বিলাতে যান, ও সেখানে প্রবঞ্চনা-দোষে লিপ্ত হইয়া কয়েদ হন। এদেশে ফিরিয়া দেশীয় রঙ্গভূমির অভিনেতা ও অভিনেত্রী-দিগের সহিত মিলিত হইয়া কোনও প্রকারে কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জনের প্রয়াস পান। এই সময়ে তাঁর পুরাতন বন্ধুরা সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। আমিও সেই সঙ্গে উপেন হইতে দূরে পড়ি।

এখন আমার ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের বিবরণ বলি। ১৮৬৫ সালে আমার হৃদয়-পরিবর্ত্তনের দিন হইতে, আমি কিরূপে অল্পে অল্পে ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিলাম, তাহা অগ্রেই বর্ণন করিয়াছি। বাস্তবিক তদবধি এই ১৮৬৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে ব্যাকুলতা অগ্নির মত জ্বলিতেছিল। আমার অনেক পুরাতন কুৎসিত অভ্যাস ত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। যাহাতে নীতি বা ধর্ম্মের উপদেশ আছে, এরূপ কোনও গ্রন্থ পাইলেই তাহা অতি উপাদেয় বোধ হইত, এবং তাহা আর ছাড়িতে ইচ্ছা হইত না। এই কারণে বড়লোকদিগের জীবনচরিত পড়িতে ভাল লাগিত। এই জীবন-চরিত পড়ার বাতিকটা এখনও আছে। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি Theology ধর্ম্মবিজ্ঞান অপেক্ষা Practical Religion ধর্ম্মজীবনের প্রতি আমার চিরদিন অধিক দৃষ্টি। অথচ ভাবিতে ক্লেশ হয়, লিখিতে

চক্ষে জল আসিতেছে, এই Practical Religionএই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হারিয়া গিয়াছি। আমার আকাঙ্ক্ষা চিরদিন আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে রহিয়াছে, কিন্তু প্রবৃত্তি-সকলকে সকল সময়ে সে আকাঙ্ক্ষার বশীভূত করিতে পারি নাই। নিজের নানাপ্রকার দুর্ব্বলতার সহিত মহাসংগ্রামে বাস করিতে হইয়াছে।

যাহা হউক এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি অনেক জীবনচরিত পড়িয়া ফেলি। অবশেষে স্মরণ আছে যে, প্রতিদিন বৈকালে কলেজ হইতে আসিয়া Beeton's Biographical Dictionary হইতে বড় বড় লোকের জীবনচরিত পড়িতাম। মানুষ সংগ্রাম করিয়া, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজের জীবনের মহত্ত্ব সাধন করিয়াছে, ইহা দেখিলেও আমার আনন্দ হয়, ভাবিতে সুখ হয়, আমি তাহার মধ্যে মানব জীবনের দায়িত্ব ও ঈশ্বরের কৃপার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই। জীবন-চরিত ভিন্ন আরও কয়েকখানি গ্রন্থে এই উপকার পাইয়াছিলাম। থিওডোর পার্কারের গ্রন্থাবলীর উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি। নিউম্যানের Soul'ও বোধ হয় এই সময় পড়িয়া থাকিব। তৎপরে আমাদের এল-এ কোর্সে Arthur Helpsএর Essays written in the intervals of business ছিল, তাহা দ্বারা এত উপকৃত হইয়াছিলাম যে, সেই সূত্রে হেল্‌সের Friends in Council আনিয়া পড়ি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি আমার ধর্ম্মজীবনের সেই প্রথমোদ্যমে আমি উভয় গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাই। তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌখিক ও লিখিত উপদেশ। তাহাতে আমাকে কি শক্তি কি সাহায্য দিত তাহা বলিতে পারি না। এক এক দিন তাঁহার উপদেশ শুনিয়া দশ বার দিন সেই নেশাতে থাকিতাম। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ঐ সময় আমার জ্ঞানের বুভুক্ষা অতিশয় প্রবল ছিল। যে কোনও ভাল গ্রন্থ হাতে

পাইতাম, অমনি ক্ষুধার্ত্ত প্রাণী যেমন আমিষখণ্ডের উপরে পড়ে, সেইভাবে তাহার উপরে পড়িতাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গঠন কার্য্যে যে কয়েক বৎসর ব্যাপৃত ছিলাম, সে কয়েক বৎসর কার্য্যের ভিড়ে পড়িয়া আমার এই বুভুক্ষাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিতে পারিতাম না। আবার এতদিনের পরে সেই বুভুক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু হায়! আর সে শক্তি নাই। এখন মনে হয়, আবার যদি যৌবনের শক্তি পাই ও মনের মত লাইব্রেরী পাই, একবার প্রাণ ভরিয়া পড়ি। হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হওয়া অবধি আমি কলেজের পরীক্ষাতেও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। তদবধি এই কয়েক বৎসর আমি কলেজেও প্রথম স্থান অধিকার করিতে লাগিলাম। বিশেষ ভাবে ১৮৬৮ সালের কথা স্মরণ আছে। এই বৎসর আমার এল-এ দিবার বৎসর। আমি ১৮৬৬ সালে এন্‌ট্রান্স্‌ পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া সেকেণ্ড গ্রেড স্কলার্‌শিপ পাইয়াছিলাম। কলেজেও প্রথম হইয়াছিলাম। তদনুসারে এল-এ পরীক্ষাতে আমার ভাল হইবার কথা। কিন্তু ১৮৬৮ সালের প্রথমেই অগ্রে-উল্লিখিত বিধবা-বিবাহটী দিয়া সামাজিক নির্য্যাতন ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কি সংগ্রাম করিয়া এল-এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহারও বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। আমার নবধর্ম্মভাব আমাকে সেই সংগ্রামে শক্তি দিয়াছিল।

মহালক্ষ্মীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই যোগেনের বাসা ভাঙ্গিয়া গেল, আমরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে পড়িলাম, আমাদের জীবনের গতিও পৃথক হইয়া দাঁড়াইল। মহালক্ষ্মীর শোক আমার বড় লাগিয়াছিল। কিন্তু আমি নিজের শোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলাম না। তাহার মাতা ও ভ্রাতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ব্যগ্র থাকিতে হইল। মহালক্ষ্মী

চলিয়া গেলে, যখন তাহার মা আমার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমিও কি আমাদিগকে ছেড়ে যাবে?" তখন আর তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পারিলাম না। তাঁহাদের সঙ্গে আরও কয়েক মাস রহিলাম।

এই ১৮৬৯ সালের বসন্ত কালে আমরা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ মিলিয়া শোভাবাজারের রাজবাড়ীর নাটমন্দিরে সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের অভিনয় করিলাম। তাহার বিবরণ এই। সেবারে বি-এ পরীক্ষাতে সংস্কৃত বেণীসংহার পাঠ্য ছিল। আমাদের কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা মনে করিলেন সংস্কৃত বেণীসংহার অভিনয় করিয়া দেখাইলে বি-এ ক্লাসের ছেলেদের বিশেষ উপকার হইতে পারে। এই ভাবিয়া তাঁহারা বেণীসংহারের অভিনয়ের যোগাড় করিতে লাগিলেন। অগ্রে তাঁহারা আমাকে সে সংবাদ দেন নাই, অথবা আমাকে তাঁহাদিগের পরামর্শের অংশী করেন নাই। যখন তাঁহাদের কাজটা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে তখন আসিয়া আমাকে তাহাতে যোগ দিবার জন্য ধরিলেন। আমার পরামর্শটা মন্দ বোধ হইল না। বিশেষতঃ অভিনয় দেখা আমার বাতিক। বর্ত্তমান বঙ্গ রঙ্গভূমি-সকলে বারাঙ্গনা অভিনেত্রী প্রবিষ্ট করিবার পূর্ব্বে আমি প্রায় প্রতি শনিবার অভিনয় দেখিতে যাইতাম। স্মরণ আছে যে সোমপ্রকাশের প্রতিনিধিরূপে হরিনাভি হইতে অভিনয় দেখিতে কলিকাতায় আসিতাম। বারাঙ্গনা অভিনেত্রী যেদিন হইতে আসিল সেদিন হইতে আমার অন্তর্দ্ধান। সে যাহা হউক, সহাধ্যায়ী ছাত্রেরা যখন আমাকে ডাকিল, তখন তাহাদের কমিটিতে থাকিতে রাজি হইলাম এবং নিজে একজন অভিনেতা হইতে প্রস্তুত হইলাম। আমি হইলাম যুধিষ্ঠির, আমার বন্ধু যোগেন্দ্র হইলেন অর্জ্জুন ও অপর বন্ধু উমেশ হইলেন অশ্বত্থামা। কলেজের নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ছেলে দেখিয়া অভিনেত্রী

করা গেল। আমরা মোহাড়া দিয়া, সকলকে উত্তমরূপে শিখাইয়া, শোভাবাজারের রাজবাড়ীর নাটমন্দির ঠিক করিয়া, কলিকাতা, হুগলী, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কলেজ-সকলের বি-এ ক্লাসের ছাত্রদিগকে টিকিট প্রেরণ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছি, এমন সময়ে এই অভিনয়ের বিরুদ্ধে আমাদের কলেজের মধ্যেই মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। পণ্ডিত মহাশয়েরা বলিতে লাগিলেন যে ছেলেরা পড়াশুনা ছাড়িয়া কেবল অভিনয় লইয়া মাতিয়াছে। আর বাস্তবিক তাঁহাদের অভিযোগ করিবার কারণও ছিল। আমরা যাহাদিগকে অভিনেতা অভিনেত্রী করিয়াছিলাম, তাহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল। যাহাকে দুর্যোধন করিয়াছিলাম সে ভানুমতীকে ক্লাসের মধ্যেই প্রেয়সী বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে লাগিল, ইত্যাদি। এই-সব কারণে পণ্ডিত মহাশয়দিগের আপত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। আমি ইহার মধ্যে আছি জানিয়া তাঁহারা একদিন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি গিয়া দেখি যে সভাতে আমাদের প্রিন্সিপাল, বড় বড় অধ্যাপকগণ, আমার মাতুল মহাশয় ও অপরাপর পণ্ডিতগণ সকলেই সমাসীন আছেন। আমি ত দেখিয়াই কাঁপিয়া গেলাম। দণ্ডার্হ অপরাধীর ন্যায় তাঁহাদের সম্মুখে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইলাম। প্রিন্সিপাল সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ হইয়া বলিলেন, "আমাদের কাহারও ইচ্ছা নয় যে, তোমরা এই অভিনয় কর, ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইতেছে, তুমি ইহার ভিতর কিরূপে গেলে?"

আমি। আজ্ঞে, আমি আগে ইহার ভিতর ছিলাম না, পরে গিয়াছি। এবার বেণীসংহার বি-এ কোর্সে আছে; অভিনয় করিয়া দেখাইলে আমাদেরও উপকার, অন্য ছেলেদেরও উপকার।

প্রিন্সিপাল। তাহা হইলেও কালেজের ছেলে খারাপ করা কি ভাল?

আমি। যাহা কিছু দেখিতেছেন দুদিনের জন্য, তার পর সব থামিয়া যাইবে।

একজন অধ্যাপক। না না, তাহা হইবে না, ওসব বন্ধ করিয়া দাও।

আমি। মহাশয়দের অনভিমতে আমার কিছু করিবার ইচ্ছা নয়। আপনারা নিষেধ করিলে এখনি ও-সব থামিয়া যাওয়া উচিত। তবে মহাশয়দিগকে একটা কথা ভাবিতে বলি। অভিনয়ের আর তিন চার দিন আছে। হুগলী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কালেজের ছেলেদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, এখন না করিলে আমাদের বড় লজ্জার কথা। অন্ততঃ একবার অভিনয়ের জন্য অনুমতি দিন।

প্রিন্সিপাল। আচ্ছা তুমি যাও, আমরা বিবেচনা করি, তার পর তোমায় আবার ডাকিব।

আমি ত যে "আজ্ঞা বলিয়া" প্রস্থান করিলাম। বন্ধুদলে আসিয়া সংবাদ দিলে মহা উত্তেজনা দৃষ্ট হইল। তাহাদিগকে থামাইতে অনেক সময় গেল। অবশেষে অধ্যাপকগণ আবার ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা একবার মাত্র অভিনয় করিতে পার। তবে তোমাকে তিনটি কাজ করিতে হইবে। প্রথম, নিম্নশ্রেণীর যে-সকল বালককে অভিনয়ে লইয়াছ তাহাদের অভিভাবকদের অনুমতি আনিতে হইবে। দ্বিতীয়, অভিনয়স্থলে গায়ক ও বাদকদের সঙ্গে কলেজের ছেলেদিগকে মিশিতে দিবে না। তৃতীয়, নিম্নশ্রেণীর ছেলেদিগকে ঘরে পাঠাইয়া তবে তুমি সেস্থান ত্যাগ করিবে।" আমি "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাহাতেই সম্মত হইলাম।

যথাসময়ে রাজবাড়ীতে অভিনয় হইল। অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় বেশ হইল কিন্তু আমার সেদিন গুরুতর দায়িত্বভারে আমোদ করিবার

সময় হইল না। গায়ক ও বাদকদিগকে প্লাট্‌ফরমের নীচে বসাইয়া বেড়া দিয়া দিয়াছিলাম; নিজে সমস্ত সময় সাজঘরের ভিতর ছিলাম, কেবল নিজের অভিনয়ের সময় বাহিরে আসিয়াছিলাম; এবং রাত্রি ১টার সময় অভিনয় শেষ হইলে, প্রায় রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত বসিয়া ছিলাম, সকল অভিনেতা অভিনেত্রীকে গাড়ি আনাইয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া তবে নিজে বাড়ীতে গিয়াছিলাম। এই জন্য এই অভিনয়ের কথাটা এতদিন স্মরণ রহিয়াছে।

অবশেষে ১৮৬৯ সালের ৭ই ভাদ্র দিবসে যেদিন ব্রহ্মমন্দির খোলা হইল, সেদিন অপরাপর কতিপয় যুবকের সহিত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলাম। তদুপলক্ষে পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিয়া কন্যা সহ প্রসন্নময়ীকে আনিতে হইল। এক্ষণে ঐ দীক্ষার বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮৬৫ সাল হইতে আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকর্ষণ জন্মিলেও আমি কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে দূরে থাকিতাম, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। যতদূর মনে হয় তাহাতে দেখিতে পাই, তখন বিবাদ-পরায়ণ উন্নতিশীল দল অপেক্ষা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদিসমাজের দিকেই আমার অধিক আকর্ষণ ছিল। আমার যতদূর স্মরণ হয় আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (যিনি আদি সমাজের ব্রাহ্ম ও তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন এবং আমার নিকট সর্ব্বদা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসা ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের নিন্দা করিতেন) তিনিই এই আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিলেন। আমার মাতুল স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও উন্নতিশীল দলের পক্ষে ছিলেন না। তাহাও একটা কারণ হইতে পারে। সেই কারণে উন্নতিশীলদলের কাথাবার্ত্তা কাজকর্ম্ম যেন ভাল লাগিত না। বস্তুতঃ উন্নতিশীল দলের সঙ্গে আমি অধিক সংস্রব রাখিতাম না। তবে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ ত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। ১৮৬৮ সালের প্রারম্ভ অবধি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের সহিত যোগ কিঞ্চিৎ গাঢ়তর হয়। তাহা এই প্রকারে ঘটে। ১৮৬৮ সালের প্রারম্ভে শুনিলাম মাঘোৎসবের সময় উন্নতিশীল দল আপনাদের উপাসনা-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিবেন এবং তদুপলক্ষে নগর-কীর্ত্তন হইবে। এই সংবাদে আমার মাতুল ৺ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার কাগজে ও কথাবার্ত্তাতে ইহাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—"এ নেড়ানেড়ী কাণ্ড কেন?" তদ্ভিন্ন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ও অনেক

উপহাস বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি আমি শাক্ত বংশের ছেলে, বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের প্রতি পূর্ব্বাবধি অতিশয় অশ্রদ্ধা ছিল। এমন কি কোন যাত্রা গান শুনিতে গিয়া যদি দেখিতাম খোল করতাল আসিল ও কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, অনেক সময় সে স্থান পরিত্যাগ করিতাম। আমি ভাবিলাম উন্নতিশীল দল রাস্তাতে ঢলাঢলি করিতে যাইতেছে। এই ভাবিয়া বিরক্তচিত্তে উন্নতিশীল দলের দিকে না গিয়া ১৮৬৮ সালের ১১ই মাঘের উপাসনাতে আদি সমাজের উপাসনাতে গেলাম। উপাসনান্তে আদিসমাজের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে কয়েক জন বাবু আসিতেছেন। তাঁহারা বলিতে বলিতে আসিতেছেন, "মহাশয়! দেখ্‌লেন না তো, কেশব সহর মাতিয়ে তুলেছেন।" নগর-কীর্ত্তনে হাস্যাস্পদ না হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এই কথাটা বড় নূতন লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, সে কি রকম?" তখন তাঁহারা আমার হস্তে নগর-কীর্ত্তনের কাগজ দিলেন। আমি সেই সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে আছে—

তোরা আয়রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হলো অবসান—
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত-বিচার।

ইত্যাদি।

এই আহ্বান-ধ্বনি আমার প্রাণে বাজিল। আমার যেন মনে হইল আমাকে ডাকিতেছে। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আদর্শ আমার নিকট ধরিল, তাহাতে আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাঁদের উৎসব হবে কোথায়?" শুনিলাম সিন্দুরিয়াপটীস্থ গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে। অমনি সেই দিকে চলিলাম। উপাসনার

পর প্রাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল, তখন আর তাহা মনে থাকিল না। গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে গিয়া দেখি, কেশব বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় বাড়ী সাজাইতেছেন। তখনও উন্নতিশীল দল সেখানে আসেন নাই। তখন আবার কলুটোলা কেশব বাবুর ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গিয়া দেখি কেশববাবুরা সদলে সবে ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষার ঝুলিতে যে টাকা পাইয়াছেন তাহা গুনিতেছেন। আমার পুরাতন সহাধ্যায়ী বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সে সঙ্গে আছেন। গোঁসাইজী আমাকে দেখিয়াই "কি ভাই!" বলিয়া আসিয়া আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। সেই আমাকে উন্নতিশীল দলের সঙ্গে যেন বাঁধিয়া ফেলিলেন। তৎপরে আমি তাঁহাদের সঙ্গে গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে গেলাম। তাঁহারা সেদিন আহার করিলেন না, আমারও আহারের কথা মনে রহিল না। উৎসব-মন্দিরে গিয়া সমস্ত দিন উৎসব চলিল। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে এক কোণে যে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই কোণেই সমস্ত দিন ও রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া যোগ দিলাম। সমস্ত দিন যে-কিছু কাজ হইল আমি যেন তাহার ভিতর নিমগ্ন রহিলাম। সায়ংকালে গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স আসিলেন। সেদিন কেশববাবু Regenerating Faith বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এরূপ উপদেশ আমি অল্পই শুনিয়াছি। ধর্ম্ম-বিশ্বাস যদি নবজীবন আনিয়া না দেয় তবে তাহা ধর্ম্মবিশ্বাস নয়, এই সত্য আমার সমক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য একটা নূতন দ্বার যেন খুলিয়া দিল। আমি উন্নতিশীল দলের সঙ্গে হাড়ে হাড়ে বাঁধা পড়িলাম। অথচ শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন যে ইহার পরও আমি তাঁহাদিগের সঙ্গ হইতে লজ্জাবশতঃ দূরে থাকিতাম, তখন আমি প্রতি-দিন ব্রহ্মোপাসনা করিতাম (যদিও উপবীতটা তখন ছিল), কিন্তু ব্রাহ্মদের

সঙ্গে বড় মিশিতাম না। মধ্যে মধ্যে রবিবারে প্রাতে কেশববাবুর কলুটোলার বাড়ীতে উপাসনাতে যোগ দিতে যাইতাম, কিন্তু কীর্ত্তনের সময় ব্রাহ্মদিগের অনেকে গড়াগড়ি দিতেন, নানাপ্রকার চীৎকার করিতেন, ও পরস্পরের পা ধরাধরি করিতেন, কেশববাবুর পায়ে পড়িতেন, এজন্য ভাল করিয়া উপাসনাতে যোগ দিবার ব্যাঘাত হইত। সেই কারণে সর্ব্বদা যাইতাম না।

এই বৎসরই মুঙ্গের হইতে ব্রাহ্মসমাজে নর-পূজার আন্দোলন উঠে। আমাদের বন্ধুদ্বয় বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংবাদপত্রে প্রচার করিয়া দেন, যে, ব্রাহ্মেরা কেশববাবুকে "প্রভু ত্রাণকর্ত্তা" প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, তাঁহার চরণে ধরিয়া পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা লইয়া দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কেশবের দলকে পরিত্যাগ করিয়া যান। গোঁসাইজী নিজের শান্তিপুরের বাটীতে গিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। আমার স্মরণ হয় আমি এই বৎসরের মধ্যে শান্তিপুরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম; পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি আমার সহাধ্যায়ী, তাঁহার মুখে সমুদয় শ্রবণ করা উদ্দেশ্য ছিল। আমার স্মরণ আছে উন্নতিশীল দলে এই বিবাদ বাধাতে আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছিলাম। ইহাতে কেশববাবু হইতে আমার চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাঁহাদিগকে নরপূজা অপরাধে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস জন্মে নাই; ব্রাহ্মদিগের আচরণকে কেবলমাত্র ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু কেশববাবুর পত্রিকাতে প্রতিবাদকারীদের কথার উত্তর যেভাবে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্য যেরূপ প্রয়াস পাওয়া হইয়াছিল, তাহা সত্য ও ন্যায়ের অনুগত ব্যবহার নয় বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছিল।

যাহা হউক ১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে গোঁসাইজী তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া যখন আবার কেশববাবুর সহিত সম্মিলিত হইতে চাহিলেন, তখন যেন আমার হৃদয়ের একটা ভার নামিয়া গেল।

১৮৬৯ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে গোঁসাইজীর সহিত পুনর্ম্মিলন উপলক্ষে রাণাঘাটের সন্নিহিত কলাইবাটা নামক স্থানে একটা উৎসব হয়। ঐখানে গোঁসাইজী তখন সপরিবারে বাস করিতেন। আমি অপরাপর ব্রাহ্মের সহিত সে দিন সেখানে গমন করি। তৎপূর্ব্বে কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাৎভাবে আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই। সেই উৎসবক্ষেত্রে আলোচনাস্থলে নরপূজার আন্দোলনের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমি বলি, "মিরার ও ধর্ম্মতত্ত্বে কে লেখেন তাহা আমি জানি না, কিন্তু উক্ত উভয় পত্রিকাতে যেভাবে গোঁসাইজী ও যদুবাবুর কথার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহা ন্যায় ও ভদ্রতার অনুগত ব্যবহার নহে।" ইহাতে কেশববাবু কানে কানে অপর একজনকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগিনা। এটা মনে আছে কেশববাবু সেই দিন হইতে আমাকে বিশেষভাবে দেখিলেন ও চিনিলেন। আমি সে যাত্রা কেশব বাবুর সুপ্রসন্ন সরল ও স্বাভাবিক ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর তিনি সশিষ্যে কীর্ত্তন করিতে করিতে নৌকাযোগে চূর্ণী নদীতে বেড়াইতে গেলেন, আমরা যাই নাই। প্রাতে উঠিয়া দেখি কেশববাবু ব্রাহ্মদের পায়ের তলাতে একপাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছেন। আহার করিতে বসিয়া দেখিতাম, তাঁহার বড়মানুষী কিছুই নাই, সামান্য ডালভাত মনের আনন্দে আহার করিতেছেন। এ সকল আমার বড় ভাল লাগিত।

ক্রমে ৭ই ভাদ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আসিল। তখন কয়েকজন যুবককে দীক্ষিত করিবার প্রস্তাব হইল। আমার কোন

কোন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত কি না। আমি বলিলাম প্রকাশ্যে দীক্ষাটা তো বাড়ার ভাগ, আমি ত ব্রাহ্মই আছি। যাহা হউক অপরাপর যুবকের সহিত আমিও উক্ত দিবস দীক্ষাগ্রহণ করিব এইরূপ স্থির হইল। তদনুসারে আমরা প্রায় ২১ জন যুবক দীক্ষিত হইলাম। তন্মধ্যে কেশববাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, আমার সম্মানিত বন্ধু আনন্দমোহন বসু, পরলোকগত বন্ধু রজনীনাথ রায় ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়দিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা চিরদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই উপবীতটা আর রাখিব কি না এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। তৎপূর্ব্বে উপবীত কখনও আমার গলায় থাকিত, কখনও থাকিত না। সে সময়ে ছিল না। আমি স্থির করিলাম, আর লইব না। কিন্তু এই বিষয় লইয়া আত্মীয়স্বজনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল।

আমি চিরদিন দেখিতেছি কোনও একটা গুরুতর কর্ত্তব্য স্থির করিলে তাহা করিয়া উঠিতে আমার বিলম্ব হয়, তদুপযোগী বল আমার প্রকৃতিতে একবারে আসে না, বারবার উঠি ও পড়ি, প্রবৃত্তিকুলের সহিত প্রবল সংগ্রাম করিতে হয়; কখনও তাহারা জয়লাভ করে, কখনও আমি জয়লাভ করি; অবশেষে কিছুদিনের পর বল পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াই। এক লম্ফে স্বর্গে উঠা, এক উদ্যমে নিষ্কৃতিলাভ করা, এক প্রতিজ্ঞাতে প্রবৃত্তি দমন করিয়া ফেলা, আমার ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া এই স্থির করিয়াছি, আমি যখন উঠিতে চাহিতেছি, তখনও যে পড়িয়া যাই, ইহাতে ঈশ্বর আমাকে দেখাইতে চান যে, যে শত্রুর হস্তে আমি অগ্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছি তাহার শৃঙ্খল হঠাৎ ভগ্ন করা

কত কঠিন। ইহাতে যে-পাপ ত্যাগ করিতেছি তাহার প্রতি ঘৃণা বাড়ে এবং ব্যাকুলতাও বাড়ে।

যাহা হউক, আমি উপবীত রাখিব না, এরূপ সংকল্প করিয়াও তাহা ত্যাগ করিতে কিছুদিন গেল। প্রথমে মাতা ঠাকুরাণী এই সংবাদ পাইবা মাত্র মাতুলালয়ে আসিয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং কাঁদিয়া কাটিয়া উপবীতটা আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া গেলেন। তৎপরে যাহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি সেই উপবীত ফেলার বিরুদ্ধে বলে। আর আমি ভাবিতে গেলেও সম্মুখে বড় বিপদ দেখি। আমি পিতামাতার একমাত্র পুত্র, উন্মাদিনী গত হওয়ার পর আর তিনটী ভগিনী হইয়াছে, তাহারা সকলেই ছোট। আমি পিতা-মাতার একমাত্র অবলম্বন। লোকে যখন বলে, মা মরিবে, বাবা পাগল হইয়া যাইবেন, তখন কিছুই বিচিত্র মনে হয় না। কি করি, কি করি, এমন কঠিন সমস্যা আমার জীবনে কখনও উপস্থিত হয় নাই। এদিকে উপবীত রাখিয়া উপাসনা করিতে যাই, উপাসনা করিতে পারি না, কে যেন হৃদয়ে থাকিয়া ছি ছি বলে। কে যেন আমাকে চায়, কে যেন আমাকে ডাকে। এইরূপ মানসিক আন্দোলনে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; হজম-শক্তি নষ্ট হইয়া দারুণ উদরাময়ে ধরিল। অবশেষে আমি অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বর-চরণে পড়িলাম; আপনার বিচার ও কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিলাম; প্রার্থনাতে বার বার বলিতে লাগিলাম, "তুমি আমাকে লইয়া যাহা হয় কর।" কি আশ্চর্য্য! কিছুদিনের মধ্যে হৃদয়ে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। এত যে ভয় বিভীষিকা, কোথায় যেন পলাইয়া গেল! আমার মনে অভূতপূর্ব্ব বল ও উৎসাহ আসিল! উঠিতে, বসিতে, শুইতে, জাগিতে, কি এক অপূর্ব্ব আশ্বাসবাণী শুনিতে লাগিলাম! কে যেন বলিতে লাগিলেন, "তোমার কাজ আছে তোমাকে চাই, তুমি

অগ্রসর হইয়া চল।” আমি তখন আমার পত্রে পিতাকে এই কথা লিখিয়াছিলাম, তিনি পড়িয়া নিশ্চয়ই হাসিয়া থাকিবেন। আমি উপবীত ফেলিয়া দিলাম, কিরূপে বাধ্য হইয়া একাজ করিলাম, তাহা পিতাঠাকুর মহাশয়কে লিখিলাম। তিনি সে পত্র আমার মাতুলের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে ডাকাইয়া কথা কহিতে অনুরোধ করিলেন। মাতুল মহাশয় আমাকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকাইয়া, সাধারণ-ভাবে আমার সহিত উপবীত ত্যাগ সম্বন্ধে ও ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে তর্ক করিলেন। এই স্থানে বলা কর্ত্তব্য আমার মাতুল অতিশয় ধর্ম্মভীরু ও উদারচেতা মানুষ ছিলেন, কাহারও ধর্ম্মভাবের উপরে হাত দেওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল, তিনি রাগ উষ্মা প্রভৃতি কিছুই করিলেন না। বন্ধুতে বন্ধুতে যেরূপ কথাবার্ত্তা হয়, সেইরূপ সৌজন্যের সহিত আমার সঙ্গে কথা কহিলেন। পরে আমি চলিয়া আসিলে আমার পিতাকে লিখিলেন, “মানুষের অনেক প্রকার অন্ধতা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ধর্ম্মান্ধতাও একপ্রকার। ইহার ধর্ম্মান্ধতা হইয়াছে, বলপ্রয়োগে যে কিছু হইবে এরূপ মনে হয় না।” আমি পিতার ফাইল হইতে সে পত্র পরে দেখিয়াছি।

কিন্তু পিতাঠাকুর মাতুলের পরামর্শ শুনিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন, এবং প্রায় একমাস কাল আমাকে একপ্রকার নজরবন্দী করিয়া ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ব্রাহ্মণের ছেলের পক্ষে উপবীত ত্যাগ তখন তৎপ্রদেশে নূতন কথা, কেহ কখনও শোনে নাই। সুতরাং এই সংবাদে সমুদয় গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। এমন কি দুই চারি ক্রোশ দূর গ্রামের চাষার মেয়েরা পর্য্যন্ত আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহারা তখন আমার বিষয়ে কি ভাবিত তাহা ভাবিলে এখন হাসি পায়। একদিন প্রাতে বসিয়া

পড়িতেছি, এমন সময় কয়েকটী চাষার মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিঃশ্বাস পড়ে কি না এমনি তন্মনস্ক। আমার হস্তপদের প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি যখন বলিলাম, "মা, একটু তেল দাও নেয়ে আসি।" তখন একটী স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, "মা ঠাকরুণ! কথা কয়?" মা বলিলেন, "কথা কবে না কেন?" শুনিয়া আমার ভয়ানক হাসি পাইল। ভাবিলাম আমি যেটা কর্ত্তব্য বোধে করিতেছি, সেটা ইহাদের নিকট পাগ্‌লামি! শিক্ষাতে কি প্রভেদই ঘটাইয়াছে! আর একদিন বৈকালে একটী স্বসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক আসিয়া দেখেন যে আমি মুড়ি খাইতেছি। দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ওমা, এই যে মুড়ি খায়, কে বলে আমাদের মধ্যে নাই।" তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন আমি কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গিয়াছি।

যাহা হউক আমার বাবা আমাকে মাসাধিক কাল আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই সময়ের মধ্যে দিবারাত্র লোকের সমাগম ও একই কথা একই তর্ক; একই যুক্তি একই আপত্তি, একই গালাগালি। কতই বা তর্ক করিব, কতই বা উত্তর দিব। আমি একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিলাম। যিনি যাহা বলিতেন, বা তিরস্কার করিতেন, দ্বিরুক্তি করিতাম না। শেষে বাবা আর আমাকে আবদ্ধ রাখা বিফল বোধে আমাকে বিদায় দিলেন। সেদিনের কথা মনে হইলে আর চক্ষের জল রাখিতে পারি না। তিনি অতি সহৃদয় মানুষ ছিলেন। তাঁহার ভিতরে নীচতা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি আমার প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিসপত্র দিয়া নিজব্যয়ে আমাকে কলিকাতা পাঠাইলেন। তখন বুঝি নাই যে আমাকে জন্মের মত বর্জ্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। সেই অবধি ১৮ কি ১৯ বৎসর আমার মুখদর্শন করেন নাই; বা আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই।

আমি পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া যেন অকূল সমুদ্রে ভাসিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় বড় স্কলারশিপটা ছিল, সেজন্য অন্নবস্ত্রের চিন্তাতে অভিভূত হইতে হইল না। আমি আসিয়া পটলডাঙ্গা মির্জাফর্স্ লেনে, শ্রীযুক্ত বাবু হরগোপাল সরকারের সহিত একত্র বাসা করিলাম। তিনি রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী অন্নদায়িনীকে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়া বসিলেন। অন্নদায়িনীর ভগিনী কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী তখন আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। ইহাঁদের সংস্রবে থাকিয়া আমি বড়ই উপকৃত হইতে লাগিলাম। ইহাঁদিগকে দেখিয়া আমার নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া গেল। বিশেষতঃ ইহাঁদিগের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে রামতনু বাবুর সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া আমি সাধুতার যে আদর্শ দেখিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। আমি শ্বশুরকুল হইতে প্রসন্নময়ীকে আনিয়া ইহাঁদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম।

কিন্তু আর-এক কারণে এই সময় কিছুদিন ধরিয়া আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা বড়ই অসন্তোষকর অবস্থায় গিয়াছিল। সে কারণটী এই। যতদিন আমি ব্রাহ্মদের পশ্চাতে ছিলাম ও আপনাকে অনেকাংশে হীন বলিয়া মনে করিতাম, ততদিন আমার অন্তরে বিনয় ও ব্যাকুলতা ছিল। আমি আপনাকে সাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মরূপে পরিচিত হইবার অযোগ্য বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু দীক্ষার দিন হইতে সে অবস্থা চলিয়া গেল। আমি যেন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম; এবং হঠাৎ যেন একজন বড় ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইলাম। আমি তখন ব্রাহ্মদলের মধ্যে সর্ব্বত্রই সমাদর পাইতে লাগিলাম। সে সমাদরের উপযুক্ত আমি ছিলাম না। বোধ হয় এতটা সমাদর পাইবার দুইটী কারণ ছিল। প্রথম, ১৮৬৮ সালের শেষে আমার "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইবা মাত্র উহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত হয়। তদনুসারে আমি একজন উদীয়মান কবিরূপে পরিচিত হইয়াছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, আমার দীক্ষার সময় হইতে আমার মাতুল উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলকে "কেশব দল" নাম দিয়া সোমপ্রকাশে তাহাদের প্রতি গোলাগুলি বর্ষণ আরম্ভ করেন, তাহাতেও আমার নামটা সাধারণের মুখে উঠে। যে কারণেই হউক, আমি তখন হইতে লোকচক্ষুর গোচর হইয়া একজন মস্ত ব্রাহ্ম হইয়া দাঁড়াই। ইহাতে কিছুদিন আমার বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। আমার পূর্ব্বকার ব্যাকুলতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আমি কিছু অসাবধান হইয়া পড়ি, যে-সকল দুর্ব্বলতা ও কদভ্যাস অনেক চেষ্টাতে দমনে রাখিয়াছিলাম, তাহা আবার মাথা জাগাইয়া উঠে।

কিন্তু আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ দয়া বলিতে হইবে যে, আমি অচিরকালের মধ্যে আত্মদৃষ্টির সাহায্যে নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারি ও তাহার সংশোধনে প্রবৃত্ত হই। দীক্ষার সময় ও এই সময় কয়েকটী কবিতাতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয় সেগুলি ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকাতে প্রকাশ হইয়াছিল। অনুসন্ধান করিলে উক্ত পত্রিকার ফাইলে পাওয়া যাইতে পারে। কেবলমাত্র দুই চারি পংক্তি স্মৃতিতে আছে। পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া লিখিয়াছিলাম—

ভাসায়ে জীবন-তরী বিপত্তির সাগরে,
যাই দেব! দেখ দেখ রক্ষা কর আমারে;
মোর পক্ষ ছিল যারা,
বিপক্ষ হইল তারা,
ঘেরিল সকল দিক অপবাদ-আঁধারে,
বহিল প্রলয়-ঝড় মস্তকের উপরে।

অগ্রে যে আধ্যাত্মিক অবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

নিজ দলে গেলে পরে সমাদর পাই হে,
আপনারে বড় ভাবি তাই হে!
কিন্তু কি যে বড় আমি
জান তুমি অন্তর্য্যামী,
তব অগোচর প্রভু কোন কথা নাই হে।

যাহা হউক দীক্ষা ও সাধারণ সমাদরের ধাক্কা সাম্‌লাইয়া উঠিতে কিছুদিন গেল। আমি যে ব্রাহ্মদলে হঠাৎ কিরূপ সমাদৃত হইয়া পড়িলাম, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আমার দীক্ষার কয়েক মাস পরেই শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হইল। তখন উক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় জীবিত ছিলেন। তিনি আমার নিকট লোক পাঠাইয়া অনুরোধ করিলেন, যে, আমাকে উক্ত উপাসনাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অযোধ্যা-নাথ পাকড়াশী মহাশয়ের সহিত বেদীতে বসিতে হইবে ও উপদেশের ভার লইতে হইবে। আমি ভয়ে সঙ্কুচিত হইলাম। কিন্তু তাঁহারা কোনও মতেই ছাড়িলেন না। অবশেষে রাজি হইলাম। কিন্তু তাঁহারা চলিয়া গেলে, বেদীতে বসিতে হইবে ভাবিয়া লজ্জা ও ভয়ে মন অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু কি করি, কথা দিয়াছি। তখন অনন্যোপায় হইয়া উপদেশটি লিখিতে বসিলাম। লিখিয়া একপ্রকার দাঁড় করাইলাম। উপাসনাস্থলে সেইটী ভয়ে ভয়ে পাঠ করিলাম। কিন্তু বেদী হইতে নামিলেই দ্বিজেন্দ্রবাবু কোলাকুলি করিয়া আমার উপদেশের অনেক প্রশংসা করিলেন। সভাস্থলেও অনেকে সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পরদিন কলেজে বি-এ ক্লাসে পড়িতেছি, এমন সময় ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী

ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের নিকট হইতে কলেজের অধ্যক্ষের নামে এক পত্র আসিয়া উপস্থিত, "শিবনাথ ভট্টাচার্য্য নামে তোমাদের বি-এ ক্লাশে এক ছাত্র আছে, তাহাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য চাই।" তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঈশ্বর ঘোষাল তোমাকে ডাকিয়াছেন কেন?" আমি বলিলাম "কিছুই জানি না, তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় নাই।" তখন আমাকে পাঠাইবার পূর্ব্বে ঈশ্বর ঘোষাল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া দিলেন। বলিলেন, "সাবধান, তিনি তোমাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ভজাইবেন।" সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই গিয়া শুনিলাম। ঘোষাল মহাশয় পূর্ব্বদিনে শ্যামবাজারের উপাসনাতে উপস্থিত ছিলেন, এবং আমার উপদেশে প্রীত হইয়াছেন। তিনি আমাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মহৎভাব দেখাইবার জন্য আদিম প্রফেটদিগের ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত পরবর্ত্তী ঘটনা তুলনা করিয়া দেখাইতে লাগিলেন; এবং আমাকে একখানি বাইবেল উপহার দিলেন। আমার প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া বিদায় করিলেন। আমি ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম "ইনি কেন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন না?"

শ্যামবাজারের উপদেশের ধাক্কা এখানেও থামিল না। কয়েকদিন পরেই সিন্দুরিয়াপটী পারিবারিক-সমাজ হইতে ক্ষেত্রনাথ শেঠ নামে একজন সভ্য আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, উক্ত পারিবারিক-সমাজের সকলের ইচ্ছা যে, আমি তাঁহাদের সমাজের আচার্য্যের ভার গ্রহণ করি। অগ্রে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় সেই সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিতেন, কিন্তু কার্য্যবাহুল্য নিবন্ধন তিনি সেই ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পাকড়াশী মহাশয়ের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। আমি তাঁহার উপদেশে বিশেষ

উপকৃত হইয়াছি। আর বাস্তবিক ব্রাহ্ম আচার্য্যদিগের মধ্যে চিন্তাশীলতা মৌলিকতা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিষয়ে এরূপ অল্প লোক দেখিয়াছি। তাঁহার পরিত্যক্ত বেদী আমি গ্রহণ করিব, ইহা ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইলাম। কিন্তু তাঁহাদের হাত এড়াইতে পারি না। শেষে, এক শুক্রবারে গিয়া উপাসনা করিতে স্বীকৃত হইলাম। এবারেও উপদেশ লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। এই একবার উপদেশ দিয়া আমার বিপদ দশগুণ বাড়িয়া গেল। তাঁহারা আমাকে নাছোড়-বান্দা হইয়া ধরিলেন। কাজেই আচার্য্যের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। এই ভার আমার প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আচার্য্যের কার্য্যশিক্ষার উপায়স্বরূপ হইল। আমি কয়েক বৎসর এই কাজ করিয়াছিলাম। যেখানেই থাকি, শুক্রবার সন্ধ্যার সময় সিন্দুরিয়াপটীতে আসিয়া উপস্থিত হইতাম; কি বলিব, সে বিষয় সপ্তাহকাল ভাবিতাম; উপাসক-মণ্ডলীর অভাব নিজ চিত্তে ধারণ করিবার চেষ্টা করিতাম; প্রত্যেকের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবার চেষ্টা করিতাম; সংক্ষেপে বলিতে গেলে আচার্য্যের দায়িত্ব অনেকটা অনুভব করিতাম। এই দায়িত্বজ্ঞানই আমাকে ফুটাইয়াছে।

ক্রমে সেই ক্ষুদ্র উপাসক-মণ্ডলীর সকলের সঙ্গে ভালবাসা জন্মিয়া গেল। সে সম্বন্ধ বহুকাল রহিয়াছে। গোপালচন্দ্র মল্লিক, নেপালচন্দ্র মল্লিক, সিন্দুরিয়াপটী-পরিবারের দুই ভাই, যতদিন জীবিত ছিলেন আমাকে বিধিমতে নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। শেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে গোপালচন্দ্র মল্লিক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে প্রবেশ করেন ও ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়া স্বীয় পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মণিলাল মল্লিক আদিসমাজভুক্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনিই ঐ পারিবারিক-সমাজ স্থাপন করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৮৭০ সালের প্রারম্ভে কেশববাবু বিলাত গেলেন। তাঁহার বিচ্ছেদে আমার মনে বড় ক্লেশ হইয়াছিল। দীক্ষার পর তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁহাতে আমাতে এমন একটা কি ছিল, যাহাতে তিনি আমাকে দেখিলেই প্রীত হইতেন, আমি তাঁহাকে দেখিলে প্রীত হইতাম। আমার সঙ্গে তাঁর হাসি ঠাট্টা রসিকতা চলিত। একবার একজন আমাকে বলিয়াছিলেন, কেশববাবুর মনের একটা চাবি তোমার কাছে আছে। তাঁহার নিকট আমার মনের ভালমন্দ কোনও কথা বলিতে সংকোচ বোধ হইত না। অবাধে সকল কথা তাঁর কানে ঢালিতাম। এমন কি, তাঁহার যে কথা আমার মনের সঙ্গে না মিলিত তাহাও তাঁহাকে জানাইতে আমার সংকোচ-বোধ হইত না।

তাঁহার সহিত আমার কিরূপ হাসিঠাট্টা চলিত তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা মন্দ নয়। একবার হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে প্রাতঃকালীন উপাসনাতে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য আমি তাঁহাকে রাজি করি। আমি তখন হরিনাভি স্কুলের হেডমাষ্টার। তিনি প্রত্যূষে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া প্রাতে গিয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহার প্রাতরাশের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত রাখিয়াছিলাম। আমি জানিতাম, তিনি প্রাতে অপরাপর জিনিসের মধ্যে ভিজা ছোলা ও আদা খাইয়া থাকেন। সুতরাং ভিজা ছোলা ও আদা প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল। ভিজা ছোলা দেখিয়াই তিনি ভারি খুসী হইলেন, বলিলেন, "বাঃ, আমি যে প্রাতে ভিজা ছোলা খাই, তাহা জানিলে কিরূপে?"

আমি বলিলাম "এ আবার আশ্চর্য্যের বিষয় কি? আপনার দৈনিক রীতির যদি এতটুকুও না জান্‌লাম, তবে আপনার সঙ্গে কি মিশ্‌লাম? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনি এত ভিজে ছোলা ভালবাসেন কেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"ভিজে ছোলা খাবনা! গাড়ীতে যুতে টানাও কেমন?" বলিয়াই হাসিয়া আবার বলিলেন, "শুধু গাড়ীতে যুতে টানান নয়, চাবুক মার্‌তেও ত কসুর কর না।" তখন আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁর কাজের সমালোচনা করিতাম। এই চাবুক মারার অর্থ তাহাই। শুনিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম "বে-আদবী মাপ কর্‌বেন; আপনি বেদীতে বসে চাট মার্‌তেও ত ছাড়েন না।" এই কথা লইয়া খুব হাসাহাসি পড়িয়া গেল।

আর-একবার আমার একটী বন্ধুর কন্যার নামকরণে তাঁহার উপাসনা করিবার কথা। সন্ধ্যা ৭টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে এইরূপ স্থির ছিল। আমরা বসিয়া আছি, তিনি আর আসেন না। তিনি গবর্ণর জেনারেলের বাড়ীতে এক সান্ধ্যসমিতিতে গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, তিনি একবার দেখা দিয়াই চলিয়া আসিবেন। এদিকে ৮টা বাজিয়া গেল, ৮॥ টা বাজিয়া গেল, তাঁহার দেখা নাই। অবশেষে প্রায় ৯টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম—"আপনি বড়লোকদের ল্যাজ ধরে কেন বেড়ান? কই আপনাকে ত কোন টাইটেল দেয় না?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কেন হে বাপু? K. C. S. I. (অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেন আমি), আমার টাইটেলের অপ্রতুল কি?"

আর-একবার আমি তাঁহার ঘরে গিয়া দেখি, তিনি ঘুমাইতেছেন, কিন্তু চোখে চশ্‌মা আছে। জাগিলে আমি বলিলাম—"যদি ঘুমাচ্ছেন, তবে চোখে চশ্‌মা কেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন "ওহে বাপু, স্বপন ত দেখ্‌তে হয়।"

তিনি যখন ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন, তখন একদিন আমাদের অনেককে একত্র করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন, তিনি বিদেশে যাইতেছেন, কি হয় স্থিরতা নাই, তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর যে-সকল মত লইয়া বিবাদ হইবার সম্ভাবনা সে-সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটা কথা মনে আছে। তিনি মহাপুরুষের মতের উল্লেখ করিয়া বলেন, যে, তিনি মহাপুরুষদিগকে মনে করেন যেন চশ্‌মা,—অর্থাৎ চশ্‌মা যেমন চক্ষুকে আবরণ করে না, কিন্তু দৃষ্টির উজ্জ্বলতা সম্পাদন করে, তেমনি মহাপুরুষগণ ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরদর্শনের ব্যাঘাত করেন না, কিন্তু ঈশ্বরদর্শনের সহায়তা করেন। অথবা মহাপুরুষেরা যেন দ্বারবান, দ্বারবান যেমন আগন্তুক ব্যক্তিকে প্রভুর সমীপে উপনীত করিয়া দেয়, তৎপরে আর তার কাজ থাকে না, তেমনি মহাপুরুষগণ ঈশ্বর-চরণে মানবকে উপনীত করিয়া দেন, নিজেরা আর মধ্যে থাকেন না। আমার মনে হইতেছে আমি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'মহাপুরুষেরা চশ্‌মা তাহা ঠিক, কিন্তু কাহাকেও যদি বারবার বলা যায়, "দেখ, দেখ, ঐ তোমার চোখে চশ্‌মা, ঐ তোমার চোখে চশ্‌মা" তাহা হইলে দ্রষ্টব্য পদার্থ হইতে তাহার দৃষ্টিকে তুলিয়া, সে দৃষ্টিকে চশ্‌মার উপরেই ফেলিয়া দেওয়া হয়। তেমনি মহাপুরুষগণ ঈশ্বর দর্শনের সহায় হইলেও, "ঐ মহাপুরুষ ঐ মহাপুরুষ" করিয়া যদি তাঁহাদের প্রতিই দৃষ্টিকে অধিক আকৃষ্ট করা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে পশ্চাতে ফেলা হয়।'

যাহা হউক, তাঁহার বিচ্ছেদে আমি বড়ই ক্লেশ পাইয়াছিলাম, এবং তৎকালের ভাব প্রকাশ করিয়া একটী কবিতা লিখিয়াছিলাম; সেটী তাঁহার পত্নীর উক্তিতে। তাহা বোধ হয় অবলাবান্ধবে কি অন্য কোনও পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি কেশববাবুর নিকট অনেক শিখিয়াছি। কি ভাবে ঈশ্বরের কাজ করিতে হয়, তাহা তাঁহাকে

দেখিয়া বুঝিয়াছি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর কাহাকে বলে তাহা তাঁহাকে দেখিয়া জানিয়াছি।

এই সময় যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার যতগুলি স্মরণ হইতেছে লিখিতেছি। ঠিক কোন্ তারিখে কোনটী ঘটিয়াছে তাহা মনে নাই।

প্রথম উল্লেখযোগ্য কথা, আমার বার বার বাড়ীতে যাওয়া ও তাড়িত হইয়া আসা। আমার পিতা আমাকে গৃহ হইতে বিদায় দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমার মুখদর্শন করিবেন না। কিন্তু আমি জননীর জন্য বাড়ীতে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমার মা তখন কি দশাতে বাস করিতেছিলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম, কিন্তু আমার পিতার ইচ্ছা নয় যে, আমি গ্রামে পদার্পণ করি। আমি তাঁহাকে গোপন করিয়াই তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বাড়ীতে যাইতাম। তিনি লোকমুখে আমি মার কাছে গিয়াছি শুনিলেই আমাকে প্রহার করিবার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করিয়া লইয়া আসিতেন। পাড়ার ছোট ছেলেরা আমাকে বড় ভালবাসিত, বাবা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেছেন দেখিলেই তাহারা গোপনে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিয়া যাইত, আর অমনি আমি মাতার চরণধূলি লইয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া পলাইতাম। পলাইয়া আসিয়া আমার গ্রামবাসী ব্রাহ্মবন্ধু কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইতাম। আমি পরে শুনিয়াছিলাম, বাবা এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে লাঠিয়াল নিযুক্ত করিবার জন্য ২২৲ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে আমাকে মারিবার জন্য ২২৲ টাকা ব্যয় করা সামান্য প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তার কথা নয়। বাবার প্রতিজ্ঞার এই দৃঢ়তা আমাতে কিছু অধিক মাত্রায় থাকিলে ভাল হইত। শেষে বাবা কেন যে সে সংকল্প ত্যাগ করিলেন, বলিতে পারি না। শুনিয়াছি গ্রামের মেয়েরা বিরোধী হওয়াতে তাঁহাকে সে সংকল্প ত্যাগ করিতে

হইল। গ্রামের লোকে চিরদিন আমাকে ভালবাসে। আমি পিতাকে লুকাইয়া গ্রামে যাইতাম বটে, কিন্তু গ্রামের আত্মীয়গণের সহিত দেখা করিতাম। বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিতাম। মেয়েরা আমাকে বড় ভালবাসিতেন, আমি মেয়েদিগকে ভালবাসিতাম। শেষে মেয়েদের ভাব দেখিয়া গ্রামের লোকে বাবাকে বলিতে লাগিল, "তুমি তাকে বাড়ীতে যেতে না দিতে পার, কিন্তু গ্রামে আসিতে দেবে না এ কেমন কথা, তুমি কি গ্রামের মালিক?" গ্রামের লোকের অনুকূলভাব দেখিয়া বাবাও অনুকূল ভাব ধরিলেন। তখন আমি অবাধে গৃহে গিয়া মাতাকে দেখিয়া আসিতে লাগিলাম। আমি গৃহে আছি জানিলে বাবা সেদিকে আসিতেন না এইমাত্র। কিন্তু বাবা আমাকে দেখা বা আমার সঙ্গে কথা কহা বন্ধ রাখিলেন।

এদিকে কলিকাতাতে সকল দলের ব্রাহ্মেরা আমাকে বন্ধু ভাবে ডাকিতে লাগিলেন। তখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের মধ্যে আনন্দবাদী দল নামে একটী দল হইয়াছিল, অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই দলের নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। ১৮৬৬ সালে কেশববাবু "Jesus Christ, Asia and Europe" নামে সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা করেন, যে জন্য গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স তাঁহার প্রতি প্রীত হন; এবং তাঁহার সঙ্গে কেশববাবুর বন্ধুতা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তদবধি কেশববাবুর দলের লোকদিগের যীশু-খ্রীষ্টের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক হইয়া পড়ে। বড়দিনের সময় যীশুর ধ্যানে দিন যাপন করা, বাইবেল পড়া, বাইবেলের ব্যাখ্যা করা, খ্রীষ্টীয় মিশনারীদিগের সহিত মিশামিশি করা ইত্যাদি হইতে থাকে। এ কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, বাইবেল পাঠ ও খ্রীষ্টীয় মিশনারীদিগের সহিত মিশামিশি কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে চলিতেছিল। এখন সেই ভাবটা কিছু

প্রবল হয়। ইহার ফলস্বরূপ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মভাব যে অনুতাপ ও প্রার্থনা তাহা উন্নতিশীল দলকে প্রবলরূপে অধিকার করে। পাপবোধ নব্যব্রাহ্মদের সকলের অন্তরে প্রবল হইয়া উঠে। অনুতাপ-ব্যঞ্জক সংগীতাদি রচিত হইতে থাকে। ইহার উপরে বোধ হয় ১৮৬৭ সালে গোঁসাইজী উদ্যোগী হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠকে ডাকিয়া আনিয়া উন্নতিশীল দলকে বৈষ্ণব সংকীর্ত্তন শুনান। তদবধি সংকীর্ত্তন-প্রথা ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রবেশ করে। এই-সকল উত্তেজনার ফলস্বরূপ ১৮৬৮ সালে নরপূজার হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। এই পাপবোধ ও ব্যাকুলতার ভাব হইতেই ব্রাহ্মেরা কেশববাবুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতেন।

যখন একদিকে অনুতাপ, ব্যাকুলতা ও প্রার্থনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, তখন অপরদিকে ব্রাহ্মদের মধ্যে একদল লোক বলিতে লাগিলেন, "এত অনুতাপ ও ক্রন্দন কেন? প্রেমময়ের গৃহে এত ক্রন্দনের রোল কেন? আনন্দময়ের প্রেমমুখ দেখিয়া আনন্দিত হও।" এই দলকে ব্রাহ্মেরা তখন আনন্দবাদী দল বলিতেন। শিশিরবাবু ইঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। নরপূজার হাঙ্গামা দেখিয়া ইঁহারা আমাদের ভিতর হইতে সরিয়া পড়িলেন। ১৮৬৯ সালের মাঘোৎসব ভারতবর্ষীয়-ব্রহ্ম-মন্দিরের অসম্পূর্ণ বাড়ীতে চাঁদোয়া খাটাইয়া সমাধা করা হয়। সেই উৎসবে একজন মুঙ্গের হইতে সমাগত ব্রাহ্ম, উপাসনান্তে কেশববাবুর চরণে ধরিয়া কি প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শিশিরবাবুর দাদা হেমন্তবাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া, এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয়কেও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বাহিরে যাইতে দেখিলাম।

ইহার পরে অমৃতবাজারের দলকে আর আমাদের উপাসনাতে বড় আসিতে দেখিতাম না। কলিকাতা পটলডাঙ্গা, পটুয়াটোলা লেনে

যশোরের লোকদের এক বাসা ছিল। শিশিরবাবু সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। তিনি আসিলেই আনন্দবাদী দলের সমাগম হইত। তাঁহারা আমাকে ডাকিতেন। সে সময়ে প্রধানতঃ সংগীত ও সংকীর্ত্তন হইত। টাকীনিবাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু হরলাল রায় সেই কীর্ত্তনে গড়াগড়ি দিতেন। শিশিরবাবু চমৎকার কীর্ত্তন করিতে পারিতেন। তাঁহার কীর্ত্তনে আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিত। সেখানে নূতন ধরণের সংগীত হইত। কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলে তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে। একটী সঙ্গীতে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলা হইত,

"তোমার রাগে রাঙ্গা নয়নতলে বহে দেখি প্রেমধার।"

আর-একটী সংগীত যাহা তাঁহাদের মুখে সর্ব্বদা শুনিতাম তাহা এই,

"মা যার আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ
তবে কেন রোগে শোকে পাপে তাপে বৃথা কান্দ?
মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তার চারিপাশে
ভাসাইয়াছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে
একবার বাহুতুলে "মা মা" বলে
নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ।"

এই গান করিয়া সকলে নৃত্য করিতেন।

একদিকে যেমন অনুতাপ ও ক্রন্দন শুনিতাম, অপরদিকে ইঁহাদের কাছে গিয়া আনন্দ ও নৃত্য দেখিতাম, তখন ইহা বেশ লাগিত। শিশির বাবুদের ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। ইহার পরেই তাঁহারা কলিকাতা হিদেরাম বাঁড়ুয্যের গলিতে আসিয়া বাসা করিয়া থাকেন। সে সময়ে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতাম। শিশির বাবুর অমায়িকতা দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। একদিনের কথা স্মরণ আছে, তিনি সেদিন আমাকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

আহারের সময় উপস্থিত হইলে বলিলেন, "কি পরের মত বাহিরে বসে খাবে, চল রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলি, হাঁড়ি হতে গরম গরম ভাত তরকারি মার হাতে না খেলে সুখ হয় না।" এই বলিয়া দুজনে গিয়া রান্নাঘরে আহারে বসিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, তাঁর জননী গরম গরম ভাত তরকারি দিতে লাগিলেন, ও আমরা আহার করিতে লাগিলাম। ইহার পর হইতে শিশির বাবুরা অল্পে অল্পে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িলেন।

এই সময়ের আর-একটী বিবরণ স্মরণ আছে। প্রসন্নময়ী কলিকাতাতে আসিয়া গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। আমার স্কলারশিপ মাত্র অবলম্বন, এদিকে আমার বি-এ পরীক্ষার বৎসর উপস্থিত। সাংসারিক চিন্তা, রোগীর সেবা, শিশুকন্যা হেমলতার রক্ষণাবেক্ষণ, এই-সকল কারণে আমার পাঠের সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল। এই সময় স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয় ও অপরাপর কতিপয় ডাক্তার বন্ধু সহায় না হইলে, এই বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম না। অবশেষে ১৮৭০ সালে ৮ই শ্রাবণ আমার দ্বিতীয়া কন্যা তরঙ্গিনীর জন্ম হইল। সে সাতমাসে জন্মিয়াছিল। তাহাকে তুলার বিছানা করিয়া কৃত্রিম তাপ দিয়া বাঁচাইতে হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম তুলী হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাই অদ্যাপি আছে। তাহার জীবন রক্ষা খাস্তগির মহাশয়ের চিকিৎসা-পারদর্শিতার একটী উজ্জ্বল প্রমাণ। সে যে বাঁচিবে, কেহই তাহা মনে করে নাই। দুই এক মাস পরেই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য, কলাইঘাটার যে কুঠীতে উৎসব হইয়াছিল এবং যেখানে তদবধি আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু নীলকমল দেব ছিলেন, সেখানে প্রসন্নময়ীকে রাখিয়া আসি এবং আমি ৩৩ নং মুসলমানপাড়া লেনে, যে বাসাতে রজনীনাথ রায়, নন্দলাল রায়,

সারদানাথ হালদার, শ্রীনাথ দত্ত, কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সদ্যদীক্ষিত ব্রাহ্মবন্ধুগণ বাস করিতেছিলেন, সেই বাসাতে তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া বাস করিয়া বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি।

এই সময়ের আর দুইটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য আছে। প্রথম—অবলাবান্ধব-সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত মিলন। ইহারই কিছু পূর্ব্বে ঢাকা হইতে "অবলা-বান্ধব" নামে পত্রিকা বাহির হয়। তখন ঢাকা সমাজ-সংস্কারের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়েই "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" নামে এক পুস্তিকা ঢাকা হইতে বাহির হয়। তাহাতে সেখানকার যুবকদলের উপরে আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মে। এই রঙ্গভূমিতে অবলাবান্ধব দেখা দিল। আমরা ভাবিলাম, এ কে বঙ্গদেশের এক কোণ হইতে নারীকুলের হিতৈষী হইয়া দেখা দিল? অবলা-বান্ধবের সম্পাদককে তখন চিনিতাম না, কিন্তু তাঁহার তাজা তাজা কথা প্রাণ হইতে আসিতেছে বোধ হইত ও আমাদের বড় ভাল লাগিত। ক্রমে ঢাকার প্রসিদ্ধ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অভয়াচরণ দাসের পুত্র প্রাণকুমার দাস একবার কলিকাতায় আসিয়া আমাকে ও অপরাপর কয়েকজনকে তাহার লেখক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া গেলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয় আমি রাধারাণীকেও বলিয়া কহিয়া লেখিকা করিয়াছিলাম। অবলাবান্ধবে আমার গদ্যপদ্যাত্মক প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত। দুঃখের বিষয় উক্ত পত্রিকার একখানি ফাইল খুঁজিয়া পাই নাই।

অবলা-বান্ধবের সহিত যোগ রহিয়াছে, সেই সময়ে একদিন কলেজে পড়িতেছি, এমন সময়ে উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়া আমাকে বলিল, "ওরে ভাই, অবলা-বান্ধবের এডিটার কলিকাতায় এসেছে, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।" অমনি আমি আমাদের "হিরোকে"

দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। গিয়া দেখি এক দীর্ঘাকৃতি একহারা পুরুষ স্কুল-মাষ্টারের মত লম্বা চাপকান পরা, দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সেদিন আর অধিক কথা হইল না। সে যাত্রা বোধহয় তিনি কয়েক দিন পরেই দেশে চলিয়া গেলেন; কিন্তু কিছুদিন পরেই "অবলা-বান্ধব" লইয়া কলিকাতায় আসিলেন; এবং পূর্ব্ববঙ্গীয় যুবকদিগের নেতাস্বরূপ হইয়া ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীস্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিলেন।

এই সময় কলিকাতাতে তাঁহার আগমন, ও বরিশাল হইতে স্বর্গীয় বন্ধু দুর্গামোহন দাসের কলিকাতাতে আগমন। স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে যেন মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। ইহার ফল পরে বলিব।

দ্বিতীয় ঘটনা গণেশসুন্দরীর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ও তৎপরে ব্রাহ্মসমাজে আগমন। গণেশসুন্দরী কলিকাতা-নিবাসী এক বৈদ্য-পরিবারের বিধবা কন্যা। মিশনারী মহিলাগণ তখন হিন্দু গৃহস্থদিগের বাড়ীতে বাড়ীতে অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু-ললনাদিগকে পড়াইয়া বেড়াইতেন। অতি অল্প ব্যয়েই তাঁহাদিগকে পাওয়া যাইত। এইজন্য অনেক ভদ্রলোক নিজ গৃহে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া স্বীয় স্বীয় ভবনের মহিলাদিগকে পড়াইতে দিতেন। আমিও প্রসন্নময়ীকে আনিয়া প্রথমে এইরূপে পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। তৎসম্বন্ধে একটা কৌতুককর গল্প মনে আছে। তাহা এই স্থানে বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে মেম প্রসন্নময়ীকে পড়াইতেন, তিনি সপ্তাহে দুই দিন আসিতেন। একবার আসিয়া মেম মানবের আদি পিতা-মাতা আদম ও হবার (Adam and Eve) বিবরণ মুখে প্রসন্নময়ীকে বলিয়া গেলেন। তারপর গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া প্রসন্নময়ী আদম-হবার কথা সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিনে আসিয়া মেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌ, মানবের আদি পিতা-মাতা কে ছিল?" প্রসন্নময়ী ত অন্ধকার

দেখিলেন, আদম ও হবা মনে আসিল না। তখন মেম তিরস্কার করিয়া বলিয়া গেলেন, "তোমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পার না?" মেম পুনরায় আসিবার দিন প্রাতে প্রসন্নময়ী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গো, মানুষ আগে কি করে হলো?" আমি বলিলাম "তা কে জানে? তবে একজন পণ্ডিত বলেছেন যে আগে মানুষ বানর ছিল, বানর হতে মানুষ হয়েছে।" সেদিন মেম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মানুষ কেমন করে হলো?" প্রসন্নময়ীর আবার আদম হবা মনে নাই। তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার বাবুকে জিজ্ঞাসা কর না কেন?" প্রসন্নময়ী ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছেন 'বানর হতে মানুষ হয়েছে।'" মেম বলিলেন, "তোমার বাবু বড় দুষ্টু, তোমাকে তামাসা করেছে।" প্রসন্নময়ী বলিলেন "না, তামাসা করেন নি, সত্যি সত্যি বলেছেন।" সেদিন ঘটনাক্রমে আমি অন্য ঘরে ছিলাম, মেম যাইবার সময় আমার নিকট আসিলেন। তখন ডারুইনের নূতন মত সম্বন্ধে সমুদয় কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি প্রসন্নময়ীকে পরে বলিয়াছিলেন, "তোমার বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।" শুনিয়া আমি অনেক হাসিয়াছিলাম।

এইরূপ একজন মিশনারী মেম গণেশসুন্দরীকে পড়াইতেন। একদিন গণেশসুন্দরী স্বীয় বিধবা মাতাকে ও ভ্রাতৃগণকে কিছু না বলিয়া মিশনারী-দিগের আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন। পরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, মেম যখন তাঁহাকে বলিতেন, যে, তিনি অনন্ত নরকের ধারে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন ভয়ে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত এবং তিনি ত্বরায় যীশুর আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। যাহা হউক, যে কারণেই হউক, তিনি মিশনারীদিগের আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন। ইহা লইয়া সহরে তুমুল আন্দোলন ও হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। মোকদ্দমায় গণেশ-

সুন্দরীর ভ্রাতৃগণ হারিয়া গেলেন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত ও স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়াছে বলিয়া স্থির হইল। আন্দোলন ও সংবাদপত্রের গালাগালি চলিতে লাগিল। কেবল সংবাদপত্রের গালাগালি নহে। একদিন হাতাহাতিও হইল। সেদিন পাদরী ভন (Vaughan) সাহেব, যাঁহার আশ্রয়ে গণেশসুন্দরী ছিলেন, তিনি কলেজ স্কোয়ারের কোণে প্রচার করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। কোথা হইতে গণেশসুন্দরীর ভ্রাতা চন্দ্র সদলে বৃক-যূথের ন্যায় আসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। পাদরী সাহেব দুমি ঢিল ঢেলা খাইয়া ধাবিত হইয়া সংস্কৃত কলেজের সম্মুখস্থিত শ্যামাচরণ দে বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় লইয়া নিরাপদ হইলেন। ঐ বাড়ীর লোকে আক্রমণকারী যুবকদিগকে তাড়া করিল, তাহারা কোন্ গলি দিয়া কোথায় পলাইল। তখন পাদরী সাহেব বলিলেন, "কি বলিব, পুরোহিত, নতুবা আমি তিন ব্যক্তি নিপাত করিতে পারিতাম।" শুনিয়া আমরা অনেক হাসিয়াছিলাম।

যাহা হউক সংবাদপত্রের আন্দোলন থামিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মযুবকগণ গণেশসুন্দরীর ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে খ্রীষ্টীয়দিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য লাগিল। শোনা গেল, তিনি খ্রীষ্টীয়গণের নিকট সুখে নাই; আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন এবং স্বীয় জননীর নিকট আসিতে চাহিতেছেন; কিন্তু তিনি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া জননী লইতে সাহস করিতেছেন না। এই অবস্থাতে উদ্ধারকারী ব্রাহ্মগণ আসিয়া গণেশসুন্দরীকে স্বীয় পরিবারে লইবার জন্য আমাকে ধরিলেন। আমি তখন নূতন সংসার পাতিয়া ঘরকন্না করিতেছি। আমি বালিকাটির অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া "না" বলিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, আমাদের আহারের যদি দুমুটা জুটে ত তারও জুটিবে। গণেশসুন্দরী আবার পলাইয়া খ্রীষ্টীয়দিগের আশ্রয় হইতে আমার ভবনে আসিলেন।

আমার বাড়ীতে তিনি আমার ভগিনীর ন্যায় হইয়া আমাদের কষ্টের অংশ লইয়া কয়েক বৎসর ছিলেন। তৎপরে ঈশ্বর-কৃপায় অতি উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত বিবাহিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার গণেশসুন্দরী নাম ভুলিয়া তাঁহার অপর নাম মনোমোহিনীই প্রবল করিয়াছি। তিনি সেই নামে এখনও আমার ভগিনী বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে পরিচিতা।

কেশব বাবু কয়েক মাস পরে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই নানা নূতন কাজের প্রস্তাব করিলেন। Indian Reform Association নামে একটী সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে Temperance, Education, Cheap Literature, Technical Education প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন। আমি সকল কাজেই তাঁহার অনুসরণ করিতাম। আমি সুরাপান বিভাগের সভারূপে "মদ না গরল" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলাম। তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধ-সকল বাহির হইত। সে-সমুদয়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম। তদ্ভিন্ন "সুলভ সমাচার" নামক এক পয়সা মূল্যের যে সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাতেও লিখিতাম।

এই সময় কেশব বাবু পুরাতন Society of Theistic Friendsকে পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহাতে আমাকে বক্তৃতা করিতে বলেন। তদনুসারে আমি ইংরাজীতে এক বক্তৃতা করি। কেশব বাবু সভাপতি ছিলেন। সে বক্তৃতার দিনের অন্য কথা অধিক মনে নাই। এইমাত্র মনে আছে, আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান মিশনারী সুপ্রসিদ্ধ ড্যাল সাহেব সেদিনকার সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপনাকে Brahmo follower of Christ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেশববাবু তাঁহাকে উপহাস করিলেন।

এই Indian Reform Associationএর পক্ষ হইতে কেশব বাবু আর-একটী কাজ করিয়াছিলেন। তিনি একটু মুদ্রিত পত্র দ্বারা দেশের প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের নিকট হইতে এদেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপযুক্ত কাল কি তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে অধিকাংশ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ডাক্তার ১৬ বৎসরের ঊর্দ্ধে সেই কালকে নির্দ্দেশ করেন। কেবল ডাক্তার চার্লস চতুর্দ্দশ বর্ষকে সর্ব্বনিম্ন বয়স বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তদনুসারে ১৮৭২ সালের তিন আইনে চতুর্দ্দশ বর্ষকে বালিকার সর্ব্বনিম্ন বয়স বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। তিন আইনের এই আন্দোলনে আমরা সকলেই তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলাম।

এই সময়েই বা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে আদিসমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার তদানীন্তন সম্পাদক ও বিলাতের টাইম্‌স্ পত্রিকার পত্রপ্রেরক জেম্‌স্ রুট্‌লেজ (Routledge) সাহেব তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ টাইম্‌স্ পত্রিকাতে প্রেরণ করেন। তাহার ফলস্বরূপ এদেশে ও সেদেশে সেই বক্তৃতা সম্বন্ধে চর্চ্চা উপস্থিত হয়। সেই বক্তৃতাতে রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মকে উন্নত হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করেন। উন্নতিশীল দল এ মতের বিরোধী ছিলেন। কেশববাবু আমাকে ও পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়কে এ বিষয়ে দুইটা প্রবন্ধ লিখিয়া পড়িতে আদেশ করেন। তদনুসারে আমি ইংরাজীতে ও গৌরব বাবু বাঙ্গালাতে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি। কেশববাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।*

এই সময়কার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য ভারত-আশ্রম স্থাপন। কেশব বাবু ইংলণ্ডে ইংরাজের গৃহকর্ম্ম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। সর্ব্বদা বলিতেন middle class English homeএর ন্যায় institution

পৃথিবীতে নাই। তাঁহার মনে হইল কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারকে একত্র রাখিয়া কিছু দিন সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে কাজ, সময়ে উপাসনা, এইরূপ নিয়মাধীন রাখিয়া শৃঙ্খলামত কাজ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা সেই ভাব লইয়া গিয়া চারিদিকের ব্রাহ্ম-পরিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে। এই ভাব লইয়া তিনি ভারতাশ্রম স্থাপন করিলেন। তাঁহার অনুগত প্রচারকগণ সর্ব্বাগ্রে গেলেন। তৎপরে আমরাও অনেকগুলি পরিবার বাহির হইতে গেলাম। আমরা কেশব বাবুর মনের ভাবটা কাজে করিয়া দেখিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলাম।

ভারতাশ্রম স্থাপিত হইলে কেশব বাবু কলুটোলার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়া থাকিতে লাগিলেন। কলিকাতা ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে (বর্ত্তমান সিটী স্কুলের ভূমিস্থিত ভবনে) প্রথমে কিছুদিন থাকিয়া, সহরের বাহিরে কোন কোনও বাগানে গিয়া থাকা হয়। প্রথম বেলঘরিয়ায় এক বাগানে, তৎপরে কাঁকুড়গাছির এক বাগানে কিছুদিন যাওয়া হয়। এই-সকল স্থানে গিয়া আমরা কেশব-বাবুর নিমল সহবাসে থাকিবার অবসর পাইলাম। স্বীয় স্বীয় ব্যয়ের অংশ দিয়া সকলে একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় থাকিতাম। একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে বসা, একসঙ্গে বেড়ান—সুখেই কাল কাটিত। সহরে যাঁহাদের কাজ থাকিত, তাঁহারা দিনের বেলায় সহরে গিয়া কাজ করিয়া আসিতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যাতে একসঙ্গে উপাসনা ও একসঙ্গে ধর্ম্মালাপ চলিত। আমরা সকল বিষয়েই কেশববাবুর পরামর্শ ও সদুপদেশ পাইতাম। সে সময়ে তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর যে সাধুতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়াছিলাম তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। প্রতিদিন দুপুরবেলা আশ্রমবাসিনী মহিলাদিগকে লইয়া স্কুল করা হইত। আমি ঐ স্কুলে পড়াইতাম।

একদিন কেশব বাবু, তাঁহার পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে বলিলেন, "ওহে তুমি ওঁকে ইংরাজী শেখাও ত।" তদনন্তর তিনি আমার ছাত্রী হইলেন। কেশব বাবু তাঁহার প্রকৃতির সরলতা জানিতেন। তিনি বিলাত হইতে কতকগুলি children's magazine ও reading books আনিয়াছিলেন। তাহার একখানি তাঁহাকে পড়াইবার জন্য দিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম "এ যে ছোট ছেলেদের বই।" তিনি বলিলেন "আরে, উনি প্রথম ইংরেজী পড়্‌বেন ত? হলই বা ছোট ছেলেদের বই, তুমি পড়াতে আরম্ভ কর না, দেখ্‌বে উনি মনে ছোট ছেলেই আছেন।" কাজেও তাহার প্রমাণ পাইলাম। তাঁহার পাঠ্য-পুস্তকে একটা ছোট মেয়ের ছবি ছিল, তাহার মাথায় কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল, মেয়েটি দেখিতে সুন্দর কিন্তু বড় দুষ্ট। ওই ছবির সঙ্গে তাহার দুষ্টামির অনেক গল্প আছে। আচার্য্য-পত্নী তাঁহার জীবনে এত দুষ্টামির কথা বোধ হয় শোনেন নাই। তিনি পড়িয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া গেলেন। ছবিটা পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষের শূল হইয়া দাঁড়াইল। একদিন পড়িবার জন্য যেই বই খুলিয়াছেন, অমনি সেই ছবিটা বাহির হইল। তিনি দেখিয়া রাগিয়া গেলেন ও নিজের মনে মনে বলিতে লাগিলেন "মা গো মা! কি দুষ্টু মেয়ে! দেখ্‌লেই রাগ হয়!" আমি শুনিয়া হাসিয়া বলিলাম "রাগেন কার উপরে? ও যে ছবি! আর ও-সব যে কল্পিত গল্প!" তিনি সেদিকে কান দিলেন না। তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার উল্লেখ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার চুলগুলো কি কেটে দেবো? তারও চুলগুলো ঠিক এমনি কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া, দেখ্‌লে এই ছবিটা মনে পড়ে।" আমি শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম!

আর-একদিনের আর-একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন আমি কেশব বাবুর সহিত কোন বিশেষ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য তাঁহার

ঘরে গেলাম। তখন তাঁহার বিশ্রাম করিবার সময়। কিন্তু দেখিলাম, তিনি ঘরে নাই। তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আমাকে কোন কারণে রাগ্‌তে দেখে, তিনি প্রথমে বল্‌লেন, 'তাই ত তুমিও রেগে উঠলে ?' এই বলে এই ঘরেই কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন, যেন পাষাণের মূর্ত্তি, তারপর বাহির হয়ে গেলেন। খুঁজে দেখুন, বোধহয় বাগানের কোন গাছতলায় চোখ বুজে বসে আছেন।" শুনিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, "হাসেন কি ? ওই চোখ বুজে বুজেই আমায় সেরে আন্‌ছেন। আমি কিছু অন্যায় কর্‌লেই রাগ নাই, উষ্মা নাই, চোখ বুজে একেবারে পাষাণ-প্রতিমা হয়ে যান। আমি লজ্জায় মরে যাই। ভবিষ্যতে যাতে আর ওরূপ না করি, তার জন্য ঈশ্বর-চরণে বার বার প্রার্থনা কর্‌তে থাকি।" আমি শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যাঁহার বাহিরে এত তেজ, বক্তৃতাতে যিনি অগ্নি উদ্গিরণ করেন, যাঁহার মনুষ্যত্বের প্রভাবে ধরা কম্পিত হয়, গৃহের মধ্যে তাঁহার এই আত্মসংযম! বাস্তবিক কেশবচন্দ্রের আত্মসংযম শক্তি অতি অদ্ভুত ছিল। বাদ বিসম্বাদ, তর্কযুদ্ধে আমরা অনেকেই অনেক সময় উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইতাম, কিন্তু তিনি ধীর ও স্থির থাকিয়া আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিতেন। মনে হয় ত গভীর বিরক্তির আবির্ভাব, কিন্তু বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই। সুযুক্তিপরম্পরা দ্বারা শ্রোতাকে কোণঠাসা করিয়া ধরিতেন। দীর্ঘকাল একত্র বাস করিয়া কেবল দুই এক স্থলে মাত্র তাঁহাকে উত্তেজিত দেখিয়াছি। নতুবা তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের নিকট সংযমের আদর্শ স্বরূপ থাকিয়াছেন। এ কথা যখনই স্মরণ করি হৃদয় উন্নত হয়, এবং নিজেদের দৈনিক ব্যবহারের জন্য লজ্জা হয়। তাঁহার সংযমের এই দৃষ্টান্তটী চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। উপসংহারে বক্তব্য যে কেশব বাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানে

তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গিয়া বাস্তবিক দেখিলাম যে, তিনি এক বৃক্ষের তলে নয়ন মুদ্রিত করিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন।

আচার্য্য-পত্নীর সরলতা ও আমার প্রতি অকপট ভালবাসার আর-একটী নিদর্শন মনে হইতেছে, তাহা বলিয়া ফেলি। আমি একদিন স্কুলে পড়াইবার সময় দেখিলাম তিনি পড়া করিয়া আসেন নাই। তাই তাঁহাকে বলিলাম, "দুপর বেলা খাওয়ার পর ঘরে গিয়ে শয়ন করলে আপনি ত আপনার পতির নিকট কঠিন বিষয়গুলো জেনে নিতে পারেন, পড়া তয়ের করে আস্‌তে পারেন।" তদনুসারে তিনি তৎপরদিন দুপর বেলা পড়া জানিতে বসেন। কেশব বাবু এটা ওটা বলিয়া দিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার পত্নী বলিয়া উঠিলেন—"যাও যাও, তুমি শিবনাথ বাবুর মত পড়াতে পার না।" এই কথায় কেশব বাবু খুব হাসিতে লাগিলেন। তৎপর দিন তাঁহারা যখন পতি-পত্নীতে একত্র আছেন, এমন সময়ে কোনও কাজের জন্য আমি সেখানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া কেশব বাবু হাসিয়া বলিলেন, "শিবনাথ! তুমি আমার সমক্ষে পড়াও ত, আমি দেখি। তুমি এমন পড়া কি পড়াও যে আমার পড়া ওঁর মনে লাগে না। আমাকে বলেছেন 'তুমি শিবনাথ বাবুর মত পড়াতে পার না।'" আমি হাসিয়া বলিলাম, "বুঝলেন না, আমাকে ভারি ভালবাসেন কি না, তাই আমি যা করি ভাল লাগে। আপনাকে জেনেছেন সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেষ্টা, আমাকে জেনেছেন সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক। যা হোক, এ কথা শুনে আমার শ্রমটা সার্থক বোধ হচ্ছে।"

এই ভারতাশ্রমে বাসকালে আচার্য্য-পত্নীর পতিভক্তি ও শিশুসুলভ সরলতার আর-এক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, তাহা এখানে উল্লেখ করা ভাল। আশ্রম স্থাপিত হইয়া প্রথমে কিছুদিন ১৩ নম্বর মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে ছিল। তখন বয়স্থা মহিলা-বিদ্যালয়-স্থাপিত হয় নাই। সে

সময়ে কেশব বাবু খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্ম-প্রচারিকা কুমারী পিগটকে (Piggot) অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তিনি সপ্তাহের মধ্যে কয়েক দিন বৈকালে আসিয়া আশ্রমবাসিনী মহিলাদের সঙ্গে বসিবেন; তাঁহাদের লেখা পড়া দেখিবেন ও তাঁহাদের সঙ্গে নানা হিতকর বিষয়ে আলাপ করিবেন। কুমারী পিগট কেশব বাবুকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই অনুরোধ করিবামাত্র তিনি আসিতে লাগিলেন। একদিন মহিলাদের সহিত অপরাপর কথার মধ্যে কুমারী পিগট বলিলেন, "আমরা বিশ্বাস করি যাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ না করে তাহাদের অনন্ত নরকবাস হইবে।" আচার্য্যপত্নী সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ওমা সে কি গো! যে সরলভাবে বিশ্বাস কর্‌তে পারছে না, তার সাজা অনন্ত নরকবাস!" কুমারী পিগট বলিলেন, "হাঁ আমাদের ধর্ম্মে তাই বলে। এমন কি তোমার পতিও যদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত না হন, তাঁর ভাগ্যেও নরকবাস।" এই কথা শুনিয়া আচার্য্যপত্নী গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; তাঁর চক্ষে দর দর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল; কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি উঠিয়া নিজ গৃহে গেলেন। তৎপরে কুমারী পিগটের নিকট আসা ত্যাগ করিলেন। আমরা বুঝাইয়া আনিতে পারিলাম না; কেশব বাবুও নিজে বুঝাইয়া রাজি করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কুমারী পিগটের মুখ আর দেখ্‌ব না।" কত বলা গেল, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে যাহা আছে তাহাই তিনি বলিয়াছেন; কেশব বাবুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য কিছু বলেন নাই। তখন শুনিলেন না। কিছুদিন পরে বোধ হয় কুমারী পিগটের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন।

আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে আপনাকে অর্পণ করিব বলিয়াই ভারতাশ্রমে বাস করিতে গিয়াছিলাম। আমার অগ্রে অভিপ্রায় ছিল যে,

আমি কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী করিব, সেইজন্য উকীল বন্ধুদের পরামর্শে তিন বৎসর ল লেক্‌চার শুনিয়া শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয় আমার বি-এল দিবার ইচ্ছা হইবার আর-একটী কারণ ছিল। তদানীন্তন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আমি Judicial Serviceএ তোমাদের কলেজের ছেলে চাই, কারণ তাহারা Hindu Law বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়।" তদনন্তর সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আসিয়া আমাদিগকে বি-এল পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন। এবং আমার ভক্তিভাজন মাতুল মহাশয়ও সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে আমি 'ল লেক্‌চার' শুনিতে আরম্ভ করি। কিন্তু বি-এ পাশ করিয়াই অন্যবিধ আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে আসিল। আমি কেশব বাবুর পদানুসরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে আমার জীবন দিব, এই বাসনা হৃদয়ে উদয় হইল। গোপনে পত্র দ্বারা কেশব বাবুকে এরূপ অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি আমাকে গোপনে বলিলেন, "তুমি আস্তে আস্তে ক্রমে আমাদের সঙ্গে যোট, তার পর দেখা যাবে কি হয়।" এই বলিয়া ১৮৭২ সালের প্রারম্ভে এম-এ পাশ করিয়া বাহির হইবামাত্র, তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত মহিলা-বিদ্যালয়ে আমাকে শিক্ষকতা-কার্য্য দিয়া আশ্রমে সপরিবারে থাকিতে আদেশ করিলেন। আমার নামে বেতন রূপে যাহা দেওয়া হইত, তাহা প্রচারকগণের চির পরিচারক শ্রদ্ধাস্পদ কান্তিচন্দ্র মিত্রের হস্তে জমা হইত, তিনি আমার স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ দেখিতেন। তাহার সহিত আমার কোনও সংস্রব থাকিত না। বলা বাহুল্য তখন প্রচারকগণ সকলে ও তৎসঙ্গে আমি সপরিবারে ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিতাম।

এই সময় আবার আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

কৃষ্ণনগর হইতে কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রচারকদলে যোগ দিবেন বলিয়া আসিলেন। তাঁহার আসিবার কথা যেদিন স্থির হয়, সেদিন কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত কেশব বাবুর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিনের কথা কখনই ভুলিব না। কান্তি বাবু আসিয়া বলিলেন, "নগেন্দ্র আসিতে চাহিতেছেন, কি করা যাবে?"

কেশব বাবু—সে ত ভালই, তিনি আসুন, করা যাবে কি কেন ভাবছ? আবার করা যাবে কি?

কান্তি বাবু—কিরূপে চল্‌বে?

কেশব বাবু—তা ভাব্‌বার তোমার অধিকার কি? যিনি আন্‌ছেন, তিনিই তার উপায় কর্‌বেন।

তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব অনেক স্থলে দেখিয়াছি। নগেন্দ্রবাবু কৃষ্ণনগরে তাঁহার জননীকে রাখিয়া একটী পুত্র ও পত্নী সহ আশ্রমে আসিলেন।

কিন্তু তাঁহার আসিবার অচিরকালের মধ্যে কেশববাবুর অনুগত প্রচারক দলের সহিত আমার ও নগেন্দ্রবাবুর অপ্রীতি জন্মিতে লাগিল।

আমার প্রতি অপ্রীতি জন্মিবার দুই কারণ। প্রথম কারণ, এই সময়ে স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায় প্রভৃতি তাহার মুখপাত্র স্বরূপ হইলেন। অন্নদাচরণ খাস্তগির, দুর্গামোহন দাস, ইঁহারা উভয়ে হঠাৎ এই মন্দিরে পরদার বাহিরে সস্ত্রীক বসিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা লইয়া উপাসক-মণ্ডলীর সভ্যগণের মধ্যে আলোচনা ও আন্দোলন উপস্থিত হইল। তখন ইঁহারা মন্দির ত্যাগ করিয়া প্রথমে বহুবাজার ষ্ট্রীটে খাস্তগির মহাশয়ের ভবনে তৎপরে অপর স্থানে উপাসনা আরম্ভ করিলেন। তদ্ভিন্ন অবলা-বান্ধব পত্রিকাতে মহা তর্ক বিতর্ক চলিল। কেশব বাবু

বিপদে পড়িলেন। কোন দলের মুখ রক্ষা করেন। আমিও বিপদে পড়িলাম। কারণ স্ত্রী-স্বাধীনতা-পক্ষীয়েরা তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে আমাকে উপাসনা করিবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহিত আমার হৃদয়ের যোগ এবং তাঁহারা সকলেই আমার আত্মীয় বন্ধু, বিশেষতঃ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সহিত এক বাড়ীতে, এক পরিবারে কতদিন বাস করিয়াছি, কি করিয়া অনুরোধ অগ্রাহ্য করি। আমি তাঁহাদের সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে কেশব বাবু বিরক্ত হইলেন কি না বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু প্রচারক মহাশয়রা আমাকে ঠাট্টা তামাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিরক্তির আরও একটি কারণ ছিল। আমি কেশব বাবুর কোনও কোনও মত লইয়া সর্ব্বদা তর্ক উপস্থিত করিতাম। এই তর্ক অনেক সময়েই কেশব বাবুর সাক্ষাতে হইত। তন্মধ্যে আদেশের মত লইয়া বড় তর্ক হইত। কেশব বাবু তাঁহার সমুদয় কার্য্য যেরূপ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া উপস্থিত করিতেন এবং সকলকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে বলিয়া উপদেশ দিতেন, তাহাতে আমার মনে ভয় হইত যে, তাঁহার সঙ্গের লোকের চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট হইবে। হয় তাঁহার আদেশ ফর্জ্জ করিতে হইবে, নতুবা নিজের হাত পা বাঁধিয়া তাঁহার হাতে আপনাকে দিতে হইবে। আমি কেশব-বাবুকে বলিতাম, আপনি আদেশ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন সেই ভাবে কাজ করিয়া যান, আমরা আদেশ বলিয়া লইতেছি কি না দেখিবেন না। তিনি আমার কথার প্রতি কর্ণপাত করিতেন না। ইহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে মুখে ও চিঠিপত্রে তর্ক হইত। আমি মানব-চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইতাম। তাঁহাকে বলিতাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ত তাঁহার সকল কাজ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছেন, কৈ তিনি

ত তাহা অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই; অন্যে সে ভাবে না লইলে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই ?

কেশব বাবু যথন আশ্রম স্থাপন করিলেন, তথন ইহাকে ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য বলিয়া স্থাপন করিলেন। কেবল তাহা নহে; ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগকে আহ্বান করিলেন এবং সেভাবে যাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ প্রথমে ইহাকে এ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অধিক কি যতদূর স্মরণ হয় শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও প্রথম ইহাকে এ ভাবে গ্রহণ করিলেন না। আমরা সপরিবারে আশ্রমে গেলাম, কিন্তু তিনি Indian Mirrorএ আবদ্ধ থাকাতে যাইতে পারিলেন না। তিনি ভয় পাইতে লাগিলেন যে আশ্রমকে এরূপে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া ঘোষণা করিলে সমাজে বিরোধ উৎপন্ন হইবে। আমার বেশ স্মরণ আছে, যে, আমরা বেলঘরিয়া বা কাঁকুড়গাছির উদ্যান-ভবনস্থ আশ্রম হইতে আসিয়া কলিকাতার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, "কি হে তোমাদের স্বর্গরাজ্য কতদূর এল ?" যদিও পরে তিনি আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু একারণে তিনি সে সময়ে কিছুদিনের জন্য প্রচারকগণের নিন্দা ও তিরস্কারের পাত্র হইয়াছিলেন।

আমি কেশব বাবুর আশ্রমোৎসাহের মধ্যে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছিলাম ! সে সময়ে আশ্রমের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখি, তাহা বোধ হয় ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নগেন্দ্র বাবুর প্রতি প্রচারকগণের অপ্রীতি জন্মিবার আর একপ্রকার কারণ ছিল। নগেন্দ্র বাবুর তথন একপ্রকার শিরঃপীড়া ছিল, যাহাতে তিনি সময় সময় লোকের সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন না। একাকী

একাকী থাকিতে ভালবাসিতেন; অথবা নিজের অন্তরঙ্গ কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে থাকিতেন। আশ্রমের উপাসনায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন বটে, কিন্তু অপরাপর অনেক সময়ে প্রচারকগণের সহিত বসিতেন না। তাঁহারা যখন দশজনে কেশব বাবুর নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, তখন হয়ত তিনি তাঁহার প্রিয়বন্ধু খ্যাতনামা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে শয়ন করিয়া তাঁহার মুখে জ্ঞানের কথা শুনিতেছেন। নগেন্দ্র বাবুর আর-একটা স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা এই ছিল যে, যে কেহ বিরুদ্ধভাবে তাঁহার সমালোচনা করে তিনি তাহার দিক দিয়া যাইতেন না। আমি দেখিতে লাগিলাম, যে, নগেন্দ্র বাবুর সহিত প্রচারক মহাশয়দিগের বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। আমি অনেক সময় তাঁহাকে বলিতাম, যাঁহাদের সঙ্গে কাজ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ হইতে এরূপ দূরে থাকা উচিত নয়। কিন্তু বলিলে কি হয়, মানুষের প্রকৃতিতে যাহা আছে, তাহা কি হঠাৎ চলিয়া যায়? তিনি যে একাকী বেড়াইতেন, অনেক সময় গভীর আত্মচিন্তাতে যাপন করিতেন। একদিনের কথা মনে আছে। একদিন আমরা সকলে কাঁকুড়গাছীর বাগানে ভারতাশ্রমে সায়ংকালীন উপাসনার পর কেশব বাবুর সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তাতে আছি, এমন সময় কেশব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নগেন্দ্র কৈ?" অমনি নগেন্দ্রবাবুর অনুসন্ধান হইল; জানা গেল যে তিনি বৈকাল হইতে নিরুদ্দেশ আছেন। রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিয়া গেল, তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। আমি তাঁহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলাম, "আপনার খোঁজ হইয়াছিল, আপনি কোথায় ছিলেন?" তিনি বলিলেন, "আজ মনটা বড় খারাপ আছে, তাই তিন চারি ঘণ্টা মাণিকতলার খালের ধারে বেড়াইতেছিলাম ও একটা গান বাঁধিয়া গাইতেছিলাম। এই বলিয়া গানটা গাইয়া আমাকে শুনাইলেন। সেটা এই,

"আমি কি বলে প্রার্থনা বল করি আর ?
আমার সকল কথা ফুরাইল, ফিরিল না মন আমার।
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে; তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ বল্‌ব কি আর, কি আর আছে বলিবার!
ওহে, প্রাণ যদি চাহে তোমারে, তুমি থাকিতে কি পার দূরে,
আপনি এস পাপীর দ্বারে, তাই পতিত-পাবন নাম তোমার।"

আমি শুনিয়া ভাবিলাম, নগেন্দ্র বাবু যে সন্ধ্যার সময় আমাদের সঙ্গে না বসিয়া একলা ছিলেন, সে ভালই হইয়াছে। কিন্তু প্রচারক বন্ধুগণ সকল সময়ে সেরূপ ভাবিতে পারিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, নগেন্দ্র যখন আমাদের সহিত কাজ করিতে আসিয়াছেন, তখন আমরা যেরূপে বসি দাঁড়াই তাঁহাকেও সেইরূপ করিতে হইবে। তাঁহারা দিন দিন নগেন্দ্র বাবুর উপর চটিতে লাগিলেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের সহিত আমার বিবাদ হইতে লাগিল। আমি নগেন্দ্র বাবুর পক্ষ হইয়া তাঁহাদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলাম। তাঁহারা আমাকে আলস্যের প্রশ্রয়দাতা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

আর একটা বিষয়ে একটু মতভেদ ঘটিল। কেশব বাবু ইংলণ্ড হইতে আসিয়া, অপরাপর কাজের আয়োজনের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগকে ডাকিয়া একটা ঘনিষ্ঠ মণ্ডলী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উপাসকদিগকে ডাকিলেই তাঁহারা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেক বিষয়ে মতভেদ ও তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। যুবকদলের অনেকে উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপনের জন্য উৎসুক হইলেন। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু কেশব বাবু বোধ হয় তাহা পছন্দ করিলেন না। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই দেখিলাম, উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণকে মধ্যে মধ্যে ডাকা রহিত

হইল। বৎসরান্তে একবার একটা সম্মিলিত সভার মত হইত, এই মাত্র অবশিষ্ট রহিল। অনেক যুবক ব্রাহ্ম, উপাসকমণ্ডলী গঠনের জন্য উৎসাহিত হইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে আমি একজন। নিয়মতন্ত্র প্রণালী মতে কাজ হয় আমরা কয়েক জনে চাহিতেছিলাম। সে আকাঙ্ক্ষা একবার জাগিয়া আবার ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় রহিল। আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালীর পক্ষ হইয়া দূরে দাঁড়াইলাম।

এই-সকল মতভেদের মধ্যে ১৮৭৩ সালের প্রথমে আমার পূজ্যপাদ মাতুল, সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, পীড়িত হইয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তিনি আর কাজ করিতে পারিতেছিলেন না। ত্বরায় পেন্‌সন লইয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকতা হইতে বিদায় লইয়া, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সোমপ্রকাশ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গ্রামস্থ সংস্কৃত-ইংরাজী স্কুল, তাঁহার বিষয়, তাঁহার পরিবার-পরিজনের দেখিবার ভার কে নেয়? আমার মাতুল পুত্রদিগের মধ্যে কেহই কাজের লোক ছিল না। বড়মামা আমাকে নিজের চক্ষের উপরে মানুষ করিয়াছিলেন। আমি বাল্যাবধি তাঁহার দৃষ্টান্ত না দেখিলে, ধর্ম্ম ও নীতির ভাব যাহা হৃদয়ে পাইয়াছি, তাহা পাইতাম কি না সন্দেহ। মামা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, এখন তুমি আসিয়া আমার স্কন্ধের সব ভার না লইলে আমি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইতে পারি না। আমি বিপদে পড়িয়া গেলাম। কেশব বাবুর অনুরোধে একটা কাজের ভার লইয়াছি। আবার মামার অনুরোধ অপর দিকে। প্রথম দিনে কোনও উত্তর না দিয়া ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতায় আসিলাম। আসিয়া মনে অনেক চিন্তা করিলাম, নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতির সহিত অনেক পরামর্শ করিলাম। সকলেই মামার

সাহায্যার্থ যাইতে বলিলেন। অবশেষে অনেক চিন্তার পর কেশব বাবুকে গিয়া বলিলাম, নূতন বৎসর আরম্ভ হইতেছে, এখন মহিলা-স্কুলে আমার স্থলে পড়াইবার ভার অপর কাহারও উপর দেওয়া যাইতে পারে; সেইরূপ বন্দোবস্ত করুন। আমাকে আমার মাতুলের সাহায্যের জন্য যাইতে হইবে। তিনি কিছু বলিলেন না, মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন কি না তখন বুঝিতে পারিলাম না; পরে বুঝিয়াছি যে, আমার চলিয়া যাওয়া তিনি পছন্দ করেন নাই। আমি প্রচার-কার্য্যে জীবন দিবার জন্য আসিয়া বিষয়কর্ম্মে গেলাম, ইহা তাঁহার ভাল লাগে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে আমার পারিবারিক জীবনে এক সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিতে হইয়াছে। ইহারই দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতা মাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতি সমুদয় অকালে গত হন। তিনি একাকিনী তাঁহার পিতৃব্যগণের গলগ্রহ হন। তদনন্তর তাঁহার পিতৃব্য মহাশয় আসিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য আমাকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার পুনরায় বিবাহ দিবার আশায় তাঁহাকে অগ্রে কয়েকবার আনিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া সে চেষ্টা কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার পিতৃব্যের অনুরোধে পুরাতন কর্ত্তব্য-জ্ঞানটা আমার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু আমার ব্রাহ্মবন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে এরূপ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ব্রাহ্ম দুই স্ত্রী লইয়া একত্র বাস করিবে, ইহা বড়ই খারাপ কথা। বহুবিবাহের প্রতিবাদ আমাদের এক প্রধান কাজ। দুই স্ত্রী লইয়া একত্র থাকিলে তুমি বহুবিবাহের প্রতিবাদ করিবে কিরূপে?" আমি বলিলাম, "আমি ত দুই স্ত্রী নিয়ে ঘরকন্না কর্‌ব বলে আন্‌তে যাচ্ছি না। সে বেচারির অপরাধ কি, যে, পিতা মাতা গত হওয়ার পরেও তাকে আশ্রয় দিব না। এ বহুবিবাহের অপরাধ ত তার নয়, সে অপরাধ আমার। আমি তাকে এনে লেখাপড়া শিখাব, সে রাজি হলে তার আবার বিয়ে দেব বলে আন্‌তে যাচ্ছি।" এই মতভেদ লইয়া আমি কেশব বাবুর শরণাগত হইলাম। তিনি বিরাজ-মোহিনীকে আনিতে পরামর্শ দিয়া বলিলেন, বাল্যবিবাহের দেশে বহু

বিবাহে মেয়েদের অপরাধ কি? একজন যদি দশটী মেয়ে বিবাহ করে ব্রাহ্ম হয়; পরে সে দশজনকে আশ্রয় দিতে বাধ্য। এমন কি আশ্রয় না দেওয়াতে উক্ত স্ত্রীলোকদের কেহ যদি বিপথে যায় তার জন্য সে দায়ী।"

আমি কর্ত্তব্য-বোধে ১৮৭২ সালের মধ্যভাগে বিরাজমোহিনীকে আনিতে গেলাম। তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিব না, কিন্তু পুনঃপরিণীতা না হওয়া পর্য্যন্ত রক্ষা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিব, যতদূর মনে হয় এই ভাবেই আনিতে গিয়াছিলাম। আশ্রমে রাখিব ও মহিলা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিব, পরে তিনি যদি পুনঃপরিণীতা হইতে না চান, লেখা পড়া শিখিলে কোন ভাল কাজে বসাইয়া দিব, তিনি সুখী হইবেন, ও আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন, ইহা ভাবিয়া মনে মনে আনন্দ হইতে লাগিল। প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া তাঁহাকে আনিতে গেলাম। আনিয়া আশ্রমে প্রসন্নময়ীর সহিত রাখিলাম। বিরাজমোহিনীর বয়স তখন ১৬।১৭ বৎসর হইবে। বিরাজমোহিনীকে বলিলাম, "আমি যে এতদিন তোমাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই, তাহার কারণ এই আমার মনে আছে তুমি বড় হইয়া যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে চাও করিতে দিব, আর যদি লেখাপড়া শিখিয়া কোন ভাল কাজে আপনাকে দিতে চাও, দিতে পারিবে। আমি তোমাকে স্কুলে দিতেছি। তুমি এখন লেখাপড়া কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। কিন্তু দিলে কি হয়, তিনি প্রথম প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "মাগো! মেয়ে মানুষের আবার কবার বিয়ে হয়!" তাঁহার ভাব দেখিয়া, পুনর্ব্বিবাহের প্রতি দারুণ ঘৃণা দেখিয়া আমার এতদিনের পোষিত মাথার ভূত এক কথাতে নামিয়া গেল। আমি বুঝিলাম, দ্বিতীয় প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু আর-এক দিক দিয়া আর-এক পরীক্ষা উপস্থিত হইল। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী যখন এক ভবনে

একত্রে বাস করিতে লাগিলেন, অথচ আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে বিরত রহিলাম, তখন প্রসন্নময়ী হইতেও সেই সময়ের জন্য আমার স্বতন্ত্র থাকা উচিত বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তখন তাঁহার সঙ্গে বহুদিনের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ রহিয়াছে, তৎপূর্ব্বে হেমলতা, তরঙ্গিণী ও প্রিয়নাথ তিন জন জন্মিয়াছে। তাঁহা হইতে দূরে থাকা আমার পক্ষে ঘোর সংগ্রামের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। প্রসন্নময়ীর পক্ষেও তাহা অতীব ক্লেশকর হইল। আশ্রমে স্কুল-ঘর ও কেশব বাবুর আপীস-ঘর ভিন্ন অধিক বাহিরের ঘর ছিল না। রাত্রে প্রসন্নময়ীর ঘরে না শুইলে শুই কোথায়? প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া বিদায় লইয়া এখানে ওখানে শুইতে আরম্ভ করিলাম। অবশেষে ঘটনাক্রমে এক উপায় আবিষ্কার করিলাম। হিন্দু কালেজের বারাণ্ডাতে দপ্তরীদের একটা টেবিল পড়িয়া থাকিত। রাত্রে তাহাতে জিনিসপত্র কিছু থাকিত না। রাত্রে আহারের পর একখানা পুস্তক লইয়া সেখানে গিয়া সেই পুস্তক মাথায় দিয়া টেবিলে শুইয়া বেশ নিদ্রা যাইতাম। দিঘীর মাঠের হাওয়ায় বেশ নিদ্রা হইত। প্রাতে আসিয়া স্নান করিয়া কেশব বাবুর উপাসনাতে যোগ দিতাম; বন্ধুদের সহিত আহার করিতাম, আহারান্তে মহিলা-স্কুলে পড়াইতাম, অপরাহ্নে বন্ধুদের সহিত ধর্ম্মালাপে কাটাইতাম, সন্ধ্যার পর আহার করিয়া আবার হিন্দু কালেজের বারাণ্ডায় টেবিলের উপর গিয়া শুইতাম। সেখানে আমার সময় বড় ভাল যাইত। গভীর রাত্রের নির্জ্জনে অনেক দিন ঈশ্বর-চিন্তাতে যাপন করিতাম। রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই আমাকে উঠিতে হইত। উষাকালের সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আমার পক্ষে বড়ই স্পৃহণীয় ছিল।

আমি জানিতাম, আমি যে গোলদিঘীর ধারে টেবিলের উপরে রাত্রি যাপন করি, তাহা কেহ জানেন না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে

প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী উভয়েই সে কথা জানিতে পারিলেন। শুইবার স্থানাভাবে কালেজের বারাণ্ডায় পড়িয়া থাকি শুনিয়া প্রসন্নময়ী কাঁদিতে লাগিলেন। বিরাজমোহিনী মনে করিলেন, তিনিই এই-সমুদয় কষ্টের কারণ, ইহা ভাবিয়া ঘোর বিষাদে পতিত হইলেন; তাঁহারও চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল।

এই অবস্থাতে আমি মাতুলের সাহায্যের জন্য হরিনাভিতে গেলাম। গিয়া মাতুলের সোমপ্রকাশের সম্পাদক, স্কুলের সম্পাদক ও হেডমাষ্টার, তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও তাঁহার পরিবার-পরিজনের রক্ষক ও অভিভাবক হইয়া বসিলাম। বড় মামা আমাকে বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীতে গেলেন।

দুই একদিনের মধ্যেই একদিন কেশব বাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, আমার দুই পত্নীকে যে ভাবে রাখিয়াছি, তাহা আর চলিবে না। তিনি ভয় করেন, যে, বিরাজমোহিনী আত্মহত্যা করিবেন। যদিও আমার মনে সে প্রকার ভয় ছিল না। কারণ, আমি কলিকাতায় আসিলেই তাঁহাকে বুঝাইতাম। যাহা হউক, অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, যে, প্রসন্নময়ী আমার সঙ্গে হরিনাভিতে থাকিবেন, এবং বিরাজমোহিনীকে আশ্রম হইতে অন্য কোথাও রাখা হইবে, আমি শনিবারে সেখানে আসিয়া রবিবার তাঁহার সঙ্গে যাপন করিব।

অতঃপর প্রসন্নময়ী আমার সহিত হরিনাভিতে গেলেন।

নগেন্দ্র বাবু আশ্রম ছাড়িয়া আর-এক স্থানে কতিপয় বন্ধুর সহিত বাসা করিলেন; বিরাজমোহিনী তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। আমি প্রতি শনিবার কলিকাতায় আসিয়া রবিবার তাঁহার সঙ্গে যাপন করিতে লাগিলাম। তখন আমি যে প্রণালীতে কার্য্য করিব বলিয়া স্থির করিলাম তাহা এই। বিরাজমোহিনী আমা হইতে বিযুক্ত হইতে চাহিলেন না,

দেখিয়া এই স্থির করিলাম, যে, যখন তিনি ও প্রসন্নময়ী একত্র থাকিবেন তখন আমি উভয় হইতে বিযুক্ত থাকিব, আর যখন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন গৃহে পরস্পর হইতে পৃথক থাকিবেন, তখন পতিভাবে মিলিব। তদনুসারেই কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রসন্নময়ীর জীবিতকালে বহুবৎসর এই প্রণালীতে কার্য্য চলিয়াছে।

এই ১৮৭৩ সালে ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের দিন, হরিনাভিতে আমার তৃতীয়া কন্যা সুহাসিনীর জন্ম হইল।

হরিনাভিতে আমি মহাকার্য্যের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িলাম। প্রথম মামার স্কুলটির ভার লইয়া দেখি, যে, তৎপূর্ব্বে কয়েক বৎসর গ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বরের আবির্ভাব হওয়াতে, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হইয়া স্কুলের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছে। ইহার ফল এই হইল যে, আমি নামে হেডমাষ্টার রূপে একশত টাকা পাইতে লাগিলাম বটে, কিন্তু তাহা হইতে সেক্রেটারী রূপে মাসে ৪০।৫০ টাকা অপরাপর শিক্ষকের বেতনের সাহায্যের জন্য দিতে লাগিলাম। ওদিকে সোমপ্রকাশের কার্য্যভার প্রধানতঃ আমার উপর পড়িয়া যাওয়াতে সংবাদ পত্রাদি পাঠে ও লেখাতে অনেক সময় দেওয়া আবশ্যক হইল। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে বড়মামার তালুক দেখিবার জন্য লবণাম্বুপূর্ণ সুন্দরবনের মধ্যে গিয়া দুই এক দিন বাস করিতে লাগিলাম। ইহার উপরে আমাকে ম্যালেরিয়াতে ধরিল। ঘন ঘন জ্বর হইয়া লিভারে বেদনা দাঁড়াইল। লিভারে ব্লিষ্টার দিয়া, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করিয়া তদুপরি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-সমুদয় চালাইতে লাগিলাম।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি ভিন্ন আমাকে আরও কয়েক প্রকার সংগ্রামের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। প্রথম আমি সোমপ্রকাশের কার্য্যভার হাতে লইয়াই দেখিতে পাইলাম, যে, রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি গ্রামগুলি

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্ত্তী বেহালা প্রভৃতি গ্রামের সহিত এক মিউনিসিপালিটীতে আবদ্ধ হইয়াছে। তদবধি প্রায় দশবৎসর কাল হরিনাভি, রাজপুর, চাঙ্গড়িপোতা প্রভৃতি গ্রামের প্রজাগণ রীতিমত মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিয়া আসিতেছে, যথাসময়ে ট্যাক্স না দিলে, তাহাদের ঘটি বাটী নিলাম হইতেছে; কিন্তু দশবৎসরের মধ্যে তাহাদের অনেক রাস্তাতে এক মুঠা মাটী পড়ে নাই, এমন কি এই দীর্ঘকালে অনেক নর্দ্দামা হইতে একমুঠা মাটী তোলা হয় নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে বেহালা ও তৎসন্নিকট-বর্ত্তী স্থানের লোক অধিক হওয়াতে অধিকাংশ টাকা সেই দিকেই ব্যয় হইতেছে।

ইহা আমার বড় অন্যায় বোধ হইল। আমি এই অবস্থা ঘুচাইবার জন্য সংকল্প করিয়া সোমপ্রকাশে লেখনী ধারণ করিলাম। সোমপ্রকাশের বাহিরের পাঠকগণ বিরক্ত হইয়া যাইতে লাগিলেন। কাগজে লিখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া আমি স্কুলগৃহে গ্রামবাসীদিগকে ডাকিয়া এ বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করিলাম। বহুজনের স্বাক্ষর করাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিলাম। যদিও এই সকল আন্দোলনের ফল, হরিনাভি ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমি দেখিয়া আসিতে পারি নাই, তথাপি সুখের বিষয় এই যে, ইহারই ফলে রাজপুর প্রভৃতি গ্রাম বেহালা হইতে পৃথক হইয়া এক স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটী রূপে পরিণত হইয়াছে এবং গ্রামের অবস্থা অনেক ফিরিয়াছে।

আমি এই সময়ে আর-এক বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করি। এবং ঈশ্বর-কৃপায় তাহাতেও কৃতকার্য্য হই। সোমপ্রকাশে লিখিতে আরম্ভ করি যে রাজপুর প্রভৃতির ন্যায় ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত গ্রাম-সকলের মধ্যে একটি গবর্ণমেণ্ট চ্যারিটেব্‌ল্ ডিস্‌পেন্‌সারি থাকা উচিত।

আমি হরিনাভিতে থাকিতে-থাকিতেই গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। প্রথম ডাক্তার ও ঔষধের বাক্স আমার নামে প্রেরিত হয়, আমি ডাক্তার মহাশয়কে ও ঐ ডাক্তারখানাকে হরিনাভির এক ভদ্রলোকের বাহির-বাড়ীতে স্থাপন করি। পরে সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

তৃতীয় এক বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিতে হয়। সেটী মামার স্কুলটীকে স্থায়ী ভূমির উপর দণ্ডায়মান করিবার চেষ্টা করা। মামা স্কুলটী স্থাপন করিবার সময় একটী অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে বোধ হয় ছিল যে স্কুলটী উঁচুদরের স্কুল হইবে। সেজন্য তিনি শিক্ষকদিগের বেতনের হার চড়াইয়া বাঁধিয়াছিলেন। যথা, প্রথম পণ্ডিতের বেতন ৪০৲ টাকা। কিন্তু ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে কেহই তৎপূর্ব্বে ঐ উচ্চহারে বেতন পান নাই। হেডপণ্ডিত মহাশয় তৎপূর্ব্বে পাঁচ বৎসর মাসে ২৫ টাকাই পাইয়া আসিতেছিলেন। এইরূপ অপরেরাও স্কুল-প্রতিষ্ঠাকালে নির্দ্দিষ্ট বেতন অপেক্ষা অনেক কম বেতন পাইতেন। বেতনের হার বড় রাখার ফল এই হইয়াছিল যে, যখনি ছাত্রদত্ত বেতন হইতে কিছু টাকা উদ্‌বৃত্ত হইত, তাহা ঐ উচ্চহারের কুক্ষিতে যাইত। বহুদিন হইতে বেঞ্চ, ম্যাপ, গ্লোব, লাইব্রেরী, প্রভৃতির জন্য কিছু ব্যয় করা হইত না। এ-সকলের অতীব অভাব ছিল, অথচ তাহা পূর্ণ হইত না। শিক্ষকদিগের কল্পিত বেতনের হার কমাইয়া আমি স্কুলটীর উন্নতি করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলাম। এবং সর্ব্বাগ্রে আমার বেতন ১০০ হইতে ৮০ করিয়া অপরাপর শিক্ষকগণ তৎপূর্ব্বে পাঁচবৎসর যাহা পাইয়া আসিতেছিলেন, তাহাই তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বেতন বলিয়া স্থির করিবার জন্য ইন্‌স্‌পেক্টারকে লিখিলাম। শিক্ষকদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমার মাতার জাঠতুতো ভাই

কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন; তিনি এই আন্দোলনের প্রধান নেতা হইলেন। শিক্ষকদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্কুল ভাঙ্গিয়া আর-এক স্কুল করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আমি কিছুদিন চুপ করিয়া থাকিলাম, তাঁহাদিগকে গোপনে বুঝাইলাম; আমার উদ্দেশ্য স্কুলটীর উন্নতি করা, ইহা ভাল করিয়া দেখাইয়া দিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা নামিলেন না। অবশেষে একদিন ছুটীর পরে সমুদয় শিক্ষককে একত্র করিয়া ঘড়ি খুলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে বসিলাম। বলিলাম যিনি যিনি স্কুল ছাড়িয়া যাইতে চান, ও স্কুলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাকে দশ মিনিট সময় দিতেছি, ইহার মধ্যে স্থির করিয়া বলিতে হইবে তিনি থাকিবেন কি যাইবেন। যদি থাকেন, স্কুলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিতে হইবে। সকলেই নিরুত্তর রহিলেন, দশ মিনিটের পর সকল আন্দোলন থামিয়া গেল। কিন্তু অনেকে মনে মনে আমার প্রতি বিরক্ত রহিলেন। কি করিব, কর্ত্তব্য বোধে লোকের অপ্রিয় হইতে হইল।

আর-একটী আন্দোলন ইহা অপেক্ষাও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। আমি স্কুলের ভার লইয়া দেখি, স্কুলের কয়েকটী শিক্ষক গ্রামস্থ সখের যাত্রার দলে সং সাজেন। একজন "ভগি দিদী" সাজেন, আর-একজন আর একটা কি সাজেন। ঐ সখের যাত্রার দলটী কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা ধনিসন্তানের কার্য্য ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সুরাসক্ত এবং অপরাপর দুষ্ক্রিয়াতে লিপ্ত ছিলেন। স্কুলের শিক্ষক দুইটী সেই দলে থাকাতে বালকগণ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। স্কুলের বোর্ডে লিখিয়া রাখিত,—"ভগি দিদি! চটো না" ইত্যাদি। ইহা আমার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। আমি এক সার্কুলার জারি করিলাম

যে স্কুলের কোনও শিক্ষক সখের দলের অভিনেতার মধ্যে থাকিলে তাহা তাঁহার পক্ষে শিক্ষকতার অনুপযুক্ত কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহাতে ঐ দুই শিক্ষক যাত্রার দল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সখের দলের ইয়ারেরা আমার প্রতি হাড়ে চটিয়া গেল। এই ক্রোধ তাহারা বহুদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া অবশেষে ১৮৭৪ সালের চৈত্র মাসের শেষে গোষ্ঠযাত্রার সময় সুরার ঝোঁকে সদলে আমার বাড়ী আক্রমণ করিল; ও আমার সঙ্গের একটী যুবকের মাথা ফাটাইয়া দিল। যে কারণে তাহারা দাঙ্গা করিতে আসিল তাহা এই—গোষ্ঠযাত্রার সময় গ্রামের জমিদার-বাবুদের বাড়ীতে মহাসমারোহে ঐ উৎসব সম্পন্ন হইত এবং স্কুলের সম্মুখস্থিত রাস্তাতে তাঁহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত হাট বসিত। আমি স্কুলবাড়ীর ভিতর-দিকেই সপরিবারে থাকিতাম। ঐ দিন বৈকালে স্কুলের পাঠগৃহে বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময়ে সম্মুখের হাট হইতে একটী ছেলে আসিয়া বলিল, যে, এক তাসখেলার দোকানদার তাহার এক সহাধ্যায়ীকে তাসের খেলা দেখাইয়া ঠকাইয়া তার সমুদয় পয়সা লইয়াছে, ছেলেটী কাঁদিতেছে। ইহা শুনিয়া আমি ঐ তাসখেলার দোকানে গেলাম, এবং ছেলেটীকে প্রহার করিবার জন্য তাসওয়ালাকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম। বলিলাম, "এরূপ প্রবঞ্চনার খেলা আইন-বিরুদ্ধ,আমি পুলিস ইন্‌স্পেক্টরকে জানাইব।"এই বলিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে শুনিলাম সেই দোকানদার আমার নামে নালিস করিবার জন্য জমিদার-বাবুদের বাড়ীতে গেল; তাঁহারা তখন বন্ধু বান্ধব লইয়া মজ্‌লিসে বসিয়া আছেন, তাহার মধ্যে এই সংবাদ পাইয়া, বলিতে লাগিলেন—"কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমাদের গ্রামে চাকুরী করতে এসে, আমাদের কাজের উপর হাত! একবার গিয়ে শোন ত কি বলেন।" আর কোথায় যায়, অমনি সেই বাড়ীর কয়েকটী যুবক

লাঠি সোটা লইয়া স্কুলবাড়ীর অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহারা আসিতেছে শুনিয়া আমি আমার নিকটস্থিত একটী ছাত্রকে বাড়ীর ভিতরের দিকে একটা তালা লাগাইতে বলিলাম। মনে করিলাম, ভিতরে তালা লাগান থাকুক, উত্তেজনা থামিয়া গেলে জমিদার-বাবুকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিব। ছেলেটী তালা দিতে গিয়াছে, ওদিকে আক্রমণকারী দল উপস্থিত। তাহারা লাঠি মারিয়া ছেলেটার মাথা ফাটাইয়া দিল; পরে স্কুলবাড়ীতে প্রবেশ করিল। আমি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া নির্ভয়ে গিয়া তাহাদের সমক্ষে দাঁড়াইলাম। তাহারা আমাকে মারিল না। একজন আসিয়া তাহাদের কানে কানে কি বলিল, তাহারা একে একে বাহির হইয়া গেল। আদালতে মোকদ্দমা তুলিলে ইহাদের বিশেষ শাস্তি হইত, কিন্তু তাহা করা হইল না। ভালই হইল, কারণ ইহার পর জমিদার-বাবু আমার প্রতি ও স্কুলের প্রতি বিশেষ সদ্ভাব দেখাইতে লাগিলেন।

এই-সকল কাজের মধ্যে হরিনাভিতে পদার্পণ করিয়াই আমি হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজকে উজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করি। কতকগুলি যুবক এই সময় হইতে আকৃষ্ট হইয়া সমাজে যোগ দেন। আমার অনুরোধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন উভয়েই হরিনাভি সমাজের উৎসবে গিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। এই সময়ে আমার বন্ধু প্রকাশচন্দ্র রায়কে আমি স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার নিযুক্ত করি। তিনি আমার সহিত স্কুলবাটীতেই থাকিতেন। প্রসন্নময়ী তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় দেখিতেন। প্রকাশের ন্যায় ব্যাকুলাত্মা আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমাদের পারিবারিক উপাসনা হইত। তদ্ভিন্ন প্রকাশ ও আমি ধর্ম্মজীবনের গভীর তত্ত্বসকলের আলোচনাতে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ যাপন করিতাম। ফলতঃ তাঁহার

সহবাসে আমি ও প্রসন্নময়ী এই সময়ে বিশেষ উপকৃত হইলাম। তদবধি প্রকাশচন্দ্রের সহিত এরূপ গাঢ় বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, যে, তাহা পরবর্ত্তী সমাজবিপ্লবেও নষ্ট হয় নাই। এই সময়ে প্রকাশের পত্নী অঘোরকামিনী কিছুদিন হরিনাভিতে গিয়া আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও উপকৃত হইলাম।

এই হরিনাভি-বাসকালের আর-একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে লক্ষ্মীমণি আমার আশ্রয়ে আসে। লক্ষ্মীমণি ঢাকা সহরের একটি বেশ্যার কন্যা। তাহার মাতা তাহাকে বাল্যকালে একটী বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়াছিল। লক্ষ্মীমণি ঐ স্কুলে একজন খ্রীষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রী ও এক ব্রাহ্ম শিক্ষকের সংশ্রবে আসে। ইহাঁদের সংশ্রবে আসিয়া তাহার মাতা যে জীবন যাপন করিতেছিল, তাহার প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মে। লক্ষ্মীর বয়ঃক্রম যখন ১৩।১৪ হইল, তখন তাহার মাতা তাহাকে নিজ বৃত্তিতে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার জননী প্রথমে প্ররোচনা অনুরোধ প্রভৃতি করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে বলপ্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। একদিন বেচারিকে একটা পুরুষের সঙ্গে একঘরে সমস্ত দিন বন্ধ করিয়া রাখিল। আঁচড়, কামড়, হাত পা ছোড়ার দ্বারা যতদূর হয়, লক্ষ্মী সমুদয় করিয়া সমস্ত দিন আত্মরক্ষা করিল। সন্ধ্যার সময় একবার দ্বার খোলা পাইয়া লক্ষ্মী সরিয়া পড়িল এবং একেবারে সেই ব্রাহ্ম শিক্ষকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে লইয়া একটী ব্রাহ্ম পরিবারে রাখিলেন। লক্ষ্মীর মাতা দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় কন্যালাভের জন্য আদালতে নালিশ উপস্থিত করিল। সৌভাগ্যক্রমে একজন ইংরাজ বিচারকের নিকট এই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, লক্ষ্মীকে মাতার হাত হইতে লইয়া সেই ব্রাহ্ম অভিভাবকের হস্তে অর্পণ করিলেন।

লক্ষ্মীর মাতা মোকদ্দমাতে হারিয়া আর-এক প্রকারে লক্ষ্মীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। লক্ষ্মীকে দেখিতে আসিতে আরম্ভ করিল। বারণ করিলে শুনিত না। এইরূপে যে গৃহস্থের গৃহে সে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে একপ্রকার অস্থির করিয়া তুলিল। তখন উদ্ধারকারী ব্রাহ্মগণ লক্ষ্মীকে নিরাপদ রাখিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আনিলেন। আনিয়া রাখিবার উপযুক্ত স্থান না পাইয়া, হরিনাভিতে আমার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি প্রসন্নময়ীর সহিত পরামর্শ করিয়া লক্ষ্মীকে আশ্রয় দিলাম।

এখানে বলা আবশ্যক যে গণেশসুন্দরী বা মনোমোহিনী তৎপূর্ব্বেই বিবাহিতা হইয়া আমাদের গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

আমি যখন হরিনাভিতে বাস করি তখন সে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রথম আবির্ভাব, তাহার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। সেখানে যাইবার কিছুদিন পরেই আমাকে ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরে ও বার বার জ্বর হইয়া আমাকে বড় কাহিল করিয়া ফেলে। তাহার উপরে পূর্ব্বোক্ত সকল কারণে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। তাহাতে দেড়বৎসরের মধ্যেই আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া আমার শুভানুধ্যায়ী তৎকালীন স্কুলসমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টার রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আমাকে কলিকাতার উপনগরবর্ত্তী ভবানীপুর নামক স্থানের নবপ্রতিষ্ঠিত সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল নামক ইং সং স্কুলের হেডমাষ্টার করিয়া আনিলেন। যতদূর স্মরণ হয় আমি ১৮৭৪ সালের শেষভাগে ঐ স্কুলে আসিলাম।

আমার স্বগ্রামবাসী আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসম ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার স্থানে হরিনাভির হেডমাষ্টার হইয়া গেলেন। বিরাজ-

মোহিনী তাঁহাদের সহিত হরিনাভিতে গিয়া তাঁহাদের পরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। প্রসন্নময়ী লক্ষ্মীমণি সহ আমার সঙ্গে ভবানীপুরে আসিলেন। আমি শনিবার হরিনাভিতে যাইতাম, রবিবার সোমপ্রকাশ সম্পাদন করিতাম, সোমবারে ভবানীপুরে আসিতাম। এইরূপে কিছু দিন গেল। অবশেষে আমি আমার কাজের সুবিধার জন্য মাতুলের কাগজ ও ছাপাখানা ভবানীপুরে তুলিয়া আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক ফরমা ইংরাজী সংযোগ করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রেসেরও অনেক উন্নতি করিলাম।

এতদ্ভিন্ন এখানে আসিয়াই কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত সমবেত হইয়া একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলাম। আমার নিজ ভবনেই এই সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা হইত। আমাকেই অধিকাংশ দিন আচার্য্যের কার্য্য করিতে হইত। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি কোনও কোনও বন্ধুকে আনিয়া উপাসনা করাইতাম।

সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের যে ভার ছিল, যাহা আমি হরিনাভিতে থাকিবার সময়েও রাখিয়াছিলাম, এবং অনেক সময় জলে, ঝড়ে, দুর্য্যোগে হরিনাভি হইতে আসিয়া সম্পন্ন করিতাম, তাহা এই সময়ে আমার বন্ধু কেদারনাথ রায়ের প্রতি অর্পণ করি। তিনি ইহার পর অনেক দিন ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমার হরিনাভিতে বাসকালে, কলিকাতাতে কেশব বাবুর সমাজ মধ্যে নানা আন্দোলন চলিতেছিল। ভবানীপুরে আসিয়া আমি সেই আন্দোলন-স্রোতে পড়িয়া গেলাম। ইহার কোন কোন আন্দোলন আমি কলিকাতাতে থাকিবার সময়েই উঠিয়াছিল। তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ অগ্রে দিয়াছি, আবার বিশেষ রূপে লিখিতেছি।

১৮৭২ সালে অন্নদাচরণ খাস্তগির, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রজনীনাথ রায় প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্ম কেশব বাবুকে বলিলেন, যে, তাঁহারা তাঁহাদের পরিবারস্থ মহিলাদিগকে লইয়া মন্দিরের বাহিরে বসিতে চান। কেবল এ কথা যে বলিলেন তাহা নহে, একটা কিছু স্থির হইতে না হইতে একদিন স্বীয় স্বীয় পত্নী ও কন্যাগণ সহ মন্দিরের বাহিরে সাধারণ উপাসকদিগের মধ্যে গিয়া বসিলেন। এইরূপ কয়েকবার বসিতেই উপাসকমণ্ডলীর অপরাপর সভ্যগণ আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। অনেকে এতদূর গেলেন যে, কেশব বাবুকে বলিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মন্দিরে আসা ত্যাগ করিতে হয়। ঐ সময়ে একদিন সমাগতা মহিলাদিগকে পর্দার বাহিরে বসিতে নিষেধ করা হইল। তাহাতে উন্নতিশীল দল রাগিয়া গেলেন। কেশব বাবু বিপদে পড়িলেন। কিরূপে উভয় পক্ষ রক্ষা হয় সেই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী দল বিলম্ব

সহ্য না করিয়া মন্দিরে আসা পরিত্যাগ করিলেন এবং খাস্তগির মহাশয়ের বাটীতে এক স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। তাঁহারা একবার মহর্ষিকে আনিয়া আপনাদের সমাজে উপাসনা করাইলেন। তখন আমি ভারতাশ্রমে থাকিতাম। আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই স্ত্রীস্বাধীনতাপক্ষের প্রধান নেতা হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক দিন এক ভবনে বাস করিয়াছিলাম। হৃদয়ে হৃদয়ে একটা প্রীতির যোগ ছিল। আমি তাঁহাদের স্ত্রীস্বাধীনতা-দলের একজন পাণ্ডা হইলাম না বটে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত আমার মনের যোগ ছিল। স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে বসিতে দিতে আমার আপত্তি ছিল না, বরং যখন তাঁহারা বসিতে চাহিতেছেন তখন বসিতে দেওয়া উচিত, এই মনে করিতাম। তবে দ্বারিকা বাবুর ন্যায় মনে করিতাম না, যে, বাহিরে বসিতে দিলেই পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। তখন আমার এই প্রকার ভাব ছিল। যাহা হউক তাঁহারা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিয়াই সেখানে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করিবার জন্য আমাকে ধরিলেন। আমি জানিতাম ইহাতে কেশব বাবু অসন্তুষ্ট হউন বা না হউন তাঁহার অনুগত প্রচারকদলের অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা পক্ষীয় সকলেই আমার বন্ধু এবং তাঁহাদের সহিত আমার হৃদয়ের যোগ, উপাসনা করিবার অনুরোধ কিরূপে লঙ্ঘন করি, কাজেই সম্মত হইলাম; এবং তাঁহাদের সমাজে উপাসনা করিতে লাগিলাম। ইহাও প্রচারক মহাশয়দিগের সহিত আমার মতভেদের একটা কারণ হইল।

ক্রমে কেশব বাবু তাঁহার ব্রহ্মমন্দিরের এক কোণে পর্দার বাহিরে অগ্রসর দলের মহিলাদের জন্য বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। তখন স্ত্রী-স্বাধীনতার দল স্বতন্ত্র সমাজ তুলিয়া দিয়া আবার মন্দিরে আসিতে লাগিলেন। বিবাদ মিটিয়া গেল। ইহা দেখিয়া আমি হরিনাভিতে গেলাম। কিন্তু স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে কেশব বাবুর সহিত

এই অগ্রসর দলের যে মতভেদ ঘটিয়াছিল, তাহা এরূপ সহজে মিটিবার জিনিস ছিল না। আশ্রমে যে মহিলা-বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে কেশব বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে শিক্ষা দিবার বিরোধী ছিলেন। এমন কি জ্যামিতি পড়ান লইয়াও তাঁহার সহিত আমার তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। আমি জ্যামিতি লজিক ও মেটাফিজিক্স্ পড়াইতে চাহিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, এ-সকল না পড়াইলে প্রকৃত চিন্তাশক্তি ফুটিবে না। কেশব বাবু বলিলেন "এসকল পড়াইয়া কি হইবে। মেয়েরা আবার জ্যামিতি পড়িয়া কি করিবে? তদপেক্ষা elementary principles of science মুখে মুখে শিখাও।" আমি Scienceএর মধ্যে Mental Science আনিলাম। তখন আমি তাজা কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, Mental Scienceএ মাথা পুরিয়া রহিয়াছে, আমার ছাত্রীদিগকে তাহা না পড়াইলে কি থাকিতে পারি? আমি মুখে মুখে Mental Science বিষয়ে ও Logic বিষয়ে উপদেশ দিতাম, ছাত্রীরা লিখিয়া লইতেন। সে-সকল Note এখনও আমার পুরাতন ছাত্রীদের কাহার কাহারও নিকট থাকিতে পারে। আমার প্রধান ছাত্রী ছিলেন তিনজন, রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী খাস্তগির যিনি পরে Mrs. B. L. Gupta হইয়াছিলেন ও প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী সেন। ইহাঁরা সকলেই তখন বয়স্থা ও জ্ঞানানুরাগিণী, ইহাঁদিগকে পড়াইতে আমার অতিশয় আনন্দ হইত।

সে যাহা হউক, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর দল ভারতাশ্রমের এই মহিলা-বিদ্যালয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া মহিলাদের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে আর-একটী স্কুল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রথম তাঁহারা হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয় নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বিলাত হইতে নবাগতা কুমারী এক্রয়েড ইহার তত্ত্বাবধায়িকা

হইলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে কুমারী এক্রয়েড বিবাহিতা হওয়াতে ঐ বিদ্যালয় বঙ্গ-মহিলা-বিদ্যালয় নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া কিছুদিন পরে বেথুন কলেজের সহিত মিলিত হয়। বালিগঞ্জে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া এই স্কুল খোলা হইল। গাঙ্গুলী ভায়া নিজে একজন শিক্ষক হইলেন। শিক্ষক কেন, তিনি দিন রাত্রি বিশ্রাম না জানিয়া ঐ স্কুলের উন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন।

আমি ভবানীপুরে আসিয়া দেখিলাম যে ঐ স্কুল চলিতেছে। গাঙ্গুলী-ভায়া ছাড়িবার লোক ছিলেন না। আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতাম। এমন সাঁচ্চা সত্যানুরাগী লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গাঙ্গুলী-ভায়া স্ত্রী-স্বাধীনতার নেতা ছিলেন। আমি স্ত্রী-স্বাধীনতার ভাবটা তাঁর মত না লই, স্ত্রীজাতির উন্নতি হয় ইহা অন্তরের সহিত চাহিতাম। আমি ভবানীপুরে আসিলেই গাঙ্গুলী-ভায়া আমাকে ছিনা জোঁকের মত ধরিয়া বসিলেন, যে, আমার কন্যা হেমলতাকে বঙ্গমহিলা-বিদ্যালয়ে দিতেই হইবে। সুতরাং হেমলতাকে বঙ্গমহিলা-বিদ্যালয়ে দিলাম।

এই সময়ে আর-এক আন্দোলন উঠিল। আমার হরিনাভি-বাস-কালের মধ্যে কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে এক ঘটনা ঘটে। ঐ সময়ে আমার স্বগ্রামবাসী ব্রাহ্ম ভ্রাতা হরনাথ বসু মহাশয় সপরিবারে ভারতাশ্রমে থাকিতেন। হরনাথ বাবু মন-খোলা, মহোৎসাহী মানুষ ছিলেন। আয় অল্প ও ব্যয় বহু হওয়াতে তাঁহার আয়-ব্যয়ের সমতা কখনই ছিল না। তিনি সপরিবারে আশ্রমে ছিলেন, কিন্তু দেনদার হইয়া পড়িয়াছিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় পীড়াপীড়ি করাতে তিনি আশ্রম হইতে স্ত্রীপুত্রদিগকে নিজের শ্বশুরবাড়ী প্রেরণ করা স্থির করিলেন। কিন্তু যাইবার সময় আশ্রমের দেনা দিয়া যাইতে

পারিলেন না। একদিন তাঁহার পত্নী বিনোদিনী পুত্র কন্যা সহ গাড়ি করিয়া আশ্রম হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয়ের আদেশক্রমে ভৃত্যেরা আসিয়া দ্বারে গাড়ি অবরোধ করিল। দেনা শোধ না করিলে গাড়ি যাইতে দিবে না। বিনোদিনী আপনাকে অপমানিতা বোধ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; এবং আপনার গাত্র হইতে গহনা খুলিয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। হরনাথবাবু উত্তেজিত হইয়া বিনোদিনীর নাম দিয়া এই ঘটনার বিবরণ সাপ্তাহিক-সমাচার নামক এক ব্রাহ্মবিরোধী সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশ করিলেন। দেশীয় সংবাদপত্র-সকল একে চায়, আরে পায়। তাহারা একেবারে আশ্রমের ও কেশববাবুর দলের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন তুলিয়া দিল। সময় বুঝিয়া উন্নতিশীল দলের এক ব্রাহ্ম যুবক আশ্রমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এক ঘোর কুৎসাপূর্ণ পত্র সাপ্তাহিক-সমাচারে প্রকাশ করিলেন। তখন কেশব বাবু বাধ্য হইয়া সাপ্তাহিক সমাচারের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। যতদূর স্মরণ হয় সে মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইল।

এই বিবাদের সময় আমি হরলাল বাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে সংবাদপত্রে যাওয়ার জন্য অনেক তিরস্কার করিয়াছিলাম; এবং মোকদ্দমার বিষয়ে কেশব বাবুর পক্ষ ছিলাম। কিন্তু এই আন্দোলন হইতে আর এক আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। বিনোদিনীকে দ্বারাবরোধ করিয়া অপমান করাতে যুবক ব্রাহ্মদল, বিশেষতঃ গাঙ্গুলী ভায়ার দল, আশ্রমের প্রতি চটিয়া গেলেন; এবং এই কার্য্যের বিচারের জন্য কেশব বাবুকে সভা আহ্বানের অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহার উত্তরে, ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকাতে প্রকাশ হইল, যে প্রচারকগণ ঈশ্বর-নিযুক্ত। ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের বিচারক হইতে পারেন না। ইহাতে সমাজের কার্য্যপ্রণালী ও

শাসন সম্বন্ধে এক নূতন আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী-প্রমুখ দল, এই দলে যোগ দিলেন। আমি ভবানীপুরে আসিয়া দেখিলাম, কেশব বাবুর মত ও কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য একটী দল গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি আসিবামাত্র ইঁহারা আমাকে আপনাদের মধ্যে লইলেন; কারণ সমাজের কার্য্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন বিষয়ে এবং কেশব বাবুর কোনও কোনও মতের প্রতিবাদ বিষয়ে ইঁহাদের সহিত পূর্ব্ব হইতে আমার মতের ঐক্য ছিল।

ইহার পর আমার ভবনে এবং অপরাপর স্থানে এই প্রতিবাদী দলের ঘন ঘন মীটিং হইতে লাগিল। অবশেষে ব্রাহ্মদিগকে সতর্ক করিবার জন্য সমর ঘোষণা করা স্থির হইল। এই সমর ঘোষণা দুই প্রকারে আরম্ভ হইল। প্রথমে কলিকাতা ট্রেনিং-একাডেমী নামক স্কুলের গৃহে কেশববাবুর বিরুদ্ধে দুইটী বক্তৃতা হইল। একটি আমি দিলাম, অপরটী আমার বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিলেন। আমার বক্তৃতার সমুদয় কথা স্মরণ নাই। আমি প্রধানতঃ কেশববাবুর কতকগুলি মতের সমালোচনা করিয়াছিলাম। সে সম্বন্ধে এইমাত্র স্মরণ আছে, যে, রবিবাসরীয় মিরারে কেশববাবু তাহার উল্লেখ করিয়া তাহার উদার ভাবের প্রশংসা করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা তাঁহাদের বড়ই অপ্রীতিকর হইল। নগেন্দ্র বাবু সমাজের কার্য্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে কেশব বাবুকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। নেপোলিয়ন যেমন সাধারণতন্ত্রের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, সাধারণতন্ত্রের নিশান লইয়া কার্য্য করিয়া, অবশেষে সম্রাটের মুকুট নিজ মস্তকে লইয়াছিলেন, তেমনি কেশব বাবু ব্রাহ্মপ্রতিনিধি-সভা স্থাপন করিয়া আদি-সমাজের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিয়া পরিশেষে যথেচ্ছাচারী রাজা

হইয়া বসিয়াছেন। এই কথাতে কেশব বাবুর প্রচারকদল আমাদের উপর হাড়ে চটিয়া গেলেন।

একদিকে বক্তৃতা আরম্ভ হইল, অপরদিকে ১৮৭৪ সালের নভেম্বর মাস হইতে "সমদর্শী" নামক দ্বিভাষী এক মাসিক পত্রিকা বাহির হইল। বন্ধুগণ আমাকে তাহার সম্পাদক করিলেন। সুতরাং সাধারণের চক্ষে আমি এই দলের নেতা হইয়া দাঁড়াইলাম। সমদর্শীতে আমরা কেশববাবুর কোনও কোনও মতের প্রতিবাদ করিতাম ও স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মতত্বের আলোচনা করিতাম। সমদর্শী কিছুদিন চলিয়াছিল, পরে বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সমদর্শীদল রহিয়া গেল, এবং সমাজের কার্য্যে নিয়মতন্ত্র:প্রণালী স্থাপনের জন্য যে আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা চলিতে লাগিল।

ভবানীপুর-বাস-কালের কতকগুলি পারিবারিক ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের মধ্যে প্রসন্নময়ীর গর্ভে আমার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা সরোজিনী জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় ঘটনা, একদিন আমি স্কুল হইতে আসিয়া দেখি, একটী নিরাশ্রয় মেয়ে তাহার বোঁচকা-বুঁচকী সহ আসিয়া আমার ভবনে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার আর যাইবার স্থান নাই, সে আশ্রয় চায়। সে নিজের জীবনের একটী ইতিবৃত্ত বলিল, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। মহা মুস্কিল; পুরুষ নয় যে অন্য এক স্থান দেখিতে বলিব, মেয়েছেলে, রাস্তায় দাঁড়াইতে বলিতে পারি না। বিশেষতঃ প্রসন্নময়ী অতি দয়ালু ছিলেন, নিরাশ্রয় দীনদরিদ্রের প্রতি তাঁর দয়া দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। মেয়েটী আসিয়া মা বলিয়া ডাকিয়াছে, আর কোথায় যায়, অমনি তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন। অগ্রে ছিল লক্ষীমণি, এখন আসিল সেই মেয়ে, তাঁহার নিজ কন্যা বাদে আর দুইটী কন্যা বাড়িল। মেয়েটী প্রসন্নময়ীর ক্রোড়ে থাকিয়া গেল।

ভবানীপুর-বাসকালের আর দুইটী স্মরণীয় বিষয় আছে। প্রথম, এই সময় একজন খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা হয়। তিনি হাইচার্চ্চের বড় গোঁড়া ছিলেন। আমি তাঁহার ভবনে অনেক সময় যাপন করিতাম। তাঁহার প্ররোচনায় আমি ঐ সময় হাইচার্চ্চের অনেক পুস্তক পড়ি। তাহার মধ্যে জন হেন্‌রী নিউম্যানের একখানি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমি বড়ই উপকৃত হই। দুই তিন মাস তাহার প্রভাব আমার মনে জাগরূক ছিল। নিউম্যান কিরূপে সত্যানুরাগ দ্বারা চালিত হইয়া কোন্ ভ্রমে গিয়া পড়িলেন তাহা দেখিয়া আমার মনে বিষাদমিশ্রিত এক আশ্চর্য্যের ভাব হয়।

এইরূপে একদিকে যেমন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র ও খ্রীষ্টীয় সাধুর ভাব আমার মনে আসে, অপরদিকে এই সময়েই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আমার আলাপ হয়। তাহার ইতিবৃত্ত এই। আমাদের ভবানীপুর সমাজের একজন সভ্য দক্ষিণেশ্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া আমাকে বলিতেন যে, দক্ষিণেশ্বরের কালীর মন্দিরে একজন পূজারি ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার কিছু বিশেষত্ব আছে। এই মানুষটা ধর্ম্মসাধনের জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। শুনিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। যাইব যাইব করিতেছি এমন সময় মিরার কাগজে দেখিলাম, যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত কথা কহিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া উঠিল। আমার সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে করিয়া একদিন গেলাম। প্রথম দর্শনের দিন হইতেই আমার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ ভালবাসার লক্ষণ দৃষ্ট হইল। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ চমৎকৃত হইলাম। আর কোনও মানুষ ধর্ম্মসাধনের জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কি না

জানি না। রামকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন যে, তিনি কালীর মন্দিরে পূজারি ছিলেন। সেখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিতেন। ধর্ম্মসাধনার্থ তাঁহারা যিনি যাহা বলিতেন সমুদয় তিনি করিয়া দেখিয়াছেন। এমন কি এইরূপ সাধন করিতে করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছুদিন উন্মাদ-গ্রস্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার একটা পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেন। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি; এমন কি অনেক দিন পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার আলিঙ্গনের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া গিয়াছেন।

সে যাক। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে, ধর্ম্ম এক; রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্ম্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন। ইহার একটী নিদর্শন উজ্জ্বলরূপে স্মরণ আছে। একবার আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ খ্রীষ্টীয় পাদ্‌রী বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া গেলাম; তিনি আমার মুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। আমি গিয়া যেই বলিলাম, "মশাই, এই আমার একটা খ্রীষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন।" অমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইয়া মাটীতে মাথা দিয়া বলিলেন, "যীশুখ্রীষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।" আমার খ্রীষ্টীয় বন্ধুটি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন?"

উত্তর—কেন, ঈশ্বরের অবতার।

খ্রীষ্টীয় বন্ধুটী বলিলেন,—ঈশ্বরের অবতার কিরূপ? কৃষ্ণাদির মত?

রামকৃষ্ণ—হাঁ, সেইরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, যীশুও এক অবতার।

খ্রীষ্টীয় বন্ধু—আপনি অবতার বল্‌তে কি বোঝেন?

রামকৃষ্ণ—সে কেমন তা জান? আমি শুনেছি কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধর্‌বার ছোঁবার মত হলো। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ; অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোনও এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্ত্তি ধারণ কর্‌লে, ধর্‌বার ছোঁবার মত হলো। যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যে কিছু শক্তি সে ঐশী শক্তি, সুতরাং তাঁরা ভগবানের অবতার।

রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতার ভাব বিশেষ-রূপে উপলব্ধি করিয়াছি।

ইহার পর রামকৃষ্ণের সহিত আমার মিত্রতা আরও ঘনীভূত হয়। এমন দিনও গিয়াছে আমাকে অনেক দিন দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ভবনে আসিয়াছেন।

এ সময়ের একটী স্মরণীয় ঘটনা, আমার বন্ধু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রথমা পত্নী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু। দুর্গামোহনবাবু এ সময় ভবানীপুরের সন্নিকটে বাস করিতেন—সুতরাং তাঁহার ভবনে সর্ব্বদা যাইতাম। ব্রহ্মময়ী আমার আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিলেন, তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার সেই সরল পবিত্রতামাখা মুখখানি যেন স্মৃতিতে জাগিতেছে। প্রসন্নময়ীর ন্যায় তাঁর সন্তানের ক্ষুধা যেন নিজ সন্তান দিয়া মিটিত না। তিনিও কতকগুলি নিরাশ্রয় বালিকাকে নিজ ভবনে আশ্রয় দিয়া পালন করিতেছিলেন। ব্রহ্মময়ী আমার সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের উৎসাহদায়িনী ছিলেন। তাহার একটী নিদর্শন মনে আছে। একবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সভ্য শিতিকণ্ঠ মল্লিক ও আমি পরামর্শ

করিলাম যে ভবানীপুরে একটা লাইব্রেরী ও পাঠাগার করিলে ভাল হয়। এই পরামর্শ করিয়া আমরা একদিন দুর্গামোহনবাবুর নিকট টাকা ভিক্ষা করিতে গেলাম। দুর্গামোহনবাবু অর্থসাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে অনেক বাদবিতণ্ডা চলিল। আমি বলিলাম, "আপনার নিকট হইতে যদি কিছু টাকা "আদায় না করি, তবে আমার নাম শিবনাথ শাস্ত্রী নয়।" তিনি বলিলেন, আমার নিকট হতে যদি কিছু আদায় কর্‌তে পার, তবে আমার নাম দুর্গামোহন দাস নয়।" ইহার পর শিতি বাবুর সহিত তাঁহার তর্ক বাধিল। আমি ইতিমধ্যে সরিয়া পড়িয়া একেবারে উপর তালায় ব্রহ্মময়ীর নিকট গেলাম। প্রস্তাবটী বেশ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "জ্ঞানের চর্চ্চা বাড়ে সে ত ভালই। আপনারা কি মেয়েদের পড়্‌বার মত বৈ রাখ্‌বেন? অল্প কিছু জমা দিয়ে, ভদ্রলোকের মেয়েরা কি ভাল ভাল বাঙ্গলা বই নিয়ে পড়্‌তে পার্‌বে?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, তা পার্‌বে।"

ব্রহ্মময়ী—"তবে আমি এককালীন ৫০৲ টাকা ও মাসে মাসে ৪৲ টাকা করে দেব।"

আমি বলিলাম—"তবে এই কাগজে নামটা স্বাক্ষর করে দিন।"

এইরূপে একটা কাগজে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা লিখিয়া তাহাতে তাঁর নাম স্বাক্ষর করাইয়া, নীচের তলায় গিয়া দুর্গামোহন বাবুর নাকের কাছে কাগজখানা ধরিলাম। দুর্গামোহন বাবু ব্রহ্মময়ীর স্বাক্ষরটা দেখিয়া বলিলেন, "ও রাস্কেল, এই জন্যে তোমার এত জোর; তুমি আমার কাছে হেরে বিলেত আপীল কর্‌বে ভেবে এসেছিলে।" অমনি একটা হাসাহাসি পড়িয়া গেল। দুর্গামোহন বাবু উপরে গিয়া ব্রহ্মময়ীকে বলিলেন, "ওগো তুমি আমাকে না জিজ্ঞেসা করে এই হতভাগাদের

কোনও কথা কানে নিয়ো না। এই যে শ্রীহস্তে স্বাক্ষর করেছ, এখন আমার টাকা না দিয়ে পার নাই।"

ব্রহ্মময়ী বলিলেন, "বেশ ত ওঁরা ত ভাল কাজ করতে যাচ্চেন। মেয়েদের ব্যবহারের মত একটা লাইব্রেরি হয় সে ত ভালই।"

ব্রহ্মময়ীর আমার প্রতি ভালবাসার একটী নিদর্শন মনে আছে। একবার আমার টাকার বড় টানাটানি যাইতেছিল। সেই মাসের শেষ দিকে ছেলেরা প্রসন্নময়ীর চুল বাঁধিবার আয়নাখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। প্রসন্নময়ী এ কথা আর আমাকে জানাইলেন না। ভাবিলেন, মাসের শেষ কয়টা দিন কোনও প্রকারে চালাইবেন, পরমাসের প্রথমে আয়না কেনা হইবে। ইতিমধ্যে একদিন ব্রহ্মময়ী অপরাহ্ণে আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া দেখেন প্রসন্নময়ী জলের জালার নিকট দাঁড়াইয়া জলে মুখ দেখিতেছেন ও চুল বাঁধিতেছেন। ব্রহ্মময়ী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও হেমের মা, ও কি! জলের জালার কাছে কি করছ?"

প্রসন্নময়ী হাসিয়া বলিলেন, "ওগো, আয়নাখানা ছেলেরা ভেঙ্গে ফেলেছে, ওঁর বড় টাকার টানাটানি যাচ্চে, তাই ওঁকে জানাই নি, মাস গেলে কিন্‌বো ভেবে জালার জলে মুখ দেখে চুল বাঁধ্‌ছি।"

ব্রহ্মময়ী, হাসিয়া,—"ও মা এ ত কখনও শুনিনি।"

প্রসন্নময়ী—"দেখ্‌লেন কেমন একটা নূতন বিষয় দেখালাম।"

দুইজনে এই লইয়া হাসাহাসি হইতেছে, এমন সময় আমি স্কুল হইতে আসিয়া উপস্থিত। আমিও এই কথা শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলাম। প্রসন্নময়ীকে বলিলাম, "তোমার মত স্ত্রী নিয়ে ঘর করা কিছুই কষ্টকর নয়, বেশ বুদ্ধি বার করেছ ত। যা হোক আমাকে বল্‌লে আমি আয়না এনে দিতে পার্‌তাম!"

প্রসন্নময়ী—"তোমার টাকার টানাটানি যাচ্ছে কিনা তাই বলি নি।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই ব্রহ্মময়ী চলিয়া গেলেন। আমরা ভাবিলাম তিনি ঘরে গেলেন। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই এক প্রকাণ্ড আয়না লইয়া আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, "এটা আমার উপহার; নিতেই হবে।" এমন ভাবে এমন আগ্রহের সহিত এ কথা বলিলেন যে আমরা আর 'না' বলিতে পারিলাম না। মন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। পরে জানিলাম, আমাদের বাড়ী হইতে আর বাড়ীতে যান নাই, একেবারে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে গিয়া এক জানা দোকান হইতে আয়নাখানি কিনিয়া আনিয়াছেন।

এই ব্রহ্মময়ী এই সময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সকলেই, বিশেষতঃ আমি, মর্ম্মাহত হইলাম। ব্রহ্মময়ীর জন্য দুর্গামোহন বাবুর বাড়ী আমার জুড়াইবার স্থান ছিল। সপ্তাহের মধ্যে প্রায় প্রতিদিন বৈকালে স্কুল হইতে আসিয়া ব্রহ্মময়ীর কাছে যাইতাম। গিয়া দেখিতাম বসিবার ঘর চেয়ার কোচ টেবল প্রভৃতি দিয়া সুন্দররূপে সাজান, কিন্তু ব্রহ্মময়ীর সেদিকে দৃষ্টি নাই, তিনি মেজের উপরে মাটীতে বসিয়া সমাগত কয়েকটী মেয়েকে পাশে বসাইয়া গল্প করিতেছেন। একদিনকার একটা ঘটনা বলি। একদিন একটী মেয়ে গল্পস্থলে বলিলেন—মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে বেশ লিচু উঠিয়াছে, তাঁরা আনাইয়া খাইয়াছেন। তারপর গল্প হাসাহাসি চলিল। ব্রহ্মময়ী একবার উঠিয়া গিয়াছিলেন, ত্বরায় আসিলেন; তৎপরে কথায় বার্ত্তায় হাসাহাসিতে সময় যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে বড় বড় লিচু আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মময়ী মেয়েদিগকে বলিলেন, "খাও, লিচু খাও।" ইহা লইয়া হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিলেই তিনি তাঁহার আশ্রিতা মেয়েদের কাহার জন্য কি

করা কর্ত্তব্য আমার সঙ্গে সেই পরামর্শে প্রবৃত্ত হইতেন। অধিকাংশ দিন সন্ধ্যার সময় নিজের হাতে আমাকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। তিনি যখন চলিয়া গেলেন, তাঁর এই-সকল সদাশয়তার স্মৃতি আমার মনে জাগিতে লাগিল এবং আমাকে শোকার্ত্ত করিতে লাগিল।

ব্রহ্মময়ীর স্বর্গারোহণের পর আমরা একমাসকাল, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, তাঁহার ভবনে মিলিত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমি উপাসনার অনুকূল অনেকগুলি শোকসূচক সঙ্গীত বাঁধিয়াছিলাম। তাহার অনেকগুলি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মময়ীর শ্রাদ্ধবাসরে দুর্গামোহন বাবু বাহিরের কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই; আমাদের ন্যায় কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু যাঁহারা ব্রহ্মময়ীকে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার পীড়ার মধ্যে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই লইয়া উপাসনা করেন; কিন্তু উপাসনান্তে চক্ষু খুলিয়া দেখি অনিমন্ত্রিত হইয়াও কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আসিয়া উপাসনাতে যোগ দিতেছেন। ব্রহ্মময়ীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল হইতে আমার উৎসাহদাতা ও সহায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখুয্যে মহাশয় আমাকে হেয়ার স্কুলে আনিলেন। হেয়ার স্কুলের হেডপণ্ডিত ও ট্রান্স্লেশন মাষ্টারের পদে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। রাধিকা বাবুর পরামর্শে উড্রো সাহেব আমাকে উক্ত পদ দিলেন। শুনিলাম সাট্‌ক্লিফ সাহেব অন্ত কাহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা রহিত করিয়া ডিরেক্‌টার উড্রো সাহেব আমাকে এই পদ দিলেন। পূর্ব্বে উড্রো সাহেবের সঙ্গে যে আমার ঝগড়া হইয়াছিল, এবং উড্রো সাহেব আমার প্রতি চটিয়া আছেন, রাধিকা বাবু তাহা জানিতেন। অনুমান করি সদাশয় উড্রো সাহেবের তাহা মনে ছিল না, অথবা রাধিকাপ্রসন্ন বাবু কৌশলক্রমে সে বিরোধের কথা পশ্চাতে রাখিয়া, আমার প্রশংসা করিয়া উড্রো সাহেবের সম্মতি লইয়াছিলেন। যাহা হউক উড্রো সাহেব সাট্‌ক্লিফের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে হেয়ার স্কুলে বসাইলেন। আমি বোধ হয় ১৮৭৬ সালের প্রারম্ভে হেয়ার স্কুলে আসি।

কিছুদিন ভবানীপুর হইতেই গতায়াত করিয়াছিলাম, অবশেষে কলিকাতাতেই উঠিয়া আসিলাম। আমি কলিকাতাতে উঠিয়া আসিলে আমাদের "সমদর্শী" দল আরও জমাট হইল। ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টাও চলিতে লাগিল। এদিকে আমি, কেদারনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আমরা পাঁচজন বন্ধু একত্র হইয়া ধর্ম্মসাধনের জন্য একটী ক্ষুদ্র দল করিলাম। আমরা পাঁচজনে একত্র বসিতাম, প্রাণ খুলিয়া ধর্ম্মবিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতাম, নানাস্থানে

মিলিত হইয়া উপাসনা করিতাম। মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মোপদেশের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট যাইতাম। তিনি আমাদের নাম রাখিলেন "পঞ্চপ্রদীপ।" একদিন বলিলেন, লোকে পঞ্চপ্রদীপে যেমন দেবতার আরতি করে, তেমনি তোমরা পঞ্চপ্রদীপে ঈশ্বরের আরতি করিতেছ। নামটী আমাদের বড় ভাল লাগিল। আমরা আপনাদের মধ্যে আমাদের সম্মিলনকে পঞ্চপ্রদীপের সম্মিলন বলিতে লাগিলাম।

ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টার যে উল্লেখ অগ্রে করিলাম, তাহা দুই প্রকারে চলিতে লাগিল। প্রথম, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরটী ট্রষ্টীদিগের হস্তে অর্পণ করিবার চেষ্টা করা; দ্বিতীয়, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রতিনিধি-সভা স্থাপনের চেষ্টা করা। কেশব বাবু ব্রাহ্ম-সাধারণের বা উপাসক মণ্ডলীর সভা আহ্বান করা বন্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমরা সর্ব্বদা এ আন্দোলন করিবার সুবিধা পাইতাম না। বৎসরের মধ্যে একবার উৎসবের সময় ব্রাহ্মদিগের যে সম্মিলিত সভা হইত, তাহাতে আমরা মন্দির ট্রষ্টী-হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতাম। একবার কেশব বাবু এই বলিয়া আমাদের প্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন যে, মন্দিরের দেনা আছে, দেনা থাকিতে উহা ট্রষ্টী হস্তে অর্পণ করা যায় না। দ্বিতীয়বার আমরা ঋণশোধের জন্য সময় নির্দ্দেশ করিয়া কয়েক ব্যক্তির প্রতি ভার দিলাম। তৃতীয়বার আমরা কয়েক-জন দেনার ভার লইতে চাহিলাম। কোনও ক্রমেই কেশব বাবুকে এ কার্য্যে রাজি করিতে পারা গেল না। আনন্দমোহন বসু মহাশয় যদিও সমদর্শী দলে যোগ দেন নাই, একটু দূরে দূরেই ছিলেন, তথাপি তিনি এবিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিতেন। মন্দিরটী যাহাতে ট্রষ্টী-হস্তে যায়, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এবং কেশব বাবু এত আপত্তি করাতে তিনি বিরক্ত হইতে লাগিলেন।

এই-সকল বিবাদের মধ্যে কেশব বাবুর ভাব দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইতে লাগিলাম। তিনি সমদর্শী দলকে লক্ষ্য করিয়া রবিবাসরীয় মিরারে sceptics, secularists, unbelievers, প্রভৃতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি দুঃখিত হইয়া ঐ মিরারে ইহার প্রতিবাদ করিলাম।

অতঃপর সংবাদপত্রের এই-সকল উক্তি প্রত্যুক্তি, "সমদর্শীর" লেখা, ও যুবকব্রাহ্মদলের মধ্যে কেশব বাবুর আদর্শ সম্বন্ধে নানা আলোচনা উপহাস বিদ্রূপ, প্রভৃতির দ্বারা কেশব বাবুর অনুগত প্রবীণ ব্রাহ্মদল ও যুবক ব্রাহ্মদলের মধ্যে চিন্তা ও ভাবগত বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এ বিষয়ে একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে কেশব বাবু বৈরাগ্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে বৈরাগ্য কিরূপ তাহা একটু বলা ভাল। তিনি নিজের ত্রিতল ভবনের ছাদে একটী খোলার ঘর বাঁধিয়া নিজে রাঁধিয়া খাইতে লাগিলেন। আহারের যে নিয়ম ছিল, তাহার বড় ব্যতিক্রম হইল না, কেবল জল পানের সময় ধাতুনির্ম্মিত গ্লাসের পরিবর্ত্তে মাটির গ্লাস ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ঝুলি লইয়া নিজের ভবনে ভিক্ষা মাগিতে লাগিলেন; পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ থালায় জল মালায় ঢালার ন্যায় মুষ্টিভিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার দেখাদেখি প্রচারক মহাশয়দিগের কেহ কেহ রাঁধিয়া খাইতে লাগিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই কোন্নগরের সন্নিকটে একটী বাগান লইয়া কেশব বাবু তাহার সাধন-কানন নাম রাখিলেন, এবং নিজে প্রচারকদলের সহিত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে নিজ হস্তে রাঁধিয়া খাওয়া, জলতোলা, বাগানের মাটিকাটা প্রভৃতি বৈরাগ্য আচরণ পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। তাহা লইয়া কলিকাতার যুবক ব্রাহ্মদলে খুব হাসাহাসি চলিতে লাগিল।

ফলতঃ ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই যুবকদলের উপর কেশব

বাবুর প্রভাব হ্রাস হইতেছিল। ব্রাহ্ম যুবকগণের ধারণা জন্মিয়াছিল যে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত বিবাদ করিয়া ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা গঠন পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফলতঃ তাঁহার নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে, তিনি হয়ত মনে করিতেছেন যে ধর্ম্মসমাজের কার্য্যে সাধারণের হাত না থাকিয়া ঈশ্বরপ্রেরিত মহাজনের হাত থাকা কর্ত্তব্য। এই কারণে তিনি সমাজের কার্য্যে অপরের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতে দিতে চান না, নিজে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া থাকিতে চান। এই সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতে যুবকগণ তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে লাগিলেন। আমাদের মনের উপরে তাঁহার শক্তি অনেক পরিমাণে যেন হ্রাস হইতে লাগিল।

একদিকে যখন এই চেষ্টা চলিল ও বিবাদ ও হাসাহাসি আরম্ভ হইল, তখন অপরদিকে ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা নামে একটী সভা গঠনের চেষ্টা চলিল। আমরা প্রস্তাবকর্ত্তা, কিন্তু কেশব বাবু তাহাতে যোগ দিতে চাহিলেন। একটী কমিটি নিযুক্ত হইল, তাহাতে তিনি নাম দিলেন। কতকগুলি নিয়মাবলীও প্রণয়ণ করা হইল।

যখন ব্রাহ্মসমাজে এই-সকল আন্দোলন চলিতেছে, তখন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি, তিনজনে আর-এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহন বাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতেই আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনও রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটী রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। আমরা

তিন জনে কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, অপরাপর দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয়বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ মহাশয়কেও লওয়া হইল। মনমোহন ঘোষের বাড়ীতে এই পরামর্শ চলিল। তাহার সকল পরামর্শে আমি উপস্থিত ছিলাম না, কার্য্যান্তরে অন্যত্র ছিলাম। কি পরামর্শ হইতেছে তাহা আনন্দমোহন বাবু ও সুরেন্দ্র বাবুর মুখে শুনিতাম। যখন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহন বাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন এতদ্দ্বারা দেশের একটী মহৎ অভাব দূর হইবে। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। কে কে এই উদ্যোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাসা করাতে আমরা যখন অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে অমৃতবাজারের দলের নাম করিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, "বা! তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতর নিলে কেন?"

আনন্দমোহন বাবু ও আমি বলাবলি করিতে করিতে ফিরিলাম যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি ত জানাই আছে, তাঁহার কাছে স্বর্গ ও নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই। যাকে ভাল জানিবেন তাকে স্বর্গে দিবেন; যাকে মন্দ জানিবেন তাকে একেবারে নরকে দিবেন। শিশিরবাবুদের প্রতি বোধহয় কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আর ওঁদের নামও সহিতে পারেন না।

কি আশ্চর্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানব-প্রকৃতির অভিজ্ঞতা! কি আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্দর্শনের শক্তি! তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। একটা সভা স্থাপন করা স্থির হইলেই, আনন্দমোহন বাবুর মুখে শুনিলাম, শিশির বাবুর দল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "এই সভার সম্পাদক হবেন কে?" মনমোহন বাবু, সুরেন্দ্র বাবু, আনন্দমোহন বাবু সেবিষয়ে মনোযোগই দেন না। তাঁহারা বলেন, সে পরে স্থির হবে, যাঁকে সকলে মনোনীত করিবেন, তিনিই হবেন। "ভারত-সভা" স্থাপনের বিজ্ঞাপন বাহির হইল। সে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার ২।১ দিন পরে সংবাদপত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে "ইণ্ডিয়ান-লীগ" নামে মধ্যবিত্তদিগের জন্য একটী রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিবার জন্য এক সভা হইবে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি ও শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া ঐ সভা স্থাপিত হইতেছে। আমরা একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া গেলাম। কারণ শিশির আদি হইতে আমাদের পরামর্শের মধ্যেই ছিলেন। কিন্তু আমরা ভারত-সভা স্থাপনের সংকল্প ত্যাগ করিলাম না। ইণ্ডিয়ান-লীগ অগ্রে হইল, কি ভারত-সভা অগ্রে স্থাপিত হইল, মনে নাই। এইমাত্র মনে আছে, এলবার্ট হলে প্রকাণ্ড সভা করিয়া ভারত-সভা স্থাপন করা গেল, এবং আনন্দমোহন বাবুকে তাহার সম্পাদক করা গেল। আর সেদিনকার কথা এই মনে আছে যে সেদিন সুরেন বাবুর একটী পুত্রসন্তান মারা যায়, তিনি তৎসত্বেও আসিয়া সভাস্থাপনে সাহায্য করিলেন। আনন্দমোহন বাবু সম্পাদক, সুরেন বাবু সহ-সম্পাদক, আমরা কয়েকজনে কমিটীর সভ্য, আমি প্রথম চাঁদা-আদায়কারী সভ্য, এই লইয়া ভারত-সভা বসিল। আমরা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীটে একটী ঘর

ভাড়া করিয়া ভারত-সভার আপিস স্থাপন করিলাম। সে আপিস-ঘরের অবস্থা দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ সুরসিক কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার প্রণীত ভারত-উদ্ধার কাব্যে লিখিলেন, "কড়ি আগে পড়ে কিম্বা দড়ি আগে ছেঁড়ে।" বাস্তবিক উহার দশা ঐ প্রকারই ছিল।

এই ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনের ভিতর দিকে কতকগুলি ব্রাহ্মবন্ধু থাকিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমি কিছুদিন ছিলাম। তখন ভারত-সভার ঘরে কমিটীর সম্মতিক্রমে "সমদর্শী" দলেরও বৈঠক চলিত। এখানে থাকিবার সময়ই আমি বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আত্মোৎসর্গ করি। যে চিরস্মরণীয় রাত্রে কেশব বাবুর নিকট প্রতিবাদ পত্র প্রেরণের প্রস্তাব নির্দ্ধারণ হয়, সে রাত্রে এই ভারত-সভার গৃহেই আমাদের বৈঠক হইয়াছিল। বলিতে কি ভারতসভা ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ যেন যমজ সহোদরের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। একই লোক দুদিকে, একই ভাবে উভয়ের কার্য্য চলিয়াছিল। ভারত-সভা সংক্রান্ত অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া ফেলি। শিশির বাবু ইণ্ডিয়ান লীগ নামক স্বতন্ত্র রাজ-নৈতিক সভা করিলেন বটে, কিন্তু তাহার কমিটিতে মনমোহন ঘোষ ও আনন্দমোহন বসুকেও লইলেন। অল্পদিনের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন ইঁহারা কমিটিতে থাকিলে শিশির বাবুরা তাঁহাদের সভাটিকে তাঁহাদের মনের মত চালাইতে পারিবেন না। তাই ইঁহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা হইতে লাগিল। আমি তখন আমার মাতুল মহাশয়ের সোমপ্রকাশ কাগজ ও প্রেস ভবানীপুরে তুলিয়া আনিয়া কাগজ চালাইতেছি। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও আমার সুপরিচিত এক ব্যক্তিকে তখন আমার সহকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার সহকারী মধ্যে মধ্যে অমৃত-বাজার আপিসে যাইতেন। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, "আজ শিশির ঘোষের অনুরোধে একটা খারাপ কাজ করে এলাম। ইণ্ডিয়ান

লীগের এক মীটিংয়ে হাত তুলে আনন্দমোহন বসু ও মনমোহন ঘোষকে পরাস্ত করে এলাম।" আমি বলিলাম, "সে কি? তুমি ত লীগের মেম্বর নও।" তিনি বলিলেন, "তাইতে ত বল্‌ছি খারাপ কাজ করে এলাম; শিশির বাবুর অনুরোধেই করেছি।" ইহার পর আনন্দমোহন বাবু ও মনমোহন বাবু লীগ ত্যাগ করিলেন। লীগও ক্রমে উঠিয়া গেল। তদবধি শিশির বাবুদের প্রতি আমার আস্থা চলিয়া গেল; কিন্তু আনন্দমোহন বাবু বহুদিন পুরাতন বন্ধুতা ভুলিতে পারিলেন না; কাজে কর্ম্মে তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিলেন। ভবানীপুরে বাসকালে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বড় দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত একযোগে কার্য্য করিবেন বলিয়া কৃষ্ণনগরের কর্ম্ম ছাড়িয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া কেশব বাবুর ভারতাশ্রমে উঠিয়াছিলেন। কিন্তু কেশব বাবুর ও তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দের সহিত মতভেদ ঘটিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে বাহির হইতে হইয়াছিল। তিনি কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত কিছুদিন স্বতন্ত্র বাসায় থাকিলেন, কিন্তু অতিকষ্টে তাঁহার দিন নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। অগ্রেই বলিয়াছি হরিনাভিতে বাসকালে আমি আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে তাঁহাদের সঙ্গে রাখিয়াছিলাম, এবং প্রতি শনিবার সেখানে আসিতাম। আমি যথাসাধ্য নগেন্দ্রবাবুর ব্যয়ের সাহায্য করিতাম কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুঃখ নিবারণ হইত না। তৎপরে আমি যখন ভবানীপুরের সাউথ সুবার্ব্বান স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া আসিলাম তখন বিরাজমোহিনীকে হরিনাভিতে সাধু উমেশচন্দ্র দত্তের নিকটে রাখিয়া, নগেন্দ্র বাবুকে সপরিবারে আমার ভবানীপুরের বাসায় আনিয়া রাখিলাম এবং তাঁহাদের সকল ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলাম। এখানে তাঁহার একটী সন্তান জন্মিল। কিছুদিন পরে নগেন্দ্র বাবু কলিকাতায়

গেলেন। আমার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পশ্চিম হইতে আসিয়া ভবানীপুরে তাঁহার সোমপ্রকাশ কাগজ ও প্রেসের ভার লইয়া বসিলেন; আমি তখন কলিকাতা হেয়ার স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষক, আমি সপরিবারে কলিকাতায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলাম। তখন কি কাজে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি।

এই সময়ের উল্লেখযোগ্য আর দুইটী ঘটনা আছে। একদিন আমার বন্ধু প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন ও আমি দুইজনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরণ দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেছি। রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের বাড়ীর সম্মুখে আসিবার সময় যেন একটী স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া আসিলাম, তত লক্ষ্য করিলাম না; মুখটা দেখিলাম না। তাহাকে অতিক্রম করিয়া কয়েক পা আসিয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে বামাকণ্ঠে শুনিলাম—"হাঁ গা শাস্ত্রীমশাই! তোমরা এখন কোথা থাক?" হঠাৎ ফিরিয়া দেখি একটী গৌরবর্ণা যুবতী একটী শিশু কন্যার হাত ধরিয়া আসিতেছে। মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিলাম—ভবানীপুর বাসকালে আমি এক নির্জ্জন স্থানে বাস করিতাম, ঐ কুলটা নারী তাহার সন্নিকটেই থাকিত ও আমাদের মেয়েদের সঙ্গে এক পুকুরে স্নানাদি করিত। সে যে আমাকে চিনিয়া রাখিয়াছে ও আমার নাম জানে তাহা জানিতাম না। যাহা হউক আমি ফিরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র সে হাসিয়া বলিল—"তোমার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। তোমার বাসা কোথায় বল্‌লে আমি গিয়ে দেখা কর্‌তে পারি; নতুবা আমার বাসা অমুক নম্বর শিবঠাকুরের গলি, সেখানে তোমাকে একবার আস্‌তে হবে।"

ইহার পর বিদ্যারত্ন ভায়া ও আমি দুইজনে বলাবলি করিতে লাগিলাম, "আমাকে যখন জানে, তখন আমি কি তন্ত্রের লোক তা'ও

জানে। আমার সঙ্গে ওর কি কাজ?" কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না, বড়ই আশ্চর্য্যবোধ হইল। আসিয়া আমার বন্ধু কেদার-নাথ রায়কে এই বিবরণ বলিলাম। তিনি এক সময়ে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক-দের মধ্যে কাজ করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "ও যখন ব্যাকুল হয়ে তোমাকে ডেকেছে, তখন নিশ্চয় কোন বিষয়ে তোমার সাহায্য চায়, চল একবার শিবঠাকুরের গলিতে ওর বাড়ীতে যাই।" এই নির্দ্ধারণ অনুসারে পরবর্ত্তী রবিবার প্রাতে আমরা দুজনে শিবঠাকুরের গলিতে তার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সেই বাড়ীটি এইরূপ স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ। তখন বেলা ৯টা, তথাপি তাহাদের অধিকাংশ ঘরে ঘরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। অনেকে উঠিয়াছে, প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে।

এই মেয়েটীর নাম থাকমণি। থাকমণি আমাদিগকে দেখিয়া আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়া গেল। সে বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাহার নিমন্ত্রণে আমি ঐরূপ স্থানে যাইব। তাহার ভাবে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখি-লাম। সে রাস্তাতে আমার সহিত কথা কহিবার সময়, হাসিয়া ঢলিয়া তুমি তুমি করিয়া কথা কহিয়াছিল, কিন্তু সেদিন আর-এক মূর্ত্তি ধরিল। আপনি ও আপনারা বলিয়া কথা আরম্ভ করিল; এবং অতি গম্ভীর ও অনুতপ্ত ভাবে আপনার জীবনের বিবরণ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই:—সে কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে এক ভদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের কন্যা। তাহার মাতা ও ভ্রাতা তখনও জীবিত আছেন; এবং সে বিপদে পড়িয়া প্রার্থনা করিলে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। বালক-কালে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বিবাহ হয়, তাহার অপর অনেকগুলি স্ত্রী ছিল, সে কখনও পতিগৃহে যায় নাই। কালে-ভদ্রে কখনও পতিকে দেখিয়াছে এই মাত্র। এইপ্রকার অবস্থায় সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, পাড়ার একজন পুরুষ তাহার পশ্চাতে

লাগিল এবং তাহাকে ফুস্‌লাইয়া কুলের বাহির করিয়া আনিল। এই অবস্থাতে সে তৎকালীন চোদ্দ আইনের ভয়ে, কিছুকাল ভবানীপুরের সেই নির্জ্জন স্থানে লুকাইয়া ছিল। সেখানে থাকিবার সময় সে আমাকে দেখিয়াছে ও আমার বিষয় অনেক কথা শুনিয়াছে। সেইখানে থাকিতে থাকিতে সে লক্ষীমণিকে দেখিয়াছে এবং ব্রাহ্মেরা কিরূপে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আমার গৃহে রাখিয়াছে তাহাও শুনিয়াছে; তাই তাহার শিশু কন্যাটীকে আমার হস্তে দিবার জন্য আমাকে ডাকিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মা ও ভাই আছেন, তাঁহাদের অবস্থা ভাল, তবে কেন তুমি এমন পথে পা দিলে?

থাক—বুঝতে পার্‌ছেন না, বাঁদ্‌রামি কর্‌বার জন্য।

আমি—এর মধ্যে তোমার বাঁদ্‌রামির আশ মিট্‌লো?

থাক—অনেক দিন মিটেছে, তবে কি করে ফির্‌ব, বাবার যো নেই, তাই ভাবি যার সঙ্গে ভেসেছি তাকেই আশ্রয় করে থাকি, তাই তাকেই আশ্রয় করে আছি, অন্য পুরুষ আস্‌তে দিই না।

আমি—এরূপ অবস্থাতে এটাও ভাল।

থাক—ভাল বটে, কিন্তু কষ্টও আছে। সে বেচারার স্ত্রী আছে, ছেলে-পিলে আছে, অল্প আয়, আমার সব খরচ দিয়ে উঠ্‌তে পারে না, আমাকে বড় কষ্টে থাক্‌তে হয়।

কেদার—তুমি ত লক্ষ্মী মেয়ে, এত কষ্টে থাক, তবু অন্যপুরুষ আস্‌তে দেও না।

থাক—ঘর থেকে পা বাড়িয়ে ত এক পাপ করেছি। আর পাপের মাত্রা বাড়িয়ে কি হবে? আমার যা হবার হয়েছে, এখন ভাবি মেয়েটাকে এ পথ হতে কি করে বাঁচাই? শাস্ত্রীমশাই আপনি লক্ষীমণিকে বাঁচিয়েছেন, তাই আপনার চরণে শরণাপন্ন হচ্চি।

আমি—তোমার মেয়ে যে এখনও মাই ছাড়ে নি। এত ছোট মেয়ে কি মা ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে?

থাক—সে একটা ভাবনার কথা বটে; তবে মনে হয় একটু ভালবাসা যত্ন পেলে ক্রমে মাকে ভুলে যাবে। আপনার স্ত্রীর ভালবাসার গুণে ও বশ হয়ে যাবে।

আমি—আচ্ছা আরও দুই তিন মাস যাক, মেয়েটা মাই ছাড়ুক, তখন নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাকে খবর দিও।

এই বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। হায়! সে আর খবর দিল না! ইহার পরে তাহার পীড়া হইয়া, সে বাসা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি মুঙ্গেরে চলিয়া গেলাম, তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাজে মাতিলাম, থাকমণি ও তাহার কন্যা স্মৃতি হইতে সরিয়া পড়িল। হয় ত তাহার মন বদলাইয়া গেল, না হয় আর আমার উদ্দেশ পাইল না। যে কারণেই হউক, থাকমণির উদ্দেশ আর পাইলাম না।

বোধ হয় এই ১৮৭৬।৭৭ সালের সময়েই আমার লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা সংগ্রহ করিয়া "পুষ্পমালা" নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। আমার মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি আমার নিজের বিশেষ প্রিয়, তন্মধ্যে পুষ্পমালা একখানি। ইহাতে আমার অনেক প্রাণের কথা আছে।

ক্রমে আমরা ১৮৭৭ সালে উপনীত হইলাম। এই সালের প্রথমে হরিনাভি সমাজের উৎসবে যাই। সেখানে ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মগণের সমাগম হয়। উক্ত অনুষ্ঠানক্ষেত্রে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। তাঁহার সরল অকপট অকৃত্রিম ভক্তি আমাকে মুগ্ধ করিত। তিনি তখন কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া বৈদ্যনাথ দেওঘরে বাস

করিতেছিলেন। আমি সেখানেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার বিমল সহবাসে কিয়ৎকাল যাপন করিবার জন্য যাইতাম। তিনি অতি পরিহাসরসিক আমোদপ্রিয় পুরুষ ছিলেন। আমিও তদ্রূপ, সুতরাং দুজনের একত্র সমাগম হইলে উভয়ের জিগীষা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিত। হাসিতে হাসিতে লোকের নাড়ীতে ব্যথা হইয়া যাইত। এবারেও হরিনাভিতে তাহা ঘটিল। একদিন রাত্রে সামাজিক উপাসনার পর আহারান্তে আমাদের দুইজনের গল্পের কাটাকাটিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল। ব্রাহ্মদের নাড়ীতে ব্যথা হইল। সেই কারণে হউক কি হরিনাভির ম্যালেরিয়াবশতই হউক আমি কলিকাতায় আসিয়াই জ্বরাক্রান্ত হইলাম। জ্বরের সঙ্গে রক্তকাশ দেখা দিল। একজন ডাক্তার বলিলেন হাঁপকাশের সূত্রপাত, কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলিলেন ক্ষয়কাশের সূত্রপাত। সেইরূপ চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। এই পীড়ার সময় আমার পূজনীয় জনক-জননী কি করিয়াছিলেন, এবং আমার বিশ্বাসী অনুগত ভৃত্য খোদাই কি করিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার উপযুক্ত। তৎপূর্ব্বে আট বৎসরকাল আমার পিতাঠাকুর মহাশয় আমার মুখদর্শন করেন নাই। প্রথম প্রথম আমাকে গ্রামে প্রবেশ করিতে দিবেন না বলিয়া গুণ্ডা ভাড়া করিতেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। শেষে সে প্রয়াস ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু আমি বাড়ীতে কোনও ঘরে আছি জানিলেই সে ঘরের দিকে যাইতেন না। পথে আমাকে দেখিলে সে পথ পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপ চলিতেছিল। আমি পীড়াতে পড়িয়া যখন বুঝিতে পারিলাম যে পীড়া কঠিন, আমার জীবনসংশয়, তখন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া উচিত মনে করিলাম। রোগশয্যায় পড়িয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। পীড়ার সংবাদ দিয়া লিখিলাম, "যদি উচিত বিবেচনা করেন, আসিয়া দেখা দিয়া আমাকে পদধূলি দিয়া যাইবেন। তাহা না হইলে এই

বিদায়, পরলোকে দেখা হইবে।” তৎপূর্ব্বে বাবা আমার চিঠিপত্র খুলিতেন না ও উপরে আমার হস্তাক্ষর দেখিলে ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। এ পত্র যে কেন পড়িলেন বলিতে পারি না। অনুমান করি লোকমুখে অগ্রেই আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন।

যাহা হউক একদিন প্রাতে আমার ভবনের দ্বারে গাড়ি আসিয়া লাগিল। প্রসন্নময়ী জানালা হইতে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিলেন, “বাবা ও মা আসিয়াছেন।” মা উপরে আসিলেন, কিন্তু বাবা আর সে ভবনে প্রবেশ করিলেন না। মা আমার রোগশয্যার পার্শ্বে আসিয়া কাঁদিয়া বসিয়া পড়িলেন। বাবা আসিলেন না কেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন তিনি কবিরাজ ডাকিতে গিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম বাবা আমার চিঠি পাইয়া মায়ের গহনা বন্দক দিয়া টাকা লইয়া আমার চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন না, আমার জ্ঞাতি-দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসাতে থাকিয়া আমার চিকিৎসা করাইবেন।

যথাসময়ে কবিরাজ আসিলেন। বাবা তাঁহাকে আমার ভবনে প্রবেশ করাইয়া দিয়া নিজে পথপার্শ্বে দোকানে বসিয়া রহিলেন। কবিরাজ আমাকে দেখিয়া গেলে তাঁহার মুখে সমুদয় শুনিলেন।

তাঁহার এই ব্যবহারে আমার চক্ষে কত জল পড়িল। তৎপূর্ব্বে এই আট বৎসর সংসারের আপদ বিপদে জ্ঞাতসারে আমার এক পয়সাও সাহায্য লন নাই। পরন্তু যদি কখনও জানিতে পারিয়াছেন যে, মায়ের হাত দিয়া গোপনে কিছু অর্থসাহায্য করিতে চাহিতেছি, তখন তুমুল কাণ্ড করিয়াছেন। তিনি আমাকে একেবারেই ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পতিত পুত্র যখন বিপদে পড়িয়া স্মরণ করিল, তখন আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সম্বল নাই। যে

সম্বল হাতের কাছে পাইলেন, তাহাই লইয়া ছুটিলেন। কি উদারতা! এই উদারতা তাঁহার প্রকৃতির এক মহা সদ্‌গুণ।

তিনি আসিয়া কয়েকদিন থাকিয়া এক স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া মাকে আমার পরিচর্য্যার জন্য সেই বাড়ীতে রাখিয়া গেলেন। মাতা-ঠাকুরাণী বিরাজমোহিনীকে ও আমাকে লইয়া সেই বাড়ীতে রহিলেন। মাতাঠাকুরাণীর জপ তপ ব্রত নিয়ম উপবাসাদির মাত্রা অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গেল। প্রায় প্রতিদিন দেড়মাইল পথ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন; এবং ইষ্টদেবতার চরণে শত শত প্রণাম করিয়া এই অধম পুত্রের জীবনভিক্ষা করিতেন। তৎপরে গৃহে ফিরিয়া আমারই রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মাটী দিয়া শিব গড়িয়া পূজাতে প্রবৃত্ত হইতেন। আমি শুইয়া শুইয়া তাঁহার পূজার নিষ্ঠা দেখিতাম।

ওদিকে বাবা মাকে আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া গ্রামের জ্ঞাতিকুটুম্ববর্গের মধ্যে কেহ কেহ দলাদলি আরম্ভ করিলেন। বাবা তখন বজ্রের ন্যায় কঠোর হইয়া দাঁড়াইলেন। একঘরে করে করুক, আমার কর্ত্তব্য কাজ আমি করেছি, বলিয়া সে দলাদলির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। এই দলাদলিতে কিছুদিন গেল।

এদিকে মা আমার সেবাতে বিব্রত। আমার প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় অতি সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি মায়ের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। তাঁর প্রতি আমাদের পরিবারস্থ সকলের ও জ্ঞাতিকুটুম্বের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁর লাঠি, তাঁর জপমালা, তাঁর যোগপট্ট প্রভৃতি যে কিছু চিহ্ন ঘরে ছিল সে-সমুদয়ের প্রতি মার এত ভক্তি যে, বাড়ীর কাহারও গুরুতর পীড়া হইলে, সেগুলি তাহার রোগশয্যাতে স্থাপন করা হইত, রোগমুক্তি না হইলে অন্তরিত করা হইত না। সেই নিয়মানুসারে জননী দেবী ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের লাঠি মালা প্রভৃতি

আনিয়া আমার শয্যাতে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনমাস সেইরূপ রহিল, অন্তরিত করিতে দিলেন না। আমার পীড়ার উপশম হইলে তবে তুলিয়া লওয়া হইল।

এই পীড়ার সময় আমার জনকজননীর যেমন আশ্চর্য্য সন্তানবাৎসল্য দেখিলাম, তেমনি আমার বিশ্বাসী অনুগত ভৃত্য খোদাইয়ের অদ্ভুত প্রভুভক্তির পরিচয় পাইলাম। খোদাইয়ের স্মৃতি আমার মনে পবিত্র প্রেমের উৎস-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে আমার "মেজবৌ" নামক উপন্যাসে অমর করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভবানীপুরে হেডমাষ্টারি করিবার সময় খোদাইকে রাখি। তখন হইতে তাহার গুণাবলি দেখিয়া আমার মন তাহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হয়। আমার প্রতিও তাহার প্রগাঢ় প্রীতি জন্মে। সে আমার হিতৈষী বন্ধু, ও পরিবার পরিজনের রক্ষক ছিল। আমি তাহার হাতে টাকা, কড়ি ও সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম।

আমার পীড়া হইয়া কর্ম্মস্থান হইতে বিদায় লইয়া অর্দ্ধবেতনে যখন আসিয়া রোগশয্যায় পড়িলাম, তখন খোদাইয়ের বেতন দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হইবে এই ভাবিয়া আমি আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমার রোগমুক্তি পর্য্যন্ত অধিক বেতনে তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া দিলাম। মা যখন আমাকে লইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিয়া আছেন, তখন একদিন প্রাতে দেখি খোদাই আসিয়া উপস্থিত।

আমি—কি খোদাই, তুমি যে এলে?

খোদাই—আপনার বেমারি বেড়েছে শুনে আমি আর থাক্‌তে পার্‌লাম না, কর্ম্ম ছেড়ে এসেছি।

আমি—ভাল কর নি, তোমাকে খেতে দেবে কে?

খোদাই—আপনি ভাববেন না, আমি বেতন চাই না। নারায়ণ

আপনাকে বাঁচায়ে তুল্‌লে আপনি পরে বেতন হিসাব করে দেবেন। আর আপনি যদি না উঠেন আমার বেতন থাক।

শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি কোন ক্রমেই এই সংকল্প হইতে তাহাকে ফিরাইতে পারিলাম না, সে থাকিয়া গেল।

তৎপরে মা চলিয়া গেলে আমি আমার পূর্ব্ব বাসায় গেলাম। তখনও ছুটীতে আছি; দিনের পর দিন যায়, দেখি প্রসন্নময়ী আমার নিকট সংসারখরচের টাকা চান না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, কে জানে খোদাই কোথা হতে চালাচ্ছে, সে বলেছে "মা, বাবুকে এখন বিরক্ত করো না, টাকা না থাক্‌লে আমাকে বলো।" পরে অনুসন্ধানে জানিলাম খোদাই আপনার গলার সোনার দানা বাঁধা দিয়া টাকা আনিয়া প্রসন্নময়ীর হাতে দিতেছে। ইহার পর আমরা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মুঙ্গেরে যাই। খোদাই আমাদের সঙ্গে যায়। সেখানে গিয়া তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। আমি তাহার সমুদয় ঋণশোধ করিয়া, তাহাকে টাকা দিয়া তাহার দেশে পাঠাইলাম। সেখানে গিয়া তাহার মৃত্যু হইল। সে যে কয় মাস জীবিত ছিল, আমি তাহার সমস্ত মাসিক বেতন তাহাকে পাঠাইয়া দিতাম। হায়, তাহাতে ত তাহার প্রেমের ঋণ শোধ হইল না। শুনিলাম মরিবার সময় নিজ সন্তানকে বলিয়া গেল, "যদি কখনও কাজ করতে কল্‌কেতায় যাস্ আমার বাবুর কাছে থাকিস।"

আমি ছুটী লইয়া বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য মুঙ্গেরে গেলাম। সেখানে গিয়াই এক বিপদ ঘটিল। মুঙ্গেরে বাড়ীগুলির দোতলার রেলিংগুলি বড় ছোট ছোট। আমাদের পঁহুছিবার পরদিন বৈকালে আমি কয়েকজন সমাগত বন্ধুর সহিত বসিয়া কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় দুম করিয়া একটা শব্দ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখি আমার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা

সরোজিনী এক বৎসর দশ মাসের বালিকা, সেই বাড়ীর বারাণ্ডার রেলিংয়ে উঠিয়া তাহা টপকাইয়া নীচের উঠানের পাথরের মেঝের উপর পড়িয়া গিয়াছে। সে আর কাঁদিল না, নড়িল না, পাথরখানার মত অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। দৌড়িয়া নীচে গিয়া তাহাকে কুড়াইয়া আনা গেল; চেতনা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা গেল; আর চেতনা হইল না। রাত্রি চারি দণ্ডের পর তাহার মৃত্যু হইল। বন্ধুরা তাহার মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে দাহ করিতে গেলেন। আমি প্রসন্নময়ীকে সবলে চাপিয়া ধরিয়া, সমস্ত রাত্রি শয্যায় শোয়াইয়া রাখিলাম; কারণ তিনি উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া রাস্তায় যাইতে চাহিতে লাগিলেন। আমি শোক করিব কি, সেই সংগ্রামে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। আমার শোক একটী কবিতাতে প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা পুষ্পমালাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সরোজিনীর মৃত্যুর পর আমি কিছুদিন মুঙ্গেরে থাকিয়া, পরিবার-দিগকে সেখানে রাখিয়া কলিকাতার কর্ম্মস্থানে আসিলাম। এই সময় হইতে প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী একত্র বাস করিতে লাগিলেন। আমিও পূর্ব্ব নিয়মানুসারে তাঁহাদের উভয় হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে লাগিলাম। এই সংগ্রামে অনেক দিন গিয়াছিল।

কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম কেশব বাবু তাঁহার পৈত্রিক ভবনের অংশ বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে মিস পিগটের স্কুলের বাড়ী ক্রয় করিয়া তাহার নাম কমল কুটীর রাখিলেন; এবং সেখানে কুচবিহারপক্ষীয় ঘটকদিগকে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দেখান হইল।

অপর দিকে এই সময়েই কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া আর-এক কার্য্যের সূত্রপাত করিলেন। তাঁহারা একটী ঘননিবিষ্ট দল সৃষ্টি করিবার জন্য উদ্‌যোগী হইলেন। এইরূপ স্থির হইল তাঁহারা কয়েকটী মূল সত্যকে জীবনের ব্রতরূপে অবলম্বন করিবেন, এবং তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া একটী ঘননিবিষ্ট দলে বদ্ধ হইবেন। তন্মধ্যে কয়েকটী সত্য প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রথম, তাঁহারা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। দ্বিতীয়, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিবেন না। তৃতীয়, পুরুষের ২১ বৎসর ও কন্যার ১৬ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দিবেন না বা সেরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করিবেন না। চতুর্থ, জাতিভেদ রক্ষা করিবেন না, ইত্যাদি। আমাকে আমন্ত্রণ করাতে আমি ঐ দলে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইলাম। একদিন বিশেষ উপা-

সনার দিন স্থির হইল। ঐ দিন বিশেষ উপাসনানন্তর প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া আগুন জ্বালিয়া ঈশ্বরের নাম লইতে লইতে তাহা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আমরা ঐ অগ্নিতে আমাদের নিজ নিজ নাম অর্পণ পূর্ব্বক, প্রার্থনানন্তর প্রতিজ্ঞাপত্র পুনরায় পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করিলাম। সুখের বিষয় যে ইহার পর আমি ও ঐ দলের আর-একজন গবর্ণমেণ্টের চাকুরী পরিত্যাগ করি এবং সেই-সকল প্রতিজ্ঞা চিরদিন পালন করিয়া আসিতেছি, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে কুচবিহার-বিবাহের আন্দোলন উঠিয়া সেই ঝড়ে আমাদের ক্ষুদ্র দলটী বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুগণ ঐ দলে ছিলেন। যতদূর স্মরণ হয় ময়মনসিংহের শরচ্চন্দ্র দাসও ঐ দিন উপস্থিত ছিলেন। যখন ইঁহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আগুনের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন এক আশ্চর্য্য বল ও আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে জাগিতে লাগিল। কুচবিহার-বিবাহের আন্দোলনে ইঁহারা সকলেই মহোৎসাহে কার্য্য করিয়াছিলেন।

এই সময় হইতে আমার গবর্ণমেণ্টের চাকুরী ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে দিবার প্রবৃত্তি, অতিশয় প্রবল হইল। কিন্তু সে চাকুরী ত্যাগ করিয়া অন্য চাকুরী লইবার ইচ্ছা আমার ছিল না। এ বিষয়ে আমি বন্ধুবর আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে পরামর্শদাতারূপে বরণ করিয়াছিলাম। আমার প্রচারকার্য্যে জীবন দেওয়ার বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ সায় ছিল, কিন্তু আমার একটা উপায় না করিয়া কর্ম্ম ছাড়া উচিত নয় বলিয়া তিনি বাধা দিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতে কুচবিহার-বিবাহের ঝটিকা উপস্থিত হইল, এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ভাঙ্গিয়া দুখান হইয়া গেল। ১৮৭৮ সালের জানুয়ারীর প্রারম্ভে কুচবিহারের ম্যাজিষ্ট্রেট, আমার

প্রাচীন পরিচিত যাদবচন্দ্রচক্রবর্ত্তী মহাশয়, নাবালক রাজার বিবাহের বিষয়ে সমুদয় কথা স্থির করিবার জন্য ভার প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাতে আসিলেন। কাশীর সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয় তখন কলিকাতাতে বাস করিতেছিলেন। বন্ধুতাসূত্রে আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভবনে যাইতাম, সেখানে যাদব বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। আমি তাঁহার মুখে শুনিলাম যে কেশব বাবু কন্যার বিবাহোপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে তাহাকে বিবাহ দিতে রাজি হইয়াছেন; কি কি নিয়মে বিবাহ হইবে, সেই-সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সে-সকল কথাবার্ত্তার প্রকৃতি কি তাহা তিনি আমাকে বলেন নাই। ক্রমে শুনিলাম যে পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য কুচবিহার হইতে রাজপুরোহিত আসিতেছেন। ক্রমে কি কি বিষয় স্থির হইল তাহাও প্রকারান্তরে আমাদের কর্ণগোচর হইল। জানিলাম যে কন্যার ও বরের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই বিবাহ হইবে, তবে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিবেন; কেশব বাবু জাতিচ্যুত বলিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কন্যা সম্প্রদান করিবেন। রাজপরিবারের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে, কেবল তাহাতে দেবদেবীর নামের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরের নাম লিখিত হইবে, রাজপুরোহিত বিবাহ দিবেন; ইত্যাদি।

আবার ইহাও শুনিলাম যে যাদব বাবু বিবাহের প্রস্তাব লইয়া দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের ভবনে গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ব্রহ্মময়ী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "না, না, আমার মেয়ের রাজারাজ্‌ড়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে না। প্রথম ত ছেলে অপ্রাপ্তবয়স্ক, তারপর রাজারাজ্‌ড়ার সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাল নয়, আমার ছেলেমেয়েরা রাণী বোনের সঙ্গে ভাল করে মিশ্‌তে পারবে না।" যাদব বাবু সেখান হইতে নিরাশ হইয়া আসিয়া কেশব বাবুর কাছে গিয়াছেন।

এই সংবাদে কলিকাতার ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমরা স্থির করিলাম যে এই সঙ্কটে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত সত্য-সকলকে জোর করিয়া ধরা আমাদের কর্ত্তব্য এবং তাহা করিবার জন্য কেশব বাবুর কার্য্যের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। যে কেশব বাবু মহা আন্দোলনের পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বরকন্যার বিবাহের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই তাহা ভাঙ্গিতে যাইতেছেন, ইহা কেমন কথা? সুতরাং এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত কার্য্যপ্রণালী রক্ষা করিবার জন্য জোরে দাঁড়ান কর্ত্তব্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বন্ধুভাবে একবার কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমুদায় কথা তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিবার চেষ্টা করা উচিত। তদনুসারে একদিন আমরা তিন বন্ধু মিলিয়া কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। যাইবার দিন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। তিনি বিশেষ কোনও সংবাদ দিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আমি সবে বোম্বাই হইতে আসিয়াছি, আমি কোনও সংবাদ জানি না। তোমরা কেশব বাবুর কাছে যাও, আমিও পশ্চাতে আসিতেছি।" আমরা গিয়া কেশব বাবুর সহিত কথা কহিতেছি, তিনিও আসিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। কেশব বাবু কোনও মতেই বিশেষ সংবাদ দিতে চাহিলেন না। বলিলেন "এখন কোনও সংবাদ দিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "এই সংবাদে ব্রাহ্মদের মন অতিশয় উত্তেজিত, আপনার উচিত আমাদিগকে সকল সংবাদ দেওয়া। লোকে ত আপনার নিকট আসে না, আমাদিগকেই পথে ঘাটে ধরে, আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে। আমরা উত্তর দিতে পারি, লোককে শান্ত করিতে পারি, এমন সংবাদ আমাদের কাছে থাকা আবশ্যক।" তিনি কোনক্রমেই কিছু বলিলেন না। অবশেষে আমি বলিলাম,—"আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, আপনারা খাস্তগির মহাশয়ের কন্যার

বিবাহে তাঁহাকে কিরূপ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা মনে আছে। তাঁহার ঘাড়ের মাস ছিঁড়িয়া খাইয়াছিলেন। আপনার কন্যার বিবাহে ব্রাহ্মদের অবলম্বিত কোনও নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ব্রাহ্মেরা ছাড়িবে না।” যেই এই কথা বলা, অমনি কেশব বাবু বিরক্ত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া টেবিলের উপর উঠিয়া বসিলেন, কাঁধে একখানা গামছা ছিল, তাহা মাথায় বাঁধিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “আমারও ঘাড়ের মাস ছিঁড়ে খাবে তার আর কি?” আমি পূর্ব্বে কখনও তাঁহাকে এত উত্তেজিত দেখি নাই। দেখিয়া মনে হইল আর তাঁহাকে বিরক্ত করা উচিত নয়। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, “আপনি বিরক্ত হইতেছেন, তবে এ কথা থাক।” এই বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।

অতঃপর আমাদের দলে মন্ত্রণা চলিল। এইবার “সমদর্শী” দল, স্ত্রীস্বাধীনতার দল, নিয়মতন্ত্রের দল, সকল দল এক হইল। এমন কি বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মহাশয় পর্য্যন্ত আমাদের দলে যোগ দিলেন। সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত। আমাদের মনে কি দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষাতে বর্ণনা করিবার নহে। আনন্দমোহন বাবু তখন মুঙ্গেরে পরিবার রাখিয়া আসিয়া হাইকোর্টের নিকট আপনার চেম্বারে বাস করিতেন। আমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইতাম। এবং দুজনে বসিয়া হায় হায় করিতাম। এমন কতদিন গিয়াছে, আমি তাঁহার কোচে বসিয়া আছি তিনি কোটের দুই পকেটে দুই হাত দিয়া গভীর চিন্তান্বিতভাবে সেই একটুকু ঘরের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাদচারণা করিতেছেন; দুজনের মুখেই কথা নাই, বহুক্ষণ পরে এক একবার কোচের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, “শিবনাথ বাবু, কি হবে? কি করা যায়?”

অবশেষে স্থির হইল যে সকলে একদিন একত্র বসা আবশ্যক।

তদনুসারে ৯৩ কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের হলে একদিন রাত্রে সকলে বসা গেল। কেশব বাবুকে কিছু বলা উচিত কি না, যদি বলা হয় কি বলা হইবে, কে কে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এই বিচারে রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। স্থির হইল, একখানি প্রতিবাদপত্রে কয়েক ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া কেশব বাবুর হাতে দেওয়া হইবে। কিন্তু সেই গভীর রাত্রে বন্ধুদ্বয় দুর্গামোহন দাস ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি বলিলেন, যে, "এই প্রতিবাদপত্র প্রেরণের অনিবার্য্য ফল—কেশব বাবু তাহার সমুচিত ব্যবহার না করিলে স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাহা করিতে তোমরা প্রস্তুত আছ কি না?" আনন্দ মোহন বাবু ও আমি বলিলাম—"স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা এখনও আমাদের মনে নাই, সে বিষয়ে কথা দিতে পারি না। যেটুকু আপাততঃ কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে তাহাই করিতে যাইতেছি। ফলাফল জানি না।" দুর্গামোহন বাবু বলিলেন—"ছেলেখেলার মধ্যে আমরা নাই। যারা আমাদের সঙ্গে সমগ্র পথ যাইতে প্রস্তুত নন, তাঁদের সঙ্গে স্বাক্ষর করিব না।" এই বলিয়া তিনি ও দ্বারি বাবু চলিয়া গেলেন।

ইঁহারা দুইজনে চলিয়া গেলে প্রতিবাদপত্রে উল্লেখ্য বিষয়গুলি স্থির হইয়া গেল। পরদিন হইতে তাহাতে বিশিষ্ট ব্রাহ্মদিগের স্বাক্ষর লওয়া হইতে লাগিল। সকলের ভক্তিভাজন শিবচন্দ্র দেব মহাশয় স্বাক্ষরকারীদের অগ্রণী হইলেন। কি জানি কি ভাবিয়া দুর্গামোহন বাবু ও দ্বারি বাবু দুই দিন পরে উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এদিকে ৯ই ফেব্রুয়ারি দিবসের ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকাতে কুচবিহার-বিবাহ সুনিশ্চিত বলিয়া প্রকাশিত হইল। সেই দিবসই আমাদের নিযুক্ত তিন ব্যক্তি ২৩জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত ঐ পত্র কেশব বাবুকে দিয়া আসিলেন। কেশব বাবুর প্রচারক কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাহা লইয়া-

ছিলেন। আমরা পরে শুনিলাম, কেশব বাবু তাহা না পড়িয়া পা দিয়া দলাইয়াছিলেন এবং ছিঁড়িয়া ছেঁড়া কাগজের বাক্সে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের স্বাক্ষর যাহাতে আছে, সে পত্র কেশব বাবু পা দিয়া দলাইয়াছেন শুনিয়া আমরা মনে বড়ই ক্লেশ পাইলাম। সেই দিন মনে বুঝিলাম এ বিবাদ সহজে মিটিতেছে না।

আমরা কেশব বাবুর নিকট প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিয়াই তাহা মুদ্রিত করিয়া মফঃস্বলের সকল সমাজে প্রেরণ করিলাম ও তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। চারিদিক হইতে কেশব বাবুর হস্তে প্রতিবাদপত্র আসিতে লাগিল।

এদিকে আমার জীবনের দ্বিতীয় সঙ্কট উপস্থিত। প্রথম সঙ্কট গিয়াছিল, উপবীত ত্যাগের সময়; দ্বিতীয় সঙ্কট আসিল, কর্ম্ম ছাড়িবার সময়। আমি সেই বিশেষ প্রতিজ্ঞার দিন হইতে গবর্ণমেণ্টের চাকুরী ছাড়িব বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে দিব এই সঙ্কল্প ছিল। সে জন্য কেশব বাবুর ভারতাশ্রমে গিয়াছিলাম। এখন সেই সঙ্কল্প আবার মনে জাগিয়া মনকে অস্থির করিয়া তুলিল। আবার আমি সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হইতে লাগিলাম। একদিকে কত চিন্তা, কত বিভীষিকা মনে আসে; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে, যাহাদের মুখ চাহিব এরূপ কেহ কোথাও নাই; বৃদ্ধ পিতা-মাতার কথা মনে হইতে লাগিল। তাঁহারা চিরদারিদ্র্যে বাস করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের একমাত্র পুত্র, তাঁহাদের দারিদ্র্যদুঃখ ঘুচিবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার দুই স্ত্রী ও শিশু পুত্র কন্যা, তাহাদিগকেই বা কে দেখিবে? আমার সংসারভার বহন করিব কিরূপে? এই চিন্তায় মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজের এই নব আন্দো-

লম আমাকে ঘেরিয়া লইতে লাগিল; আমার ধ্যানে জ্ঞানে প্রবেশ করিতে লাগিল; আমি স্কুলের কাজেও ভাল করিয়া মন দিতে অসমর্থ হইতে লাগিলাম। কি করি কি করি এই চিন্তাতে কয়েক দিন গেল। আমি আর ভাল করিয়া আহার করিতে পারি না বা ভাল করিয়া নিদ্রা যাইতে পারি না। এই উদ্বেগের মধ্যে হজমশক্তি খারাপ হইয়া শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে আমার চিরদিনের বিপদের বন্ধু যে ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা তাহার শরণাপন্ন হইলাম। জীবনের প্রধান প্রধান সঙ্কটে ব্যাকুল প্রার্থনা আমার জন্য আলোক আনয়ন করে, আমি ঈশ্বরের বাণী শুনি। একদিন বড় ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিতে বসিলাম। সে প্রার্থনার মর্ম্ম এই—"নিষিদ্ধ প্রণয়ে আসক্তা নারী যেমন তাহার প্রেমাস্পদের জন্য পিতা মাতা গৃহ পরিবার আত্মীয়-স্বজন সকল ছাড়িয়াও আপনার অলঙ্কারের বাক্সটি সঙ্গে লয়, কিন্তু আবশ্যক হইলে তাহাও পথে ফেলিয়া চলিয়া যায়, তেমনি আমি সকল ছাড়িয়াও যেটা ধরিয়া আছি, হে ভগবান, আবশ্যক হইলে সেটাও ছাড়াইয়া আমাকে লইয়া যাও।" এই প্রার্থনার পর "ছাড়" "ছাড়" বাণী আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। বন্ধুগণের অনেকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি যে আর বিলম্ব করিতে পারি না। একটা দিন যায়, যেন এক বৎসর যায়। মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে সে বৎসরের বোনাস্ (Bonus) স্বরূপ স্কুলফণ্ড হইতে অনেক-গুলি টাকা পাইতে পারিতাম। শিক্ষক বন্ধুগণ সেজন্য বারবার অপেক্ষা করিতে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তরের বাণী অপেক্ষা করিতে দিল না। ১৫ই ফেব্রুয়ারি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের হস্তে পদত্যাগপত্র দিয়া বাঁচিলাম। ১লা মার্চ্চ হইতে স্বাধীন হইয়া এই আন্দোলনে ডুবিলাম। তদবধি ঈশ্বর আমার ভার সমুচিতরূপে বহিয়া আসিতেছেন।

আমি তাঁহার করুণার কথা আর কি বলিব। তিনি যে কিরূপে আমার সকল অভাব পূরণ করিয়া আসিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যে-সকল অভাব আমার কল্পনারও অতীত ছিল, তাহাও তিনি পূরণ করিবার উপায় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধন্য তাঁর কৃপা !

এদিকে আমরা আন্দোলন চালাইবার জন্য "সমালোচক" নামে এক সাপ্তাহিক কাগজ ও তৎপরেই Brahmo Public Opinion নামক ইংরাজি কাগজ বাহির করিলাম। দুর্গামোহন বাবু ও আনন্দমোহন বাবু উক্ত উভয় কাগজের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্গামোহন বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনমোহন দাস মহাশয় ইংরাজি কাগজের এবং আমি বাংলা কাগজের সম্পাদক হইলাম। তাহাতে চারিদিকের ব্রাহ্মগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল।

কেশব বাবু ব্রাহ্মগণের প্রতিবাদের প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া কন্যা লইয়া কুচবিহারে বিবাহ দিতে গেলেন। কুচবিহারে আমাদের লোক ছিল, তাঁহার নিকট হইতে আমরা সমুদয় ভিতরকার সংবাদ পাইতে লাগিলাম এবং সমালোচকে সারস পাখীর উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলাম। সংবাদ পাওয়া গেল, প্রথম, কেশব বাবু কন্যা সম্প্রদান করিতে পাইলেন না ; দ্বিতীয়, বিবাহে রাজপুরোহিত ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করিলেন, গৌরগোবিন্দ রায় উপস্থিত ছিলেন মাত্র, কিছু করিতে পান নাই ; তৃতীয়, বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারিল না ; চতুর্থ, বিবাহে অগ্নি জালিয়া হোম হইল, বর সেখানে থাকিলেন, কন্যাকে উঠাইয়া লওয়া হইল ; পঞ্চম, বিবাহস্থলে রাজকুলের প্রথানুসারে হরগৌরী নামক দুইটি পদার্থ স্থাপন করা হইল, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বন্ধুগণের বহু প্রতিবাদসত্ত্বেও তাহা অন্তর্হিত করা হইল না, ইত্যাদি।

এই-সকল সংবাদ প্রচার হওয়ায় কলিকাতাতে ও অপরাপর স্থানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঘোর আন্দোলন পাকিয়া দাঁড়াইল। আমরা গভীর চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। আমাদের বন্ধু-গোষ্ঠীতে এই পরামর্শ স্থির হইল যে এই মহা বাত্যার মধ্যে কাণ্ডারীর কাজ করিবার জন্য সমাজের বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি লইয়া "ব্রাহ্মসমাজ কমিটি" নামে একটা কমিটি নিয়োগ করা ভাল। তাঁহারা লোকের ভাব অবগত হইবেন, তাঁহারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন, তাঁহারা আন্দোলনকে চালাইবেন, ইত্যাদি। এই কমিটি নিয়োগের মানসে আমরা মীটিং করিবার জন্য কেশব বাবুর নিকট আলবার্ট হল চাহিলাম, কারণ তিনি উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনুমতি দিলেন; কিন্তু আমরা মীটিং করিতে গিয়া দেখি, যে গ্যাস জ্বালিবার হুকুম নাই। কারণ শোনা গেল যে এলবার্ট হল ব্যবহার করিতে চাওয়াতে কেশব বাবু তাহার সম্পাদকরূপে সভা করিবার অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু গ্যাসের আলো ব্যবহার করিবার অধিকার না চাওয়াতে তাহা দেন নাই। ইহা লইয়া মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইল। শত শত ভদ্রলোক, যতদূর স্মরণ হয় কতিপয় নারীও তার মধ্যে ছিলেন। সভাস্থলে সমাগত লোকেরা অন্ধকারে বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। সভার উদ্যোগকর্ত্তৃগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি বাজার হইতে বাতি কিনিয়া আনা হইল। কিন্তু অপর পক্ষীয় কতকগুলি যুবক এত চীৎকার ও গালাগালি করিতে লাগিল যে মীটিং করিতে পারা গেল না। তৎপরে টাউন হলে ব্রাহ্মদের মীটিং করিয়া "ব্রাহ্মসমাজ কমিটি" নিয়োগ করা হয়।

এই "ব্রাহ্মসমাজ কমিটি"র নিয়োগ সম্বন্ধে একটা কথা স্মরণ আছে। রিজোলিউসনটা লিখিবার সময় কোন কোনও বন্ধু এমন কঠিন ভাষা ব্যবহার করিতে চাহিলেন, যাহা ব্যবহার করার পর, আর কেশব বাবুর

সহিত একত্র থাকা সম্ভব নয়। আমি ও আনন্দমোহন বাবু তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলাম—"আমরা এখনও এমন কথা বলিতে পারি না যে কেশব বাবুকে ছাড়িবই, সুতরাং এমন কথা লেখা হইবে না যাহাতে আমাদিগকে ছাড়িতে বাধ্য করে।" আমাদের আপত্তিতে ভাষাটা নরম করিয়া দেওয়া হইল।

এদিকে আমি বড় নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে "সমালোচক" তুলিয়া লইয়া দ্বারি বাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, সে সময়ে দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ৯৩ কলেজ ষ্ট্রীটে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তিনি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির সহিত একযোগে সমালোচনের ভার লইলেন।

কেশব বাবু কন্যার বিবাহ দিয়া কলিকাতাতে ফিরিয়া আসিলেন, সহরে ব্রাহ্মদলে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেশব বাবু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। উক্ত সমাজের মীটিং ডাকিবার জন্য শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ ব্রাহ্মগণের এক (requisition) আবেদনপত্র তাঁহার নিকট গেল। কেশব বাবু মীটিং ডাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। সে মীটিং ডাকার উপায় রহিল না। কেশব বাবুকে আচার্য্যের পদ হইতে অপসৃত করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর মীটিং ডাকিবার অনুরোধ করিয়া এক আবেদন গেল। কেশব বাবু সে আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না। তদনুসারে মীটিং ডাকা হইল না। কিন্তু কেশব-বাবু আবেদনকারীদের আবেদনের উল্লেখ না করিয়া নিজের নামে এক মীটিং ডাকিলেন। যে বিজ্ঞাপনে তাহা ডাকা হইল তাহা অদ্ভুত। Babu Keshub Chunder Sen will propose that Babu Keshub Chunder Sen be deposed। এরূপ অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম আমরা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক যথাসময়ে দলে-

বলে আমরা সভাতে উপস্থিত হইলাম। কার্য্যারম্ভেই মহা গোলযোগ উঠিল। সভাপতি হন কে? কেশব বাবুর বন্ধুরা তাঁহাকে সভাপতি করিতে চাহিলেন, আমরা বলিলাম তাহা কিরূপে হয়? যাঁর কার্য্যের বিচার করিবার জন্য মীটিং, তিনি কিরূপে সভাপতি হন? আমরা দুর্গামোহন বাবুকে সভাপতি করিতে চাহিলাম, তাঁহারা রাজি হইলেন না। কে সভাপতি হইবেন এই বিচার লইয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। শেষে কেশব বাবু দুর্গামোহন বাবুকে সভাপতি করিতে রাজি হইলেন। কিন্তু ভোট দিবার সময় কে সভ্য কে সভ্য নয় এই বিচার আবার উঠিল। কেশব বাবুর বন্ধুগণ বিরোধীদলের অনেকের সম্বন্ধে আপত্তি করিতে লাগিলেন। যাহা হউক অবশেষে কেশব বাবুর সম্মতিক্রমে দুর্গামোহন বাবুকে সভাপতি করা হইল। তদনন্তর কেশববাবু নিজের পদচ্যুতি সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিলেন। দুর্গামোহন বাবু সভাপতিরূপে সে প্রস্তাব উত্থাপনের ভার আমার প্রতি অর্পণ করিলেন। আমি যেই প্রস্তাব করিতে দাঁড়াইলাম, অমনি কেশববাবু সদলে সভা ত্যাগ করিয়া গেলেন। এদিকে সেনবংশীয় বালকগণ ও তাহাদের বালক-বন্ধুগণ চীৎকার ও গোলমাল করিতে লাগিল।

আমরা সেই গোলমালের মধ্যে কয়েকটী নির্দ্ধারণ (resolution) পাস করিলাম। একটির দ্বারা কেশব বাবুকে আচার্য্যের পদ হইতে নামান হইল, অপরটীর দ্বারা কয়েকজন আচার্য্য নিয়োগ করা হইল।

এই গেল বৃহস্পতিবারে। পরবর্ত্তী রবিবারে সংবাদ আসিল যে কেশব বাবু মন্দিরের দ্বারে চাবি দিয়াছেন, এবং মন্দির রক্ষার জন্য কয়েকজন অনুচরকে তন্মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়াই দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ভায়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত, "চলুন আমরাও ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারে তালা চাবি দিয়া আসি। মন্দির ত আমাদেরও, কারণ সকলে

মিলিয়া টাকা দিয়াছি, কেশব বাবু একলা কেন বলপূর্ব্বক অধিকার করিবেন?" আমি এসব বিবাদে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, তিনি অপর দুইজন বন্ধুকে লইয়া তালাচাবি দিতে গেলেন। সেই তালাচাবি দেওয়ার ব্যাপার এক কৌতুককর ঘটনা। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ও দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী তালাচাবি লইয়া গেটে উপস্থিত হইয়া দেখেন তাহাতে তালাচাবি লাগান আছে, এবং ভিতরে কেশব বাবুর কয়েকজন অনুগত শিষ্য রহিয়াছেন। ইঁহারা গিয়া গেটের নিকট দাঁড়াইবামাত্র তাঁহারা ছুটিয়া অপরদিকে আসিলেন। তর্ক বিতর্ক ও বাগবিতণ্ডা আরম্ভ হইল। ইঁহারা বলিলেন, "মন্দির তো কেবল আপনাদের নয়, আমাদেরও। আপনারা কেন বলপূর্ব্বক অধিকার করিবেন? আপনারা ভিতরে চাবি দিয়াছেন আমরা বাহিরে দিব।" এই বলিয়া দ্বারি বাবু ও দেবীপ্রসন্ন বাবু চাবি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশব বাবুর বন্ধুগণ ভিতর হইতে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হাত ঠেলাঠেলি, ধরাধরি, হুড়াহুড়ি চলিল। এই টানাটানির অবস্থাতে ভিতরকার কেশব-শিষ্যগণের একজনের হাতে বোধ হয় গেটের লোহার রেলের আঘাত লাগিয়া থাকিবে। বাহিরে কথা উঠিল, প্রতিবাদীরা হাতে কাম্‌ড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। ইহা লইয়া হাসাহাসি ও সংবাদপত্রে কিছুদিন ঠাট্টা তামাসা চলিয়াছিল।

এই সংবাদ সহরে ছড়াইয়া পড়াতে সেইদিন বৈকালে মন্দিরের দ্বারে সহরের লোক জড় হইল। আমাদের পক্ষীয় বন্ধুরা আবার সাজিয়া-গুজিয়া আপনাদের নিযুক্ত আচার্য্য রামকুমার বিদ্যারত্নকে সঙ্গে লইয়া বেদী অধিকার করিবার জন্য গেলেন। আমাকে সঙ্গে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করাতেও আমি গেলাম না। ব্রহ্মোপাসনার অধিকার

স্থাপন করিতে যাওয়া আমার ভাল লাগিল না। বন্ধুরা গিয়া দেখেন, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত অপরাহ্ণ ৪টা হইতে বেদী অধিকার করিয়া বসিয়া শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। তাঁহারা স্থিরভাবে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে উপাসনার ঘণ্টা বাজিল, অঘোর বাবু নামিতেছেন, ওদিকে বিদ্যারত্ন ভায়া অগ্রসর হইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে তাঁহার কাছা ধরিয়া টানিয়া রাখিল। ওদিকে কেশববাবু পুলিশ-পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়া বেদী অধিকার করিলেন। অমনি প্রতিবাদীর দল, প্রায় ৭০।৮০ জন, মন্দির ত্যাগ করিয়া আসিলেন। আমি তখন মন্দিরের পার্শ্বে আমার পরিচিত এক বন্ধু ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে কি হয় জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, লজ্জা ও সঙ্কোচবশতঃ প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে যাই নাই। প্রতিবাদীর দল মন্দির হইতে তাড়িত হইয়া ডাক্তার বন্ধুর বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া আমি ব্রহ্মোপাসনা করিলাম।

এই আমাদের স্বতন্ত্র উপাসনা আরম্ভ হইল; উপাসনান্তে প্রতিবাদকারীদল আবার মন্দিরে অধিকার স্থাপন করিতে গেলেন। আমি সে সঙ্গে গেলাম না। শুনিলাম কেশব বাবুর উপাসনা তখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার উপাসনা শেষ হইবামাত্রই প্রতিবাদকারী দল নীচে বসিয়াই সংগীত আরম্ভ করিলেন। যেই তাঁহাদের সঙ্গীত আরম্ভ হওয়া অমনি উমানাথ গুপ্ত প্রভৃতি কেশব বাবুর কয়েকজন অনুগত শিষ্য "দয়াল বল জুড়াক হিয়ারে" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ও খোল করতালের ধ্বনি করিতে করিতে ধাবিত হইয়া আসিলেন এবং অপর পক্ষের সংগীত চাপা দিয়া ফেলিলেন। পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কালীনাথ বসু সদলে আসিয়া প্রতিবাদকারী দলের মানুষদিগকে বাছিয়া বাছিয়া ধরিয়া মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন। এই ঘটনা এমনি শোচ-

নীয় হইয়াছিল, যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক কোণে চক্ষু মুদিয়া উপাসনার ভাবে ছিলেন; প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে দেখাইয়া পুলিশকে বলিলেন, "এই একটা বদমায়েস।" তাঁহাকে ধরিয়া বাহির করা হইল।

ইহার পরে চিঠিপত্র চালাচালিতে কিছু দিন গেল। ওদিকে ব্রাহ্ম-সমাজ কমিটি সমুদায় বিবরণ দিয়া কলিকাতার ও মফঃস্বলের ব্রাহ্মগণের অভিপ্রায় জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অধিকাংশই স্বতন্ত্র সমাজ-স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে পরবর্ত্তী ২রা জ্যৈষ্ঠ দিবসে টাউন হলে ব্রাহ্মদিগের সভা ডাকিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল।

এই বিবাদের বিষয় ভাবিতেও ক্লেশ, লিখিতেও ক্লেশ, কিন্তু বিবাদটা যখন ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে, তখন সে বিষয়ে যতটা স্মরণ হয়, লিখিয়া রাখা ভাল বলিয়া লিখিলাম। দলাদলিতে মানুষকে কিরূপ অন্ধ করে তাহা দেখাইবার জন্য একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই অংশের উপসংহার করিতেছি।

এই গোলমালের মধ্যে আমাদের দলে যিনি যিনি লেখনী ধারণ করিতে জানিতেন তাঁহারা সকলেই কেশব বাবুর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে লাগিলেন। আমি "এই কি ব্রাহ্মবিবাহ" নাম দিয়া এক পুস্তিকা লিখিলাম। পূর্ব্বোক্ত ঘননিবিষ্ট মণ্ডলীর সভ্য বজ্রযোগিনী-নিবাসী আনন্দচন্দ্র মিত্র সুকবি বলিয়া সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; তিনি এই সময়ে কুচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিলেন। এ সংবাদ আমরা জানিতাম না। তাহা যে আমার বন্ধু কেদারনাথ রায়ের প্রেসে ছাপা হইতেছে তাহাও জানিতাম না। যখন বাহির হইল, তখন একখানা আমার হাতে পড়িল। আমি দেখিলাম তাহাতে অতি লঘুভাবে কেশব বাবুকে

ও তাঁহার দলকে আক্রমণ করা হইয়াছে। বিশেষ অপরাধের কথা এই, আচার্য্যপত্নীকে তাহার মধ্যে আনিয়া তাঁহার প্রতিও লঘুভাবে শ্লেষ-বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। আমি আচার্য্যপত্নীকে মনে মনে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম। আমি দেখিয়া জ্বলিয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ আনন্দ মিত্রকে ডাকাইয়া, কেদারকে অনুরোধ করিয়া, ঐ পুস্তিকা প্রচার বন্ধ করিয়া দিলাম। দিয়া মিরার আফিসে গিয়া কেশব বাবুর দলস্থ প্রচারক বন্ধুদিগকে বলিয়া আসিলাম, "যদি ঐ পুস্তিকা তাঁহাদের হাতে পড়ে কিছু যেন মনে না করেন। আমরা অগ্রে জানিতাম না, পরে জানিয়া উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছি।" হায়, হায়, দলাদলিতে মানুষকে কি অন্ধ করে। ইহার পরও তাঁহারা বিরোধী দলের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করিলেন, যে, তাহারা নাটক লিখিয়া আচার্য্য-পত্নীর প্রতি লঘুভাষা প্রয়োগ করিয়াছে। আবার এই কথা এরূপ ভাবে লিখিলেন, যেন আমিই ঐ নাটক লিখিয়াছি। তখন আমি লজ্জাতে মরিয়া গেলাম। এরূপ দলাদলির মাথায় ধর্ম্ম টেকে না। আমরা সেই যে ধর্ম্ম হারাইয়াছি, তাহার সাজা এতদিন ভোগ করিতেছি, আর কত-দিন ভোগ করিব, ভগবান জানেন। ব্রাহ্মসমাজ এতদ্দ্বারা লোক-সমাজে যে হীন হইয়াছে, তাহা আজিও সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মসমাজের অধঃপতন আমাদের পাপের শাস্তি।

নবম পরিচ্ছেদ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে যাহা কিছু করিয়াছি তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এখন ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে কিরূপে ঈশ্বর এই ঘূর্ণীপাকের মধ্যে আমাকে আনিয়া ফেলিলেন, তাঁহার বাণী আমাকে কিরূপে অধিকার করিল। আমার প্রকৃতিনিহিত দুর্ব্বলতা কতবার আমাকে তাঁহার প্রদর্শিত পথ হইতে ও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কাজ হইতে দূরে লইতে চাহিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে দূরে যাইতে দিলেন না। যেন আমার চুলের টিকি ধরিয়া আমাকে বাঁধিয়া রাখিলেন।

এরূপ মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াও আমার সুখাসক্তচিত্ত বহুদিন সুখের প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারে নাই; বারবার আত্মবিস্মৃতির ও ঈশ্বর-বিস্মৃতির মধ্যে পড়িয়া সুখের পশ্চাতে ছুটিয়াছে। বলিতে কি এই আন্তরিক সংগ্রামের জন্যই আমার দ্বারা যতটা কাজ হইতে পারিত তাহা হইতে পারে নাই। আমি বহুবৎসর যেন দুই হাত দিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে পারি নাই, এক হস্ত প্রবল প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রামে আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে এবং যেন অপর হাত দিয়া ঈশ্বরের সেবা করিয়াছি। সময় সময় মনে হইয়াছে আমার মত দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রতি প্রধান কার্য্যের ভার না থাকিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ভাল হইত। ইহার প্রতি লোকের আরও শ্রদ্ধা জন্মিত। বাস্তবিক এতদিন পরে যতই চিন্তা করিতেছি ততই মনে হইতেছে যে, যেরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, তাহার গুরুত্ব যেন বহুদিন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই, সমুচিত দায়িত্বজ্ঞান যেন জাগে নাই। বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে উৎসাহের

সহিত নানা কাজে ছুটিয়াছি, ধীর চিত্তে নিজের প্রকৃতির দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিবার ও তদুপরি উঠিবার আয়োজন করিবার সময় পাই নাই; কাজকর্ম্মে অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধ্যে নিবিষ্ট চিত্তে ধর্ম্মজীবনের গাঢ়তা ও গভীরতা সাধন করিবার সময় পাই নাই। কতবার মনে করিয়াছি, দূর হোক্ সরিয়া পড়ি, সকলের পশ্চাতে থাকিয়া উৎসাহ দান দ্বারা কার্য্য করি, কিন্তু ঘটনার পর ঘটনার স্রোতে আমাকে টানিয়া সম্মুখে লইয়াছে। ঈশ্বর আমাকে দূরে বা পশ্চাতে যাইতে দেন নাই। সে-সকল কথা আর ভাঙ্গিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। এখন সে-সব সংগ্রাম চলিয়া গিয়াছে। যে প্রবৃত্তিসর্প মধ্যে মধ্যে আমাকে বেষ্টন করিয়া শক্তিহীন করিত ঈশ্বর তাহাকে হত করিয়া আমাকে মুক্তি দিয়াছেন। তিনি যাহা করেন তাহাই ভাল, আমাকে যে এতদিন কঠিন সংগ্রামে রাখিয়াছিলেন, তাহাও মঙ্গলের জন্য। যে-সকল বলদ পথে চলিতে চলিতে উভয় পার্শ্বের তৃণ গুল্ম খাইতে চায়, তাহার মুখে চাম্ড়ার ঠুলি দিয়া চাবুকের উপর চাবুক লাগাইয়া তাহাকে সোজা পথে চালাইতে হয়। বিধাতা তেমনি করিয়া আমাকে তাঁহার সেবার পথে আনিয়াছেন! ধন্য তাঁর মহিমা! দর্পহারী ভগবান আমার দর্প চূর্ণ করিবার জন্যই সময়ে সময়ে আমার মনঃকল্পিত অভিমান-মন্দির ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিয়াছেন, নতুবা আমার দম্ভ-প্রবণ প্রকৃতি অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া থাকিত। তিনি আমাকে কি শিক্ষাই দিয়াছেন! আর একটা কথা। আমি যদি নিজে প্রলুব্ধ না হইতাম, যদি নিজে সংগ্রামের মধ্যে না পড়িতাম, কোন্ পথ দিয়া মানুষ অধঃপাতে যায় তাহার আভাস যদি না পাইতাম, তাহা হইলে কি প্রলুব্ধ ও অধঃপতিত নরনারীকে সমবেদনা দিতে পারিতাম? বুদ্ধিমান গৃহস্থ যেমন যে ছেলেকে কোনও বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক করিতে চান, তাহাকে সেই বিষয়ের সিঁড়ির নিম্নতম ধাপ হইতে পা পা করিয়া

তুলিয়া থাকেন; তাহার ভ্রম, দুঃখ, প্রলোভন, সংগ্রাম, সমুদয় তাহাকে দেখাইয়া থাকেন; তেমনি মুক্তিদাতা বিধাতা তাঁহার যে দাসকে অপরের সাহায্যের জন্য নিযুক্ত করেন, তাহাকেও ভাল মন্দ দুই দেখাইয়া থাকেন। বিচিত্র তাঁহার বিধাতৃত্ব, ধন্য তাঁহার করুণা!

এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা বলি। প্রথম বক্তব্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নাম কিরূপে হইল? আমরা যখন স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করি. তখন আমাদের মনে দুইটা ভাব প্রবল ছিল। প্রথম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একনায়কত্ব দেখিয়াছি, কেশব বাবু সর্ব্বেসর্ব্বা, এখানে তাহা হইবে না, এখানে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে কার্য্য হইবে। দ্বিতীয়, কেশব বাবু ব্রাহ্মগণের ও ব্রাহ্মসমাজ-সকলের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে তাহা হইবে না, এখানে সভ্যগণের ও সমাজ-সকলের মত গ্রহণ করিয়া কার্য্য হইবে।

আমাদের মনে এই দুইটী প্রধান ভাব ছিল, সুতরাং আমরা সমাজের নিয়মাবলী প্রণয়নের সময় এই দুইটী বিষয়ই সমাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রধানরূপে লিখিয়া দিয়াছিলাম। ধর্ম্মবিষয়ে যে কোনও নূতন মত, বা ধর্ম্মজীবনের কোনও নূতন আদর্শ যে স্থাপন করিতে হইবে, তাহা আমাদের লক্ষ্যস্থলে ছিল না। বরং আমাদের ভাব এই ছিল যে, আমরাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত কার্য্য করিতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামটা যে কেমন করিয়া উঠিল ঠিক মনে নাই। যতদূর স্মরণ হয়, আমাদের প্রধান ভাবের দ্যোতক বলিয়া, আমাদের উৎসাহী বন্ধু পরলোকগত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই নামটার উল্লেখ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনকর্ত্তাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। এক্ষণে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন বিষয়ে ও ইহার প্রথম নিয়মাবলী নির্ণয় বিষয়ে অনেক

সহায়তা করিয়াছিলেন। এমন কি এই সময়ে তাঁহার এক পুত্রের নামকরণ হইল, তাহার নাম "সাধারণচন্দ্র" রাখিলেন। নাম শুনিয়া আমরাই হাসিলাম, অপরে হাসিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি।

এই হাসাহাসির একটা কথা মনে আছে। নামকরণ অনুষ্ঠান হইতে ফিরিবার সময় আমি আনন্দমোহন বাবুর গাড়িতে আসিতেছিলাম। সাধারণচন্দ্র নাম লইয়া গাড়িতে খুব হাসাহাসি হইতে লাগিল। আনন্দ-মোহন বাবু বলিলেন, "আমার ছেলের নাম দিবার সময় তার নাম "অনুষ্ঠানপদ্ধতিচন্দ্র" রাখিব"।

নূতন সমাজের নামটা কি হয়, নামটা কি হয়, আপনাদের মধ্যে কিছুদিন এই আলোচনা করিয়া অবশেষে একদিন কতিপয় বন্ধু মিলিয়া আমরা মহর্ষির চরণ দর্শন করিতে গেলাম। তিনি তখন চুঁচুড়া সহরে গঙ্গাতীরস্থ এক ভবনে একাকী বাস করিতেছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামটা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে। আমাদের সমাজের নাম আদি সমাজ—আমরা কালে আছি, কেশব বাবুর সমাজের নাম ভারতবর্ষীয় সমাজ—তাঁরা দেশে আছেন, তোমরা দেশ-কালের অতীত হইয়া যাও।" সেখান হইতে আমরা নূতন সমাজের নাম সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ রাখা স্থির করিয়া আসিলাম। সেই নামই রাখা হইল। কিন্তু এই নাম রাখিয়া তিন দিকে তিন প্রকার ফল ফলিল। প্রাচীন ব্রাহ্ম-দিগের অনেকে এ নাম পছন্দ করিলেন না, তাঁহাদের চক্ষে যেন কেমন হাল্কা হাল্কা বোধ হইতে লাগিল। ছেলে-ছোক্‌রার ব্যাপার—হট্ট-গোল, এই ভাব তাঁহাদের মনে আসিতে লাগিল। এই কারণেই বোধ হয়, প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন আশা করা গিয়াছিল, তাঁহাদের অনেকে তেমন করিয়া যোগ দিলেন না, দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এই নাম লওয়াতে বাহিরের

লোকে মনে করিল, এ সমাজ কাহারও বিশেষ সম্পত্তি নয়, সাধারণের সম্পত্তি, এখানে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকার আছে। এই কারণে বাহিরের লোকের মধ্যে কেহ মন্দিরের দ্বারে গোলযোগ করিলে যদি তাহাতে বাধা দেওয়া যাইত, তবে তাহারা বলিয়া উঠিত, "এটা যে সাধারণ সমাজ, এখানে আবার বাধা দেও কেন?" আমরা শুনিয়া হাসিতাম। তৃতীয় ফলটি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। এই নামের প্রভাবে, যাহারা ইহার সভ্য হইলেন, তাঁহাদের মনে নিরন্তর এই কথা জাগিতে লাগিল যে ব্যক্তিগত প্রাধান্তে বাধা দেওয়াই এ সমাজের প্রধান কাজ। কর্ম্মচারীদিগের কাজের সহায়তা করা অপেক্ষা তাঁহাদের কাজের দোষ প্রদর্শন করা ও তাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে সংযত করাই যেন সভ্যদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। এই ভাব লইয়া কার্য্যারম্ভ করাতে প্রথম প্রথম কিছু-দিন আমাদের পক্ষে কর্ম্মচারী পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বার্ষিক সভাতে কার্য্যবিবরণ উপস্থিত হইলে সভ্যগণ এ ভাবে বসিতেন না যে অবৈতনিক কর্ম্মচারিগণ যিনি যতটা কাজ করিয়াছেন, সে জন্য ধন্যবাদ করিয়া ভবিষ্যতে আরও ভালকাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু সভ্যগণ এই ভাবে উৎকর্ণ ও উৎশৃঙ্গ হইয়া বসিতেন যে কার্য্যবিবরণে কোথায় কি ত্রুটি আছে তাহা বাহির করিতে হইবে এবং কোথায় কি ভ্রম প্রমাদ আছে তাহা লইয়া কাড়াছেঁড়া করিতে হইবে। বহুবৎসরে এই ভাব অনেক পরিমাণে গিয়াছে। কিন্তু সেই উৎকর্ণ ও উৎশৃঙ্গ ভাব, সেই ব্যক্তিগত শক্তির নামে ত্রাস, সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে অতিরিক্ত মাত্রার ঝোঁক, সেই কার্য্যে একতা অপেক্ষা প্রতিবাদ-পরায়ণ-তার ভাব এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভাব বলিলে সভ্যগণের মধ্যে মতবিরোধ দোষ-প্রদর্শনেচ্ছা প্রভৃতি বুঝায়। ইহা অনেক পরিমাণে ঐ নাম গ্রহণের ফল বলিয়া বোধ হয়।

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলেই আমার শ্রম অতিশয় বাড়িয়া গেল। প্রথমতঃ, ইহার অগ্রণী ব্যক্তিগণ ইহার নিয়মাবলী প্রণয়নে ও মফঃস্বল সমাজসকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যস্ত হইলেন। এ কাজে তাঁহাদের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় থাকিতে হইত ; দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র "ব্রাহ্ম পাব্লিক ওপিনিয়নের" ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিবার ও সহকারী সম্পাদকতা করিবার এবং "তত্বকৌমুদী" পত্রিকার সমগ্র সম্পাদকতা করিবার ভার লইতে হইত। এই "তত্ব-কৌমুদীর" প্রকাশ ও পরিচালনের ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল। আমরা কয়েকমাস পূর্ব্বে "সমালোচক" নামে যে কাগজ বাহির করিয়া-ছিলাম, এবং যাহা বন্ধুগণ আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বন্ধুবর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়াছিলেন, তাহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র করা উচিত বোধ হইল না। সে নামটা ভাল লাগিল না এবং যে ভাবে তাহা চলিতেছে, তাহারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ হইল। তাই তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন ব্রাহ্মবন্ধুকে দিয়া আমরা নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের নামে এক নূতন কাগজ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নূতন কাগজের নাম কি হয়, কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল "কৌমুদী"। আদিসমাজের কাগজের নাম তত্ত্ববোধিনী ; ভারতবর্ষীয় সমাজের কাগজের নাম "ধর্ম্মতত্ব"। শেষোক্ত দুই কাগজ হইতে "তত্ব" এবং রাজা রামমোহন রায়ের "কৌমুদী" লইয়া আমাদের কাগজের নাম হউক "তত্বকৌমুদী"। আমার মনের ভাব ছিল যে রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বজনীন মহাধর্ম্মের ভাব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে তত্বকৌমুদী তাহাই প্রচার করিবে। অনেক দিন এরূপ হইত তত্বকৌমুদীর প্রত্যেক

পংক্তি আমাকে লিখিতে হইত। সাহায্য করিবার কাহাকেও পাইতাম না। এক এক দিন এমন হইয়াছে, দুই পত্রিকা একদিনে বাহির হইবার কথা। প্রত্যূষে স্নান ও উপাসনান্তে প্রেসে বসিয়াছি, ব্রাহ্ম পাব্‌লিক ওপিনিয়নের কাজ সারিয়া তত্ত্বকৌমুদীর কাজ, তত্ত্বকৌমুদীর সে কাজ সারিয়া ব্রাহ্ম পাব্‌লিক ওপিনিয়মের কাজ, এইরূপ সমস্ত দিন চলিয়াছে। মধ্যে এক ঘণ্টা আহার করিয়া লইয়াছি। কাজ সারিয়া রাত্রি দশটাতে শয্যাতে যাইবার কথা, কিন্তু তখনই হয়ত নিয়মাবলী-প্রণয়ন কমিটিতে গিয়া বসিতে হইল। একদিনের কথা স্মরণ আছে, যে দিন প্রাতে ৬টার সময় বসিয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত একদিনে এক পুস্তিকা রচনা করিলাম, তাহার নাম "এই কি ব্রাহ্মবিবাহ?"

ওদিকে প্রথম নিয়মাবলী প্রণয়নের ব্যাপার এক মহা শ্রমসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিল। এক আনন্দমোহন বসু ব্যতীত আমরা আর সকলেই নিয়মতন্ত্রপ্রণালী বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলাম। তিনিই এ বিষয়ে আমাদের সারথি হইলেন; তাঁহার ভবনে নিয়মাবলী-প্রণয়ন কমিটির অধিকাংশ অধিবেশন হইত। সে-সকল অধিবেশনে চিন্তারও শেষ ছিল না, তর্কেরও শেষ ছিল না। কিরূপ নিয়মপ্রণালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, কিরূপে অতীত কালের ভ্রমপ্রমাদ আর না ঘটে, কিরূপে ব্রাহ্মগণের মধ্যে একতা স্থাপিত হয়, কিরূপে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আবার শক্তিসঞ্চার হয়, এই-সকল চিন্তা সকলেরই মনে প্রবল থাকিত। তৎপরে নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি মফঃস্বল সমাজসকলে প্রেরিত হইয়া চারিদিক হইতে প্রস্তাবসকল আসিতে লাগিল। সেইসকলের বিচারের জন্য দিনের পর দিন কমিটির অধিবেশন হইতে লাগিল। আমি হাসিয়া আনন্দমোহন বাবুকে বলিতাম,—"এ কমিটি তো কমিটি রৈল না, এ যে বেশীটি হয়ে গেল।" একদিনের কথা মনে আছে। সে দিন প্রাতে ৬টা হইতে

অপরাহ্ণ ৬।। টা পর্য্যন্ত আমি ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন ও তত্ত্বকৌমুদীর কাজে মগ্ন আছি, সন্ধ্যার সময় আনন্দমোহন বাবুর পত্র আসিল যে সেই দিন নিয়ম-প্রণয়ন কমিটিতে আমার থাকা চাই। তদুত্তরে আমি লিখিলাম যে "আমাকে বাদ দিয়া কাজ করুন। আমি প্রাতঃকাল ৬টা হইতে এই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজে মগ্ন আছি।" তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, আমাকে যাইতেই হইবে। রাত্রিকালের আহার ও শয়ন তাঁহার গৃহেই হইবে। সেখানে গিয়া আহার করিয়া আমরা ৯।।টার সময় নিয়ম-প্রণয়ন কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। নিয়মাবলীর বিচার করিতে করিতে রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। আমি আর বসিতে পারি না। নিদ্রাতে চক্ষুর্দ্বয় অভিভূত হইয়া আসিতেছে। অবশেষে বন্ধুদিগকে প্রশ্ন-বিশেষের বিচারে অভিনিবিষ্ট দেখিয়া আমি অজ্ঞাতসারে আনন্দমোহন বাবুর ডিনার টেবিলের নীচে নামিয়া পড়িলাম ও ম্যাটিঙ্গের উপর শুইয়া শুইয়া নিদ্রিত হইলাম। প্রায় ৩টা রাত্রির সময় আমার অনুপস্থিতি তাঁহাদের লক্ষ্যস্থলে পড়িল। তখন আমার অন্বেষণ আরম্ভ হইল। আমি কিছুই জানি না, অঘোরে ঘুমাইতেছি। অবশেষে আনন্দমোহন বাবু টেবিলের নীচে উঁকি মারিয়া দেখেন আমি ঘুমাইতেছি। তখন মহা হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তখন তিনি আমার দুই ঠ্যাং ধরিয়া টানিয়া আমাকে বাহির করিলেন, এবং উঠিয়া চলিয়া চক্ষে জল দিয়া নূতন প্রস্তাব শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

এখানে আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন ও ইহার কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ বিষয়ে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তাঁহাকে প্রথম সভাপতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা সমুচিত হইয়াছিল। তিনি এ সময়ে সারথি না হইলে আমরা যাহা করিয়া তুলিয়াছি, তাহা

করিয়া তুলিতে পারিতাম না। তিনি এ সময়ে কি পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনও ভুলিবেন না। বলিতে কি তিনি এই সময় ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মস্তিষ্ক, আর আমি ছিলাম দক্ষিণ হস্ত। দুজনে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করিতাম, তাহাই আমি কার্য্যে করিতাম। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, যে, ১৮৭৪ সালে তাঁহার বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের দিন অবধি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমি এমন কিছু করি নাই যাহা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া করি নাই; অথবা তিনি এমন কিছু করেন নাই, যাহা আমার সহিত পরামর্শ করিয়া করেন নাই। এই অবিচ্ছিন্ন যোগ, এই অকৃত্রিম মিত্রতা চিরদিন বিদ্যমান ছিল। আমি কত রাত্রি তাঁহার ভবনে যাপন করিয়াছি, শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত কেবল ব্রাহ্মসমাজের কাজের কথা; অবশেষে রাত্রি দুইটা বা তিনটার সময় তাঁহার গৃহিণীর তাড়া খাইয়া দুইজনে শুইতে গিয়াছি। আনন্দমোহন বাবু মীটিংএ আসিতেছেন শুনিলেই আমাদের ভয় হইত আজ আর রাত্রি দুইটার পূর্ব্বে মীটিং ভাঙ্গিবে না; কাজের অন্ত থাকিবে না, কথারও অন্ত থাকিবে না, নিজে উঠিবেন না, আমাদিগকেও উঠিতে দিবেন না। বাস্তবিক তাঁহার হাত ছাড়াইয়া কেহ উঠিতে পারিতেন না; কেহ উঠিতে চাহিলেই তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া দুই হাত দিয়া ধরিয়া তাঁহাকে জোরে বসাইয়া দিতেন, বলিতেন—"আর একটু বসুন, এইবার সকলে উঠ্‌ব।" সেই যে বসা আবার দুই তিন ঘণ্টার ব্যাপার। তাঁহার গৃহিণীর মুখে শুনিতাম, এই সময় তিনি মাম্‌লা মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিলেই বলিতেন, "এগুলো যেন কালসাপ, দেখ্‌লেই ভয় হয়, পেটের দায়ে ব্যারিষ্টারি করা।" হাইকোর্টের এটর্নিরা আমাকে বলিতেন—"হায়রে! এমন শক্তি থেকেও কাজে তেমন হলো না। বোস একবার বলুন যে, তিনি স্থির হয়ে সহরে থাক্‌বেন, আমরা

তাঁর ফার্ষ্ট প্রাক্‌টিস করে দিচ্চি।" বসুজ মহাশয় সেদিকে মন দিতেন না। তিনি মফঃস্বলে গিয়া কিছু অধিক উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া বসিতেন, যেন ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিবার সময় পান। এই তাঁর কার্য্যের রীতি ছিল। কতবার ইচ্ছা করিয়াছেন যে, অনন্যকর্ম্মা হইয়া দেশের হিত-সাধনে লাগেন, কেবল বৃহৎ পরিবারের পালন চিন্তাতে পারিয়া উঠিতেন না। এমন অকৃত্রিম বিনয়, এমন বিমল ঈশ্বরপ্রীতি, এমন অকপট স্বদেশানুরাগ, এমন স্বজনপ্রেম, এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আমি মানুষে অল্পই দেখিয়াছি। বড় সৌভাগ্য, ভগবানের বড় কৃপা, যে, এমন মানুষকে বন্ধু-রূপে পাইয়াছিলাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়ার পর কয়েক মাস ইহার কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে গেল। প্রথম নিয়মাবলী প্রণয়ন, সকল সমাজে তাহার পাণ্ডুলিপির প্রেরণ, সকলের মতসংগ্রহ ও তাহার বিচার, একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, সমাজের পত্রিকা-পুস্তকাদির মুদ্রণ ও প্রচার, ইত্যাদি কার্য্যে আমাকে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতে হইল।

এইরূপে কয়েকমাস অতীত হইলে অবশেষে সমাজের কমিটি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে মন দিবার সময় পাইলেন। চারি ব্যক্তিকে আপনাদের প্রধান প্রচারকরূপে মনোনীত করিলেন। সে চারি ব্যক্তি এই—(১ম) পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, (২য়) পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, (৩য়) বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ, (৪র্থ) আমি।

ইহার মধ্যে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত। অগ্রেই বলিয়াছি তিনি সংস্কৃত কলেজে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, এবং আমাকে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে আকৃষ্ট করিবার পক্ষে তিনি এক প্রধান কারণ ছিলেন। নরপূজার প্রতিবাদের পর কেশব বাবুর সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া তিনি আবার প্রচারকার্য্যে রত হইয়া-

ছিলেন। ১৮৭১।৭২ সালে ভারত-সংস্কার সভা ও তদধীনে দাতব্য বিভাগ ও বয়স্থা-বিদ্যালয় ও ভারতাশ্রম স্থাপিত হইলে তিনি স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্য জ্ঞান না করিয়া বয়স্থা-বিদ্যালয়ের পাঠনা কার্য্যে ও বেহালা নামক গ্রামের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে দাতব্য ঔষধ বিতরণ কার্য্যে প্রধানরূপে আপনাকে নিযুক্ত করেন। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান ও উপাসনান্তে ঔষধাদি লইয়া ছয় সাত মাইল উত্তীর্ণ হইয়া বেহালাগ্রামে ঔষধাদি বিতরণ করিতে যাইতেন। সেখান হইতে দ্বিপ্রহর ১২টা কি ১টার সময় আসিয়া আহার করিতেন, আহারান্তে ২টার পর বয়স্থা-বিদ্যালয়ে পাঠনা কার্য্যে রত হইতেন। তৎপরে অনেক দিন দেখিতাম রাত্রে মেয়েদের জন্য পুস্তক রচনাতে প্রবৃত্ত হইতেন। আমি বার বার সতর্ক করিতাম, তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। এরূপ শ্রম আর কতদিন সয়? একদিন বুকে একপ্রকার বেদনা হইয়া গোঁসাইজী অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই বুকের ব্যথা থাকিয়া গেল। তাহা নিবারণের জন্য বহুমাত্রাতে মর্‌ফিয়া সেবন ভিন্ন উপায় রহিল না। এজন্য অতিরিক্ত মাত্রাতে মর্‌ফিয়া সেবন করা গোঁসাইজীর অভ্যস্ত হইয়া গেল। সেই মর্‌ফিয়ার মাত্রা ক্রমে অসম্ভব রূপে বাড়িয়াছিল। ইহার পরে গোঁসাইজী বাঘআঁচড়া গ্রামকে তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র করিয়া সেখানে অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। বাঘআঁচড়া হইতেই তিনি কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ করেন। তদনন্তর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনকর্ত্তাদিগের সহিত তাঁহার যোগ হয়। তিনি আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রচারক হইলেন।

বিদ্যারত্ন ভায়া পূর্ব্ব হইতেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে আসিলেন না। তাঁহার শ্বশুর একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন,

এবং বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেন। তিনি বোধ হয় বালিকা কন্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গে আসিতে দিলেন না। যে কারণেই হউক তাঁহার পত্নী জ্ঞানদা অনেক বৎসর আমাদের কাছে আসেন নাই। সুতরাং বিদ্যারত্ন ভায়া নিজ শ্বশুরের ন্যায় স্বাধীনভাবে নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সমদর্শীদলের সহিত কেশব বাবুর দলের মিশ খাইতেছে না দেখিয়া তিনি আর সে দিকে ঘেঁসিলেন না, স্বাধীন ভাবেই কার্য্য করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন ও তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে তিনি ইহার উৎসাহী প্রচারকদিগের মধ্যে একজন হইলেন, সুতরাং তাঁহাকেও মনোনীত করা হইল।

বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ ইতিপূর্ব্বে আসামে বিষয়কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। এই সময় বিষয়কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে মুঙ্গের সহরে আমার পরিবারগণের সহিত বাস করিতেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইলে, তাঁহারও প্রচারকদলে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইল। তিনিও মনোনীত হইলেন।

প্রচারকপদে মনোনীত হইয়াই আমরা নানাদিকে প্রচারকার্য্যার্থ বহির্গত হইলাম। আমি বেহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিকে যাত্রা করিলাম। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী তখন সন্তানদিগকে লইয়া মুঙ্গেরে বাস করিতেছিলেন, আমি প্রথমে সেখানে গেলাম। সেখানে দ্বারকানাথ বাগচী নামে একজন সুগায়ক ব্রাহ্মবন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তিনি আমার অনুরোধে বিষয়কর্ম্ম হইতে ছুটী লইয়া আমার সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। আমরা সে বারে কোন্ কোন্ স্থানে কি কি বিশেষ কাজ করি তাহার সকল স্মরণ নাই। বোধ হয় অন্যান্য স্থানের মধ্যে উত্তর বেহারের নেপাল-

প্রান্তবর্ত্তী মতিহারী সহরে গিয়াছিলাম। তখন মতিহারী যাইবার রেল ছিল না। মজঃফরপুর হইতে ৫০ মাইল একা চড়িয়া যাইতে হইত। এই আমার প্রথম একা গাড়িতে চড়া। দেখিলাম এই একা গাড়ি এক অদ্ভুত যান, একটা ঘোড়াতে টানে, চালকের পশ্চাতে আরোহীর বসিবার আসন, সে একজন-যোগ্য আসন, দুইজনের ভাল স্থান-সমাবেশ হয় না, আসনের উপরে ঠাকুর-চৌকির চূড়ার ন্যায় একটু আচ্ছাদন, তাহাতে জল বৃষ্টি রৌদ্র ভালরূপ বারণ হয় না; চাকাতে স্প্রিং নাই, খটাখট্ ওঠে ও পড়ে; অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে কোমরে ব্যথা হয়; ছুটিলে চাকার শব্দে কর্ণ বধিরপ্রায় হয়। তাহার উপরে আবার অনেক গাড়িতে দুই চাকাতেই করতাল বাঁধা থাকে, চাকার খড়খড়ানি ও করতালের ঝনঝমানিতে আর কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না। গাড়িতে চড়িয়া মনে হইল করতাল বাঁধিয়া ভালই করিয়াছে, আরোহী যে বাপরে মারে করিবে তাহা চালক শুনিতে পাইবে না; তার গাড়ি চালানর ব্যাঘাত হইবে না।

এই একা গাড়িতে দুইদিনে মতিহারী পৌছিলাম। প্রথম দিন কিয়দ্দূর গিয়া অচেতনপ্রায় এক দোকানে পড়িলাম, মনে করিলাম আর প্রাতে উঠিতে পারিব না। কিন্তু প্রাতে দেখি কোমরের ব্যথা অনেক কমিয়াছে, আবার যাত্রা করিলাম। মতিহারীতে কয়েক দিন থাকি। সেখানে আরও দুইবার গিয়াছি। সেখানে সকল সম্প্রদায়ে মিলিয়া এক মহাবিচার হয়, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি। এবারে কি পরবারে ঘটিয়াছিল, তাহা বিশেষ স্মরণ নাই। ব্যাপারখানা এই—

আমি গিয়া এক বন্ধুর বাড়ীতে অবস্থিত হইলাম। দুইদিন পরে সেখানকার আর্য্যসমাজের সম্পাদক আসিয়া আমার সঙ্গে বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিলেন।

আমি—একটা অভ্রান্ত শাস্ত্র এত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন কেন?

সম্পাদক—মানবের ধর্ম্মজীবনের ন্যায় গুরুতর বিষয়ে কি ভ্রান্তিশীল মানববুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায়?

আমি—বেদের অভ্রান্ততা মানিয়াও ভ্রান্তিশীল মানববুদ্ধির হাত এড়াইতে পারিতেছেন না। বেদের অর্থ সায়ন এক প্রকার করিয়াছেন, দয়ানন্দ সরস্বতী আর-এক প্রকার করিয়াছেন। কে আমাকে বলিয়া দিবে কোন্ অর্থ ঈশ্বরের অভিপ্রেত অর্থ? এখানেও ভ্রান্তিশীল মানব-বুদ্ধিকে বিচারকরূপে দুই ব্যাখ্যাকর্ত্তার উপরে বসাইতে হইতেছে। অভ্রান্ত শাস্ত্র দিলে, অভ্রান্ত টীকাকর্ত্তাও দিতে হইবে, নতুবা ভ্রান্তিশীল মানববুদ্ধির হাত এড়ান যাইবে না। তৎপরে দেখিয়াছি, দয়ানন্দ এদেশে অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া পূজিত অনেক অংশ বর্জ্জন করিয়াছেন, কতকগুলি শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কতকগুলি শাস্ত্র নয় বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন, ইহা কোন্ প্রমাণে? তাহাও ভ্রান্তিশীল বুদ্ধির বিচারের দ্বারা। তবেই ভ্রান্তিশীল বুদ্ধির হাত হইতে নিস্তার নাই।

বিচারটা এই মূল ভিত্তির উপরেই চলিল। সেদিন সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পরদিন আবার বিচার হইবে এইরূপ কথা রহিল। ইতিমধ্যে সহরে জনরব প্রচার হইল যে, কলিকাতা হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক আসিয়াছে, অভ্রান্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে বিচার চলিতেছে। তৎপরদিন যথাসময়ে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকল শ্রেণীর লোক আসিয়া উপস্থিত। বিচারস্থলে মানুষ ধরে না। আবার সেই পূর্ব্বদিনের তর্ক উঠিল। আমি ছিনাজোঁকের মত আমার আসল কথাটা ধরিয়া আছি, অভ্রান্ত টীকাকার না দিলে, অভ্রান্ত শাস্ত্র দেওয়া বৃথা, ইহা হইতে আর নড়ি না। তাঁহারাও আর ইহার জবাব দিয়া উঠিতে পারেন না; তর্কের

ডালপালা বিস্তার করেন মাত্র। খুব তর্ক বাধিয়াছে, এমন সময় একদল হিন্দু সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা তীর্থদর্শন করিয়া হিমালয় হইতে বারাণসী অভিমুখে যাইতেছেন। সহরে আসিয়া শুনিয়াছেন, অমুক স্থানে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মহা বিচার উপস্থিত; তাই কৌতূহলবশতঃ আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছেন। এই সন্ন্যাসীদলের নেতার নাম ফণীন্দ্র যতি, দেখিলাম মানুষটি বুদ্ধিমান ও সংস্কৃতজ্ঞ। আমি তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তখন তাঁহাতে ও আমাতে বিচার চলিল। এই স্থির হইল যে আমাদের দলের কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিবেন না, তাঁহাদের দলের কেহ প্রশ্ন করিলে আমি উত্তর দিব না, প্রশ্ন করিতে হইলে আমার বা তাঁর দ্বারা করিতে হইবে। একজনের বক্তব্য শেষ না হইলে অপরে কথা কহিবেন না। অতঃপর বিচারটা ধীরে ধীরে চলিল। সেদিনও শেষ হইল না। স্থির হইল যে পরদিন স্কুলের মাঠে সন্ধ্যার সময় বিচার হইবে। তৎপরদিন আবার সকল সম্প্রদায়ের লোক স্কুলের মাঠে সমবেত হইল। চন্দ্রালোকে ঘাসের উপর বসিয়া বিচার চলিল। এরূপ বিচারে কি কিছু স্থির হয়? উভয় পক্ষের কেহই ছাড়িবার নহে। অবশেষে রাত্রি ১১টার সময় অভ্রান্ত-শাস্ত্র-পক্ষীয়েরা "স্বামীজীকি জয়, স্বামীজিকি জয়" করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। তাহাতে আমার দলের কে একজন বলিয়া উঠিলেন, "কুত্তেকো ভুঁক্‌নে দেও।" এই কথা স্বামীর দলের লোকের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাহারা লাঠি সোটা লইয়া মারিতে উদ্যত। তখন ফণীন্দ্র যতি ও আমি মাঝখানে পড়িয়া থামাইয়া দিলাম। ইহার পরে দুই একদিনে ফণীন্দ্র যতীর সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা জন্মিল। আমি কখনও কাশীতে গেলে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন।

মতিহারী হইতে ফিরিয়া আমরা বাঁকীপুর, আরা, এলাহাবাদ হইয়া

লক্ষ্ণৌ যাই। লক্ষ্ণৌ গিয়া টেলিগ্রাম পাইলাম যে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা কলিকাতাতে অত্যন্ত পীড়িতা। মুঙ্গেরে পরিবারদিগকে প্রেরণ করিবার সময় শিক্ষার জন্য একটী বন্ধুর তত্বাবধানে তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া গিয়াছিলাম। এই সংবাদ পাইয়া লক্ষ্ণৌএর কাজ বন্ধ করিতে হইল ও কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল। আসিবার সময় মুঙ্গের হইতে প্রসন্নময়ীকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম, বিরাজমোহিনী অন্য সন্তানগণের ভার লইয়া মুঙ্গেরেই থাকিলেন।

আমি কলিকাতাতে ফিরিয়া তত্বকৌমুদীর সম্পাদকতা, উপাসক মণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্য, এই সকল লইয়া ব্যস্ত রহিলাম। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ত্যাগ করার পর তৎপার্শ্ববর্ত্তী ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসুর ভবনে কিছুদিন আমাদের উপাসনা চলে। উপেন্দ্র বাবু এই সঙ্কটকালে আমাদের সহায় হইয়া তাঁহার ঠাকুর-দালানটি আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়া মহোপকার করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেনে একটি সুপ্রশস্ত ঘর ভাড়া করিয়া সেখানে আমাদের সাপ্তাহিক উপাসনা তুলিয়া আনা হয়। এই সময়ে সেইখানেই উপাসনার কার্য্য চলিতেছিল। আমি আসিয়া দেখিলাম বন্ধুগণ ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একখণ্ড ভূমি নির্দ্ধারণ করিয়া সেখানে উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিতেছেন এবং সেজন্য প্রত্যেকে নিজের এক মাসের আয় দিবেন বলিতেছেন। আমি সে কার্য্যে মহা উৎসাহী হইলাম। শুনিলাম অর্থ সাহার্য্যের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট এক দরখাস্ত গিয়াছে, তাহাতে আনন্দমোহন বাবুর, আমার, দুর্গামোহন বাবুর, মহলানবীশ মহাশয়ের ও অপর কাহারও কাহারও স্বাক্ষর আছে। আমি আসিয়া শুনিলাম যে মহর্ষি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে খবর লইতে বলিয়াছেন, জমির দাম কত,

মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয় কত হইবে, ট্রষ্টী কারা নিযুক্ত হইয়াছেন, ইত্যাদি। বোধ হইল যেন তিনি ট্রষ্টী নিয়োগের পূর্ব্বে টাকা দিবেন কি না, কাহার হাতে দিবেন, কত দিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। একদিন আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন তাঁহার জোড়াসাঁকোস্থ ভবনেই আছেন। গিয়া দেখি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। তিনজনে অনেক কথা আরম্ভ হইল। মহর্ষি রাজনারায়ণ বাবুকে ও আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। রাজনারায়ণ বাবুতে ও আমাতে মিলন, মহর্ষির নিকট যেন মণি-কাঞ্চনের যোগ বোধ হইল; তাঁহার হৃদয়দ্বার খুলিয়া প্রেমের উৎস, আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে লাগিল; তিনজনের অট্টহাস্যে অতবড় বাড়ী কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে নির্ঝরের সুস্নিগ্ধ বারির ন্যায় মহর্ষির বাক্যস্রোতে হাফেজ আসিলেন; নানক আসিলেন; ঋষিরা আসিলেন; উপনিষদ আসিলেন; আমরা সকলে সেই রসে মগ্ন হইয়া গেলাম। দেখিতেছি মহর্ষির কান দুটা লাল হইয়া যাইতেছে; মহর্ষির মস্তকের কেশ মাঝে মাঝে খাড়া হইয়া উঠিতেছে। এমন সময় কথার একটু বিচ্ছেদ হইবামাত্র আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের অর্থ-সাহায্যের দরখাস্তের হলো কি?" মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন—"তোমাদের দরখাস্ত নথির সামিল আছে। কিছুদিন পরে রায় বাহির হবে।" আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "রায় বাহির হবে কবে?"

মহর্ষি—কিছুদিন পরে হবে।

ইহার পরে আবার সদালাপের তরঙ্গ, হাসির গর্‌রা ও ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

অবশেষে আমি উঠিতে চাহিলে মহর্ষি উঠিয়া আমার হাত ধরিলেন, বলিলেন, "চল, কিছু না খেয়ে যেতে পাবে না।" এই বলিয়া আমার

হাতি ধরিয়া দক্ষিণের বারাণ্ডার কোণের এক ঘরে লইয়া গেলেন। গিয়া দেখি টেবলের উপরে নানাবিধ মিষ্টান্নপূর্ণ পাত্র আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মহর্ষি আমাকে এক চেয়ারে বসাইয়া, পার্শ্বের এক চেয়ারে নিজে বসিলেন এবং নিজের হাতে তুলিয়া এক একটি খাদ্যদ্রব্য আমাকে দিতে লাগিলেন। মহর্ষির এই নিয়ম ছিল, যাহাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, তাহাদিগকে নিজের হাতে তুলিয়া দিয়া খাওয়াইয়া সুখী হইতেন; সেইরূপ আমাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে আমি বলিলাম, "ঢের হয়েছে, পেট ভরেছে।" তিনি আর একটী সুখাদ্য লইয়া হাসিয়া বলিলেন, "তা বল্‌লে চল্‌বে না বাপু, এ সব জিনিষ বাড়ীর মেয়েরা নিজের হাতে করেছেন, না খেলে নারীর সম্মান করা হবে না, তোমরা ত স্ত্রী-স্বাধীনতার দল।" এই বলিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। এমন সুন্দর, এমন পবিত্র, এমন অকপট হাস্য মানুষে কম দেখিয়াছি। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের মধ্যে অকপট অট্টহাস্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন; কিন্তু মহর্ষির হাস্য বড় কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। তবে তিনি সকলের কাছে হাসিতেন না। নিতান্ত অনুরক্ত লোকের ভাগ্যেই তাহা ঘটিত।

আহারান্তে আমরা আবার মহর্ষির বৈঠক গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি রাজনারায়ণ বাবু তখনও বসিয়া আছেন। চুপে চুপে তাঁহার কানে আহারের ব্যাপারটা বর্ণন করিলাম, তিনি হাসিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দেখি মহর্ষি তাঁহার ক্যাস বাক্স তলব করিয়াছেন, ও চেকবুক বাহির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি সেদিকে মনোযোগ দিবামাত্র, হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "তোমাদের দরখাস্তের রায় লিখ্‌চি।"

আমি—(রাজনারায়ণ বাবুর প্রতি) কেবল ব্রাহ্মণ-ভোজন নয়, হাতে হাতে বিদায়টা হয়ে যায় দেখ্‌চি।

রাজনারায়ণ বাবু—তাইত সেইরূপ গতিক দেখ্‌ছি।

মহর্ষি চেক স্বাক্ষর করিয়া আমার হাতে দিয়া, ইংরাজীতে বলিলেন, "This is my unconditional gift."

আমি মনে ভাবিলাম, ট্রষ্টী নিয়োগ প্রভৃতি যে-সকল বাধাবাঁধি অগ্রে ছিল, তাহা রাখিলেন না। চেকখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি সাত হাজার টাকার চেক। অগ্রে বন্ধুদের মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনি দুই হাজারের অধিক দিবেন না, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা দুই হাজার টাকারই প্রত্যাশা করিতেছিলাম, সাত হাজার টাকা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম।

মহর্ষি—(আমার মুখের দিকে চাহিয়া) কেমন সন্তুষ্ট ত?

আমি—একটা বড় খারাপ হলো। আর একটু বস্‌ব মনে কর্‌ছিলাম, কিন্তু ওটা পেয়ে আর বস্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে না। দৌড়ে গিয়ে দলে খবর দিতে ইচ্ছা কর্‌ছে।

মহর্ষি—(হাসিয়া) তবে যাও।

আমি চলিয়া গেলাম। কিন্তু এমনি আনন্দের আবেগ যে চেকখানি পকেটে না পূরিয়া মহর্ষির ঘরেই ফেলিয়া গেলাম। পথ হইতে আবার ফিরিয়া আসিলাম। ইহা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইল।

তখন সন্ধ্যা সমাগত। আমি ছুটিয়া একেবারে আনন্দমোহন বাবুর মট্‌স্ লেনস্থ ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি তাঁহারা কয়েক জনে বসিয়া সমাজের নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছেন। আমি চেকখানি মিষ্টার বোসের সমক্ষে রাখিবামাত্র তিনি দেখিয়া করতালি দিয়া উঠিলেন, এবং চেয়ার হইতে উঠিয়া সজোরে আমাকে

বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তৎপরে বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে মহা আনন্দধ্বনি উঠিল। মিষ্টার বোস তখনই প্রচুর মিষ্টান্ন আনাইলেন। সকলে মনের আনন্দে মিঠাই খাইলাম।

ইহার পরে গুরুচরণ মহলানবিশ ও আমার উপরে মন্দির নির্ম্মাণের ও অর্থসংগ্রহের ভার প্রধানতঃ পড়িয়াছিল। আমি বেহার, উত্তর-পশ্চিম, পাঞ্জাব, মধ্য ভারতবর্ষ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আরও অনেক হাজার টাকা তুলিলাম।

যাহা হউক, ১৮৭৯ সালের মাঘোৎসবের সময় ভূমি ক্রয় করিয়া নূতন মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করা হইল। আমরা প্রাচীন ও প্রবীণ শিবচন্দ্র দেব মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া এই মহা কার্য্য সমাধা করিলাম। যখন সমাজের অগ্রণী সভ্যগণ ও তাঁহাদের পত্নীগণ এক এক মুষ্টি মৃত্তিকা ভিত্তিগহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তখন আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না; একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

এই সময়েই আমি ও আনন্দমোহন বাবু আর-একটি কার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছি। আমরা দুজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে একটী উচ্চশ্রেণীর স্কুল স্থাপন করিতে হইবে। তদ্দারা দুই উপকার হইবে; প্রথম, অনেক উৎসাহী ও অনুরাগী ব্রাহ্ম যুবককে শিক্ষকতা কার্য্য দিয়া নিকটে রাখা যাইবে, তদ্দারা সমাজের কার্য্যের অনেক সাহায্য হইবে; দ্বিতীয়, বহুসংখ্যক বালকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ভাব দেওয়া যাইবে। তখন আনন্দমোহন বাবু, সুরেন্দ্র বাবু ও আমি বঙ্গীয় যুবকদলের প্রধান নেতা। আমরা সুরেন বাবুকে অনুরোধ করাতে তিনিও আমাদের সঙ্গে নাম দিতে স্বীকৃত হইলেন। আমাদের তিন জনের নামে স্কুলের প্রস্তাবনা পত্র প্রকাশ হইল। স্কুলের নাম হইল

সিটি স্কুল। আনন্দমোহন বাবু স্কুলের সরঞ্জামের টাকা দিলেন; সুরেন বাবু পড়াইতে লাগিলেন, এবং আমি সেক্রেটারির কাজ করিতে লাগিলাম। প্রথম দিনেই স্কুল বসিয়া গেল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রথম মাসেই আয় ব্যয় বাদে টাকা উদ্বৃত্ত হইল। কয়েক মাসের মধ্যে আনন্দমোহন বাবুর প্রদত্ত টাকা শোধ হইল।

এই সিটি স্কুল স্থাপনের কথা ভুলিবার নহে। সে যেন রোম রাজ্যের পত্তন! অপরাপর স্কুলের তাড়ান ছেলে, বদ ছেলে দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আবার স্থাপনকর্ত্তাদিগের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস থাকাতেও অনেক ভাল ছেলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ছেলে বাছাই করা এক মহা সঙ্কটের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। কি দুশ্চিন্তা, কি পরিশ্রম, কি সতর্কতার যে প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা এখন বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। দুই একটি ঘটনামাত্র উল্লেখ করিতে পারি।

ছেলে বাছাই করিবার জন্য আমি এক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। প্রত্যেক শিক্ষকের হাতে এক-একখানি খাতা দিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহারা দিনের পর দিন ক্লাসের দুষ্ট ছেলেদের অর্থাৎ যাহারা কামাই করে বা পড়া না করে বা দুষ্টামি করে তাহাদের নাম লিখিয়া রাখিতেন। সপ্তাহান্তে বাছাই হইয়া বড় দুষ্ট ছেলেদের নাম আর-এক খাতায় উঠিত। ঐ খাতার নাম ছিল ব্ল্যাক বুক। ঐ খাতা ছেলেদের অগোচরে লাইব্রেরীতে ডেক্সের মধ্যে থাকিত। আমি তাহা মধ্যে মধ্যে দেখিতাম, তদ্দ্বারা সকল শ্রেণীর দুষ্ট ছেলেদের নাম আমার নখের আগায় থাকিত। আমি ক্লাস দেখিতে গেলেই ক্লাসের দুষ্ট ছেলেদের বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করিতাম। একবার দেখিলাম তৃতীয় শ্রেণীর একটি বালকের নাম বার বার ব্ল্যাকবুকে উঠিতেছে। দেখিয়া সেই ক্লাসে গেলাম। গিয়া তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিলাম। তৎপরে যে ব্যাপার ঘটিল তাহা এই :—

ক্লাসের ছেলেরা—সার, সে আজ আসে নি।

আমি—কেন?

আর কেউ কোনও উত্তর করে না।

আমি—তার পাড়ার কি কোনও ছেলে আছে? বল্‌তে কি পার সে কেন আসে নি? তার কি ব্যায়রাম হয়েছে?

একটী ছেলে—না সার, তার ব্যায়রাম হয় নি।

আমি—তবে কেন আসে নি?

আর একটী ছেলে—সার, সে গুণ্ডা ভাড়া কর্‌তে গিয়েছে, আজ ছুটীর পর দাঙ্গা হবে।

আমি—কার সঙ্গে?

সে বালক—হিন্দুস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে।

আমি—কেন?

সে বালক—আজ্ঞে আজ দশটার সময় হিন্দুস্কুলের একটি ছেলে এসে শাসিয়ে গিয়েছে, যে, ছুটীর পর তাকে উবিয়ে নে-যাবে, নরলোকে খবর পাবে না।

আমি—বটে! আর কোন্ কোন্ স্কুলের ছেলে এই দাঙ্গাতে আছে?

সে বালক—আজ্ঞে এলবার্ট স্কুলের এবং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশনের।

আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া হিন্দুস্কুলে ভোলানাথ পাল মহাশয়কে, এলবার্ট স্কুলে কৃষ্ণবিহারী সেনকে ও ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশনে কানাই বাবুকে পত্র লিখিলাম, "এ দাঙ্গা বন্ধ করিতে হইতেছে।" তাঁহারা স্বীয় স্বীয় স্কুলে ক্লাসে সতর্ক করিয়া দিলেন, দাঙ্গা বীজেই বিনষ্ট হইল, অঙ্কুর হইতে পারিল না। ভোলানাথ বাবু এক দ্বারবান দিয়া তাঁর স্কুলের সেই ছেলেকে আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। লিখিয়া পাঠাইলেন যে সে দশটার সময় সিটী স্কুলে গিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতেছে.না। আমি

সে ছোক্‌রাকে সত্য কথা বলাইবার জন্য অনেক বুঝাইলাম, কিছুতেই স্বীকার করিল না। তৎপরে তৃতীয় শ্রেণী হইতে চারিপাঁচটি বালক ডাকাইয়া তাহাকে দেখাইলাম। তাহারা তার মুখের উপর বলিয়া গেল যে সে দশটার সময় আমাদের স্কুলে আসিয়াছিল। আমি তখন তাহার কান ধরিয়া ঘরের কোণে দাঁড় করাইয়া দিলাম, এবং তাহাকে এক ক্লাস নামাইয়া দিবার জন্য ভোলানাথ বাবুকে এবং তাহার পিতার নাম জানিয়া লইয়া তার পিতাকে চিঠি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন সে ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, এবং আমার পায়ে ধরিয়া সমুদয় কথা স্বীকার করিল। ইহার পর সে সহজেই নিষ্কৃতি পাইল।

ইহার পর চতুষ্পার্শ্বের স্কুলমহলে আমার প্রতি ছেলেদের একটা ত্রাস জন্মিয়া গেল। এই ত্রাস হইতে একদিন এক কৌতুককর ঘটনা ঘটিল। একদিন আমি বাড়ী যাইবার জন্য সিটি স্কুল হইতে বাহির হইয়াছি, দেখিলাম কয়েকজন বালক আমাকে দেখিয়াই গোলদীঘির ভিতরকার গাছের ঝোপের আড়ালে গিয়া লুকাইল। তাহারা ওরূপ না লুকাইলে বোধ হয় আমি লক্ষ্যই করিতাম না। কিন্তু লুকাইবার চেষ্টা করাতেই আমার চক্ষে পড়িয়া গেল। আমি দীঘির ধারে গিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে ডাকিলাম। তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া আমার নিকট আসিল।

আমি—তোমরা কোন স্কুলের ছেলে?

তাহারা—আজ্ঞে এলবার্ট স্কুলের, হিন্দু স্কুলের, হেয়ার স্কুলের।

আমি—তোমরা এমন সময় স্কুলে না থাকিয়া এখানে আছ কেন?

তাহারা—আজ্ঞে পরের ঘণ্টাতে ক্লাসে যাব।

আমি—তোমাদের মধ্যে আমাদের সিটিস্কুলের ছেলে কেউ আছে?

তাহারা—আজ্ঞে আছে।

আমি—কে? ডাক দেখি।

তাহারা—তারা ঐ বাজারে গাঁজা খেতে গেছে, ধরে দেব মশাই?

আমি—কৈ চল দেখি।

তখন তাহারা যেন বাঁচিল। আমার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় পাইল। আমাকে সঙ্গে করিয়া মাধব দত্তের বাজারে গেল। আমি এক গেটে রহিলাম, দুই দুই ছেলে অন্য গেটে দাঁড়াইল। আর দুই জন বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সিটি স্কুলের এক-জন ছেলেকে পাক্‌ড়িয়া আনিল।

গ্রেপ্তারকারিগণ—দেখুন সার, পকেটে গাঁজা ছিল ফেলে দিয়েছে।

আমি সত্য সত্যই দেখিলাম পকেটের কাপড়টা উল্‌টাইয়া রহিয়াছে।

আমি—সত্যি করে বল গাঁজা ছিল কি না এবং গাঁজা খেয়েছ কি না?

বালক—না সার, আমি গাঁজা খাই না।

আমি—(অপর বালকগণের প্রতি) চল ত গাঁজার দোকানে যাই, দেখি গাঁজা কিনেছে কি না।

তৎপরে দলে বলে সেই বালককে বন্দী করিয়া গাঁজার দোকানের দিকে চলিলাম। আমাদিগকে এই ভাবে চলিতে দেখিয়া পাহারাওয়ালাও আমাদের সঙ্গে চলিল। ভালই হইল, গাঁজার দোকানদারকে ভয় দেখাইবার একটা উপায় হইল।

আমরা গিয়া গাঁজার দোকানের সমক্ষে দাঁড়াইলাম, রাস্তা হইতে আরও লোক জুটিয়া গেল।

আমি—(দোকানদারের প্রতি) এই ছোক্‌রাকে গাঁজা বেচেছ কি না?

দোকানদার—(থতমত খাইয়া) না মশাই, গাঁজা বেচি নাই।

আমি তার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম যে সে মিথ্যাকথা বলিতেছে। একটু উগ্রভাবে—

ঠিক বল, সঙ্গে পাহারাওয়ালা সাক্ষী আছে, স্কুলের ছেলেদের গাঁজা বেচ, আমি পুলিশ সাহেবকে লিখে তোমার লাইসেন্স কেড়ে নেব।

তখন সে ভয়ে সত্য কথা বলিল, তাহাকে গাঁজা বেচিয়াছে। আমি সেই বালককে ধরিয়া সিটি স্কুলে ফিরিয়া আসিলাম। আমি তার নাম কাটিয়া দিয়া কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার পিতাকে এক পত্র লিখিলাম।

তৎপর দিন তার পিতা আসিয়া উপস্থিত। আমার হাতে পায়ে ধরাধরি—"যদি ছেলে ভাল হয়, আপনাদের কাছেই হবে। আমার প্রতি দয়া করে একে রাখ্‌তেই হইবে।" মীমাংসাটা কি হইয়াছিল, তাহা এখন স্মরণ নাই। তবে সে সময়ে আমি দুষ্ট ছেলে তাড়ান বিষয়ে ক্ষিপ্রহস্ত ছিলাম।

যদি কোনও শিক্ষকের চক্ষে পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি পড়ে তবে তাঁহাকে বলি, যে, এক সহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়-সকলের শিক্ষকদিগের মধ্যে আত্মীয়তা ও যোগ না থাকিলে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের অভিভাবক এই উভয়ের মধ্যে সাহচর্য্য না থাকিলে বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এই দুইটীরই অভাব।

সিটি স্কুল স্থাপিত হইলে ইহার বাড়ীটী আমাদিগের সর্ব্ববিধ কার্য্যের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ইহারই একটী ঘরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আপীস উঠিয়া আসিল। এতদ্ব্যতীত এই ভবনে আমরা কয়েকজন প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরোপাসনার জন্য মিলিত হইতে লাগিলাম। তদ্ভিন্ন এই ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশন হইতে লাগিল। সমাজের কাজ দিন দিন জমিয়া যাইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সিটি স্কুলটি জমিয়া বসিলেই কয়েক মাস পরেই আনন্দমোহন বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া আমার বহুদিনের সংকল্পিত একটি কাজের সূত্রপাত করা গেল; তাহা ছাত্রসমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপন করা। অগ্রেই বলিয়াছি আমি যখন কর্ম্ম ছাড়ি, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হয় নাই। সবে আন্দোলন উঠিতেছে। আন্দোলনটা একটা উপলক্ষ্য হইল বটে, কিন্তু আন্দোলন না উঠিলেও আমি কর্ম্ম ছাড়িতাম। সেজন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা এই দুই কর্ম্মে আপনাকে দিব এই উদ্দেশ্যেই কর্ম্ম ছাড়িয়াছিলাম। কিন্তু কর্ম্ম ছাড়িয়াও যদি কাহারও উপরে ভারস্বরূপ না হওয়া যায় তাহাই ভাল,—এটাও মনের ভাব ছিল। পূর্ব্বেই প্রচারের বাতিকটা বহুদিন হইতেই মনে ছিল। সেইজন্য কেশব বাবুর সঙ্গে জুটিয়াছিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে মিশ খাইল না বলিয়া দুঃখিত অন্তরে কিছুদিন বিষয়কর্ম্ম করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আত্মা শান্তিতে ছিল না। অন্তরাত্মা 'কি করি কি করি' ভাবিয়া সর্ব্বদাই বিষণ্ণ হইত। অবশেষে ১৮৭৬ সালের শেষ হইতে কর্ম্ম ছাড়া স্থির করিয়াছিলাম। কেবল সকল কাজের সঙ্গী ও সকল পরামর্শদাতা আনন্দমোহন বসু মহাশয় 'কিছুদিন বিলম্ব করুন, কিছুদিন বিলম্ব করুন' বলিয়া আমাকে টানিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশেষে আমি স্থির করিলাম, যে, কর্ম্ম ছাড়িয়া কলেজ-ছাত্রদিগের জন্য সংস্কৃত পাঠনার একটা প্রাইভেট ক্লাস খুলিব। মাসে দুই টাকা করিয়া বেতন লইব। ৩০।৪০ জন ছাত্র জুটিলেই আমার আবশ্যকমত ব্যয় চলিয়া যাইবে। আমি অবশিষ্ট সময় ব্রাহ্মসমাজের

কাজে দিব। অপরাপর কাজের মধ্যে ছাত্রদের জন্য একটী সমাজ স্থাপন করিব। এইরূপ পরামর্শ করিয়াই কর্ম্ম ছাড়িয়াছিলাম। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়ার পর এত কাজ বাড়িয়া গেল যে ছাত্রদের জন্য রাত্রে সংস্কৃত পড়িবার বন্দোবস্ত করা আর সম্ভব হইল না; তাহাদের জন্য একটী সমাজ স্থাপন অবশিষ্ট রহিল। ছাত্র-সমাজ সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থাপিত হইল।

আনন্দমোহন বাবু ও আমি সেই কার্য্য আরম্ভ করিলাম। প্রথম এক সপ্তাহ অন্তর রবিবার প্রাতে সংক্ষিপ্ত উপাসনা পূর্ব্বক নানা বিষয়ে উপদেশ দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। স্কুলকলেজে ধর্ম্মশিক্ষাবিহীন শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং আমরা সেইভাবে বক্তৃতা-সকল করিতাম। ঐ-সকল বক্তৃতার অধিকাংশ আনন্দমোহন বাবু ও আমি দিতাম। প্রথমে সিটি স্কুল গৃহে ছাত্রসমাজের অধিবেশন হইত। তৎপরে উপাসনা-মন্দির নির্ম্মিত হইলে সেখানে উঠিয়া যায়। পাঁচপ্রকারে ছাত্রসমাজের কার্য্য চলিল। (১ম) প্রথমে পাক্ষিক, তৎপরে সাপ্তাহিক, উপাসনা ও বক্তৃতা। (২য়) ছাত্রাবাস পরিদর্শন। (৩) মধ্যে মধ্যে সদলে সহরের সন্নিকটস্থ উদ্যানাদিতে গমন। (৪র্থ) মধ্যে মধ্যে সান্ধ্যসমিতির ব্যবস্থা। (৫ম) পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কণ ও প্রচার।

এই পাঁচ প্রকার কার্য্য দ্বারা প্রভূত ফল লাভ করা গেল। ছাত্র সমাজের সভ্যসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এক-একবার দুই শত, আড়াই শত যুবক লইয়া আমরা কোম্পানির বাগানে গিয়াছি। সেখানে উপাসনা ও প্রীতিভোজন প্রভৃতি হইয়াছে। তখন ছাত্রসমাজ ভিন্ন যুবকদিগের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার উপযোগী অন্য সভা সমিতি ছিল না; সভ্যসংখ্যা অধিক হইবার সেও একটা কারণ। যাহা হউক এই ছাত্রসমাজ

দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মহোপকার সাধিত হইয়াছে। ইহা অনেক উৎসাহী যুবককে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে; ইহার সভ্যগণের মনে নীতি ও ধর্মের ভাব দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়াছে এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের তরঙ্গ উঠিলে তাহাকে বাধা দিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এখানে "ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ" "প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা" "জাতিভেদ" "পরকাল" প্রভৃতি বিষয়ে সে-সকল বক্তৃতা দেওয়া হয়, তাহাতে তৎ তৎ কালে বিশেষ সুফল ফলিয়াছিল এবং তাহার অনেকগুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

একবার ইহার উৎসাহী সভ্যগণের মধ্য হইতে কতকগুলিকে লইয়া একটি ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। আমি তাঁহাদের সঙ্গে সপ্তাহে একবার বসিতাম এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করিতাম, তৎদ্বারাও অনেক কাজ হইত। তদ্দ্বারা নিজেও বিশেষ উপকৃত মনে করিতাম। ছাত্রসমাজ এখনও আছে, কিন্তু আমি পূর্ব্বের ন্যায় ইহার কার্য্যের প্রধান ভার আর আমার উপর রাখিতে পারি না।

এই সময় প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী পুত্রকন্যা সহ মুঙ্গের হইতে কলিকাতাতে থাকিবার জন্য আসিলেন। ইতিপূর্ব্বেই একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবকের সহিত লক্ষ্মীমণির বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে বেচারি অধিক দিন বিবাহিত জীবনের সুখভোগ করিতে পারে নাই। বিবাহের পর তাহারা উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়িতে গিয়া বাস করিয়াছিল। সেখানে এক বৎসরের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলে ক্রমেই আমাদের গৃহে নিরাশ্রয়া বালিকার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তখন বালিকাদের জন্য বোর্ডিং ছিল না। আমার বন্ধুদের কাহারও কাহারও কন্যাকে গৃহে স্থান দিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন যে-সকল

বালিকার আশ্রয় ছিল না, এরূপ বালিকাও অনেকগুলি আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রসন্নময়ীর সন্তানের ক্ষুধা যেন মিটিত না। তাঁহার নিজের পুত্র কন্যা ছিল, তথাপি কোনও বালিকাকে নিরাশ্রয়া দেখিলে, তাহাকে নিজ ক্রোড়ে না লইয়া, যেন স্থির থাকিতে পারিতেন না। এইরূপে অতঃপর আমাদের গৃহে সর্ব্বদাই পাঁচ ছয়টি করিয়া উপরি বালিকা থাকিত। ইহাদিগকে লইয়া আমরা পরম সুখে বাস করিতাম। অনেক সময় আমাদের দুই তিনটির বেশি শয়ন-ঘর থাকিত না। প্রসন্নময়ীর সন্তানদের সঙ্গে দুই একটা, আমার সঙ্গে আমার ঘরে দুই একটা, বিরাজমোহিনীর সঙ্গে তাঁর ঘরে দুই চারিটা বালিকা থাকিত, এইরূপে চলিত। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী এই বৃহৎ পরিবারের জন্য রন্ধন করিতেন ও ইহাদিগকে পালন করিতেন। এই বালিকাদের অধিকাংশ পরে বিবাহিত হইয়া সুখে ঘরকন্না করিতেছেন, কেহ কেহ বা শিক্ষালাভ করিয়া নিজে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরোপকার-ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। সেজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ।

তত্ত্বকৌমুদীর ও ছাত্রসমাজের কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া এবং প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনীকে কলিকাতায় স্থাপন করিয়া আমি আবার প্রচারে বহির্গত হই। এবার কমিটি স্থির করিলেন যে, আমি উত্তর-পশ্চিম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, গুজরাট ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিব। আমি তদনুরূপ প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কিন্তু ভারত প্রদক্ষিণের প্রধান আয়োজন যে অর্থ সেদিকে আমারও দৃষ্টি নাই, সমাজের কর্ম্মচারিগণেরও দৃষ্টি নাই; আমি ভাবিয়া রাখিয়াছি, সমাজ আফিস হইতে টাকা লইব, লইয়া যাত্রা করিব। মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, যাইবার সময় একেবারে আগ্রায় যাইব, যাইবার সময় বাঁকিপুর বা এলাহাবাদে নামিব না, কারণ পূর্ব্ববৎসর ঐ-সকল স্থানে গিয়াছিলাম। বিশেষতঃ

অগ্রেই সংবাদ পাইয়াছিলাম যে আমার বন্ধুবর আগ্রাপ্রবাসী নবীনচন্দ্র রায় শীঘ্রই কর্ম্ম হইতে ছুটী লইয়া সপরিবারে তাঁহার জমিদারী ব্রাহ্মগ্রামে গমন করিবেন। তাঁহারা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত দুই দিন যাপন করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলাম। ঈশ্বরের প্রতি আমার কিরূপ নির্ভরের অভাব ছিল, এবং তিনি কিরূপে আমার অভাব পূরণ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য এই প্রচার-যাত্রার বিশেষ বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আগ্রা যাইব মনে করিয়া যাত্রার দিন সমাজ-আপীসে গিয়া টাকা চাহিলাম। আপীসের কর্ম্মচারী একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া গেলেন, আমি যে যাইব, আমার যে টাকার প্রয়োজন, সে চিন্তা কাহারও মনে ছিল না। আমি ধর্ম্ম-প্রচারার্থ সমুদয় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিব বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, আমি কবে যাত্রা করিব তাহারও সংবাদ অগ্রে দিয়াছি, অথচ আমার গাড়িভাড়ার টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় নাই দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। সমাজের কর্ম্মচারী ভায়াকে বলিলাম—"বাক্‌স হাতড়ে দেখ কিছু টাকা পাও কি না; আমি আজ রাত্রে যাত্রা করব বলে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক বন্ধুকে লিখেছি, আর দেরি করতে পারব না।" তিনি খুঁজিয়া পাতিয়া আট টাকা কয়েক আনা বাহির করিলেন। আমি রেলওয়ে টাইম-টেবিল পরীক্ষা করিয়া দেখি যে তাহাতে ডুমরাওঁ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। কর্ম্মচারী বার বার দুইদিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন, কিন্তু কি জানি আমার মন সেজন্য প্রস্তুত হইল না। আমি অনেকবার দেখিয়াছি প্রচার-যাত্রার জন্য একবার প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে দিন স্থির করিলে তাহা ভাঙ্গা আমার পক্ষে সহজ হয় না। মহাবিঘ্ন ঘটিলেও যাত্রা করিয়া থাকি। এযাত্রাও আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। বন্ধুদের অনুরোধ, পরিবার-পরিজনের অনুরোধ, কিছুতেই আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। আমি সেই দিনই রাত্রে যাত্রা করিলাম।

মনে করিলাম, আমার বন্ধু প্রকাশচন্দ্র রায় বাঁকিপুরে আছেন, তাঁহার ভবনে দুই একদিন যাপন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাথেয় হিসাবে কিছু ভিক্ষা করিয়া লইব। এই ভাবিয়া বাঁকিপুরের টিকিট লইয়া যাত্রা করিলাম। পরদিন প্রাতে বাঁকিপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া দেখি যে প্রকাশচন্দ্র রাজকার্য্যে স্থানান্তরে যাইবার জন্য ষ্টেশনে দণ্ডায়মান। তাড়াতাড়ি বেশি কথা হইল না।

প্রকাশ—সে কি! তুমি যে আস্‌বে সে সংবাদ তো দেও নাই।

আমি—ভাই! প্রথম আমার এখানে নাম্‌বার কথা ছিল না। কাল আসবার সময় স্থির হলো, তাই খবর দিতে পারিনি।

প্রকাশ—যাও, আমার বাড়ীতে যাও, সেখানে অঘোরকামিনী আছেন, আতিথ্যের ভাবনা নাই। চারদিন অপেক্ষা করো, আমি কাজ সেরে আস্‌ছি।

এই বলিয়া অপর দিকের ট্রেনে উঠিয়া যাত্রা করিলেন।

আমি গিয়া অঘোরকামিনীর গৃহে অবতীর্ণ হইলাম। অঘোর-কামিনীর ভালবাসা ও আতিথ্যের গুণে তাঁর বাড়ী যেন আমার তীর্থ-স্থানের মত বোধ হইত। আমি পরম সুখে তাঁর গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। সেখানকার ভদ্রলোকদের সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহাদের সাহায্যে একটা বক্তৃতা দেওয়া গেল এবং অপরাপর কাজও কিছু করা গেল। কিন্তু প্রকাশচন্দ্রের আর দেখা নাই। আমি এখানে সপ্তাহের অধিক কাল যাপন করিলাম। এই কালের মধ্যে একটা কাজ সারা গেল। ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণের নিকট একখানি পারিবারিক উপন্যাস লিখিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞাটা এখানে পূরণ করিলাম। এই ৮৷১০ দিনের মধ্যে "মেজবৌ" নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া কলিকাতাতে প্রেরণ করিলাম।

প্রকাশচন্দ্র আর আসিলেন না। এদিকে আবার বিভ্রাট উপস্থিত। পাথেয়ের টাকা কোথায় পাই? ভাবিলাম অঘোরকামিনীর হাতে প্রকাশ সংসার চলিবার মত টাকা দিয়া গিয়াছেন, আমি চাহিলে তিনি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না; কিন্তু তাঁর অসুবিধা ঘটিতে পারে। সুতরাং লজ্জাবশতঃ তাঁহাকে নিজের অভাবের কথা জানাইতে পারিলাম না। অবশেষে হিসাব করিয়া দেখি, হাতে যে পয়সা আছে, তাহাতে ডুমরাওঁ পর্যান্ত যাওয়া চলে। ভাবিলাম ডুমরাওঁতে ব্রজেন্দ্র নামে একজন ব্রাহ্মবন্ধু আছেন, তাঁহার নিকট টাকা ভিক্ষা করিয়া লইব। এই ভাবিয়া একদিন প্রাতে অঘোরকামিনীকে বলিলাম, "আজ আমাকে সকাল-সকাল খাওয়াইয়া দেও, আমি ডুমরাওঁ যাইব।" তিনি রন্ধনে প্রবৃত্ত আছেন, আমি বিছানাপত্র বাঁধিতেছি, এমন সময় একটি বাঙ্গালি বাবু আসিলেন, তাঁহার সহিত সেই আমার প্রথম পরিচয়। তাঁহার নাম তিনকড়ি ঘোষ, তাঁহারই নামে T. K. Ghose's Academy হইয়াছে। তিনকড়ি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই নাকি এম্নি বক্তৃতা করিতে করিতে সমুদয় ভারতবর্ষ বেড়াবেন?"

আমি—আজ্ঞে হাঁ, এইরূপ সংকল্প করে ত বাহির হয়েছি।

তিনকড়ি বাবু—আমার একটা অনুরোধ আছে, কিন্তু বল্‌তে লজ্জা কর্‌ছে।

আমি—বলুন না, তার আর লজ্জা কি?

তিনকড়ি বাবু—আমার ইচ্ছে আপনার কাজের জন্য কিছু সাহায্য করি।

আমি—যা দেবেন মনে করেছেন দিন, ও ত ঈশ্বরের দান। এইরূপ দানেই ত আমাদের কাজ চলে।

তিনি তিনটী টাকা দিয়া গেলেন। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম

এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাওয়া চলে। তখন ডুমরাওঁ যাওয়ার পরামর্শ রহিত করিয়া একেবারে এলাহাবাদ যাওয়া স্থির করিলাম। আহার করিতে গিয়া অঘোরকামিনীকে সেই পরামর্শ জানাইলাম। আহার করিয়া আসিয়া দেখি, আমাকে ষ্টেশনে লইবার জন্য একা গাড়ি আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে এবং আর-একটি বাবু আমার জন্য বসিয়া আছেন। তিনি কলিকাতা সমাজের প্রাপ্য বলিয়া তিনটী টাকা দিয়া গেলেন। আমি কলিকাতার সমাজ-আপীসে সংবাদ দিয়া সে টাকা নিজের পাথেয়ের জন্য ব্যয় করা স্থির করিলাম। আমি ষ্টেশনে গিয়া এলাহাবাদে নামিবার পরামর্শ ত্যাগ করিয়া একেবারে আগ্রার টিকিট লইলাম।

আগ্রাতে বন্ধুবর নবীনচন্দ্র রায়ের বাটীতে পৌছিয়া আমার পকেটে আট আনা পয়সা মাত্র রহিল। আমি গিয়া দেখি নবীন বাবু ছুটি লইয়া তাঁহার জিনিসপত্রের অধিকাংশ ব্রাহ্মগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন; এবং তৎপরদিন সস্ত্রীক যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি সেখানকার কয়েক জন বাঙ্গালি ভদ্রলোকের সহিত আমার আলাপ পরিচয় করাইয়া দিয়া তৎপরদিনই আগ্রা হইতে যাত্রা করিলেন। আমি সেই তাড়াতাড়ির ও ব্যয়বাহুল্যের মধ্যে আর তাঁহাকে আমার পাথেয়ের অভাবের কথা জানাইতে পারিলাম না।

আগ্রাতেও পাঠ ব্যাখ্যা বক্তৃতা প্রভৃতি কিছু কিছু কাজ হইল। কিন্তু আমার লাহোর যাইবার উপায় কি? যাঁহাদের ভবনে আছি, তাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন; যাঁহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন, নূতন পরিচিত মানুষ। কিরূপে তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা করি, ভিক্ষা করিতে পারিলাম না। অবশেষে মনে করিলাম, টুণ্ডলাতে একজন উপবীতত্যাগী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম আছেন শুনিয়াছি, তাঁহাকে গিয়া খুঁজিয়া বাহির করিব এবং তাঁহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিব। এই

স্থির করিয়া সেই আট আনা পয়সা সম্বল করিয়া একদিন বৈকালে টুণ্ডলা ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি, দুই দিক্ হইতে দুইখানি ট্রেন আসিয়াছে; লোক উঠানামা করিতেছে, মহা গোলযোগ। জিনিসপত্র নামাইয়া প্লাটফর্মে পাদচারণা করিতে লাগিলাম, এবং ভাবিতে লাগিলাম যে, ট্রেন দুখানা চলিয়া গেলে ষ্টেশনের বাবুদের নিকট সেই ব্রাহ্মবন্ধুটীর ঠিকানা জানিয়া লইব। এমন সময়ে এক কৃষ্ণকায় যুবা পুরুষ আসিয়া একেবারে আমার পায়ে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। "কে মশাই, কে মশাই, উঠুন উঠুন" বলিয়া তুলিয়া দেখি, সে আমাদের সোমপ্রকাশ-আপীসের এক পুরাতন বিল-সরকার। তাহাকে কোনও অপরাধের জন্য আমি কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলাম, জানিতাম না যে সে এখানে রেলওয়ে লোকো (Loco) আপিসে কর্ম্ম লইয়া আসিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে যেরূপ বিস্মিত হইল, আমিও তদ্রূপ তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

সে—মশাই এখানে যে?

আমি—আমি আগ্রা গিয়াছিলাম, অতঃপর লাহোরে যাব। এখানে অমুক বাবু আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বার ইচ্ছা। তাঁর বাড়ী কোথায় বল ত?

সে ব্যক্তি—(হাসিয়া) মশাই তিনি ত আর আপনাদের ব্রাহ্ম নাই, তিনি আর-একরকম হয়ে গেছেন।

আমি—বল কি, তা ত আমি জান্‌তাম না।

সে ব্যক্তি—এখন আমার বাসাতে চলুন, তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে হয় পরে কর্‌বেন। আমি আপনাদের খেয়ে মানুষ, আমার বাড়ীতে পদার্পণ কর্‌তেই হবে। আপনি আমাকে তাড়িয়েছিলেন, সে জন্য আমার ক্ষোভ নাই; আমি তার উপযুক্ত কাজ করেছিলাম।

আমি তখন একটা আশ্রয় পাইলেই বাঁচি, সুতরাং তাহার আহ্বানে তাহার কুটীরে গিয়া প্রবেশ করিলাম। তাহার ভবনে আশ্রয় পাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, লাহোর যাইবার ব্যয় কোথা হইতে আসিবে। আমি কলিকাতা হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছিলাম যে, পাথেয়ের জন্য কলিকাতাতে লিখিব না, আপনার ব্যয় আপনি সংকুলান করিয়া লইব। এইরূপে প্রচার-কার্য্য চালাইয়া লইতে হইবে। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে মহা অভাবের মধ্যে পড়িয়াও কলিকাতার বন্ধুদিগকে জানাইতেছি না। এইবার কিন্তু সঙ্কট উপস্থিত। সে ব্যক্তি একে ব্রাহ্ম নহে, তাহাতে আবার আমাদের চাকর ছিল এবং আমিই তাহাকে তাড়াইয়াছিলাম, সুতরাং তাহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। অথচ আর কেহ নিকটে নাই যাহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি। অবশেষে স্থির করিলাম লাহোরের রেলভাড়া ঐ ব্যক্তির নিকট ঋণ করিয়া লইব এবং পরে লাহোর হইতে তাহাকে পাঠাইব। ইতস্ততঃ করিতে করিতে দুইদিন কাটিয়া গেল। এই দুই দিন কিন্তু বৃথা যাপন করিলাম না। সে ব্যক্তির দ্বারা সেখানকার স্কুলের হেড-মাষ্টারের অনুমতি লইয়া স্কুলভবনের উঠানে এক বক্তৃতা করা গেল। সে বক্তৃতাতে স্থানীয় বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অনেক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার পরদিন লাহোর যাত্রার কথা। সে সঙ্কল্প তাহাকে জানাইয়াছিলাম। সে ব্যক্তির নিকট টাকা কর্জ্জ করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু লজ্জাতে রাত্রে আহারের পূর্ব্বে চাহি চাহি করিয়া মুখ ফুটিয়া চাহিতে পারিলাম না। প্রাতে উঠিয়া দেখি সে আপিসে গিয়াছে, রাঁধুনীকে আমার জন্য রাঁধিতে বলিয়া গিয়াছে। আমি স্নান উপাসনা করিয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় সে আসিয়া উপস্থিত। "আহার করে নিন, আহার করে নিন, গাড়ির সময় হলো।"

এইবার কর্জ্জের প্রস্তাব আসিতেছে।

আমি—হাঁ হে, লাহোরের ভাড়া কত ?

সে ব্যক্তি—তা আপনাকে ভাবতে হবে না, আপনি পাছে আমার সাহায্য না নেন, তাই আমি একখানা টিকেট কিনে ষ্টেশনে রেখে এসেছি।

আমি—সে কি তুমি এর মধ্যে টিকেট কিনে রেখে এসেছ !

তৎপরে আমি লাহোর যাত্রা করিলাম। পথে ভগবানের কৃপাতে বিশ্বাস ও নির্ভরের অভাবের জন্য আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এ কি ? আমি প্রতি পদে নিজের উপর নির্ভর রাখিয়া ভাবিয়া মরিতেছি, আর প্রতি পদে বিধাতা কোথা হইতে অভাব পূরণ করিতেছেন। তাঁর কাজ করিবার সময়ও ঠিক তাঁর উপর নির্ভর রাখিব না ? এইরূপে আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে লাহোরে গিয়া পৌঁছিলাম।

লাহোরে গিয়া আমি ব্রাদারি হিন্দ নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক, গবর্ণমেণ্ট কলেজের সার্ভে টিচার, ব্রাহ্মবন্ধু শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলাম। সেখানে তাঁহার পত্নী লীলাবতীর বিমল বন্ধুতাগুণে আপনাকে বড়ই উপকৃত বোধ করিতে লাগিলাম। লাহোরে গিয়াই দেখি, কিছুদিন পূর্ব্বে দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় সেখানে আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তখনও বেদের অভ্রান্ততা লইয়া মহা তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। আমি অগ্নিহোত্রীর অনুরোধে এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলাম। তদ্ভিন্ন অভ্রান্ত শাস্ত্র মানা যায় না কেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া কতকগুলি যুক্তি লিখিয়া দিলাম। অগ্নিহোত্রী ভায়া সেগুলি অনুবাদ করিয়া ব্রাদারিহিন্দে মুদ্রিত করিলেন, এবং হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকলকে তাহার উত্তর দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ইহা লইয়া কয়েকমাস ধরিয়া নানা কাগজে নানা তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। আমার

লাহোর পরিত্যাগের পূর্ব্বে লালসিং নামক একজন শিখ যুবক আমার সেবক ও সহায় হইয়া আমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রার্থী হইল। তখন আমি নির্ভর-বলে বলী হইয়াছি। আমি বিশেষ প্রার্থনাতে স্থির করিলাম, যে লালসিংকে সঙ্গে লইব। সে আমাকে উর্দ্দু শিখাইতে পারিবে, আমি তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিব। যখন তাহাকে সঙ্গে লইব স্থির করিলাম এবং পরদিন প্রাতে সমুদয় বিষয় ঠিক করিব বলিয়া আশা দিলাম, তখন তাহার ব্যয় কোথা হইতে চলিবে মনে সে চিন্তা হইল না। মন বলিল ঠাকুর তাহা দেখিবেন। কি আশ্চর্য্য, এই সংকল্প জানাইবার রাত্রে সর্দ্দার দয়ালসিংহের এক পত্র পাইলাম। দয়ালসিংহ সর্দ্দার লেনা সিংহের পুত্র। লেনা সিংহ মহারাজ রণজিত সিংহের অধীনে পার্ব্বত্য প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন এবং অমৃতসহরে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সর্দ্দার দয়াল সিংহ তাঁহার একমাত্র পুত্র। তিনি পিতার বিভবের অধিকারী হন এবং যৌবনের প্রারম্ভে ইয়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া উদারভাবাপন্ন হন। দেশে ফিরিয়া তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত যোগ দেন ও সর্ব্ববিধ দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহী হন। যতদূর স্মরণ হয় ইহার পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, লালসিং আমার সঙ্গে যাইতেছে বলিয়া তিনি আনন্দিত এবং তার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি ৫০ টাকা পাঠাইতেছেন। আমি লালসিংহকে একটি ঝুলি প্রস্তুত করিয়া ঐ টাকা তাহার মধ্যে রাখিতে বলিলাম। বলিয়া দিলাম, ইহা হইতে আমার জন্য পাঁচ পয়সাও ব্যয় করিবে না; ঐ সমগ্র টাকা তোমার জন্য ব্যয় করিবে। তোমার খরচের প্রত্যেক পয়সার হিসাব রাখিবে। আমার ব্যয়ের জন্য যিনি যাহা দিবেন, তাহাও ঐ ঝুলিতে রাখিবে। কাহাকেও আমাদের অভাব জানিতে দিবে না; যিনি যাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত

হইয়া দিবেন, ঐ ঝুলিতে দিতে বলিবে। Beg not, borrow not, refuse not, অর্থাৎ ভিক্ষা করিবে না, ঋণ করিবে না, দিলে ফিরাইবে না। এই তিনটী কথা একখান কাগজে লিখিয়া ঐ ঝুলিতে মারিয়া দিলাম, বলিয়া দিলাম এই ভাবেই কাজ করিবে।

এই ভাবেই আমরা মুলতান হইয়া সিন্ধুদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই মুলতান-বাসকালের একটী স্মরণীয় ঘটনা আছে। আমরা মুলতানে গিয়া দেখিলাম যে কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবার কর্ম্মোপলক্ষে সেখানে বাস করিতেছেন। তদ্ভিন্ন পাঞ্জাবীদিগের মধ্যে কতকগুলি শিক্ষিত লোক একটী ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছেন। ঐ সমাজে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের কেহ কেহ যোগ দিয়া থাকেন। আমরা সেখানে পৌছিলে বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী সকলে মহা উৎসাহে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। যতদূর স্মরণ হয় আমি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহে রহিলাম; লালসিংহও তৎসন্নিকটে এক পাঞ্জাবী বন্ধুর গৃহে রহিলেন। বাঙ্গালী বন্ধুটীর গৃহে আমার আদরের সীমা পরিসীমা রহিল না। তাঁহার পত্নী যে কেবল ভগ্নীর ন্যায় আমার পরিচর্য্যায় রত হইলেন তাহা নহে; আহার করিতে গেলেই দেখিতে পাইতাম, অপরাপর বাঙ্গালী বাড়ী হইতেও নানাপ্রকার তরকারী ও মিষ্টান্ন আসিয়াছে। সকল বাড়ীর মেয়েরা কোমর বাঁধিয়া আমার সেবার লাগিয়া গেলেন। মহোৎসাহে বক্তৃতা, উপাসনা, আলোচনা প্রভৃতি চলিল।

এদিকে পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী বন্ধুরা লালসিংকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তোমাদের খরচপত্র কিরূপে চল্‌ছে? যাবার খরচ আছে ত? লালসিং আমার আদেশ অনুসারে বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের আর্থিক অবস্থা জানাতে নিষেধ। কেহ কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, দিতে পারেন।"

পরে যেদিন যাবার দিন আসিল, আমরা ষ্টেশন অভিমুখে চলিলাম।

বন্ধুরা দল বাঁধিয়া আমাদের সঙ্গে চলিলেন। পথে আরও মানুষ জুটিল। একটা মস্ত দল সহ যাইতেছি, এমন সময় পথে হঠাৎ কে আমার পকেটে হাত দিল। আমার প্রথমে মনে হইল কে যেন আমার পকেট হইতে কি তুলিয়া লইতেছে। "কে পকেটে হাত দিল?" বলিয়া ফিরিয়া দেখি তিনি একজন শিক্ষিত পাঞ্জাবী বন্ধু। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "It is a trifle, you need not see it here, you may see it in the train." ট্রেন ছাড়িলে পকেটে হাত দিয়া দেখি বন্ধুরা কুড়ি টাকার নোট দিয়াছেন। সে নোট দুখানি মাথায় রাখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া লালসিংহের ঝুলির মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। আমাদের পথের খরচ এইরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা চলিল। আমরা এইরূপে মুলতান, সক্কর, হায়দরাবাদ, করাচি হইয়া ষ্টীমার যোগে বোম্বাই গেলাম।

হায়দরাবাদ-বাসকালে একটী স্মরণীয় বিষয় আছে। সেখানে আমি আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু নবলরাও সৌকিরাম আদভানি (Navalrao Saukiram Advani) মহাশয়ের ভবনে অতিথি হইয়াছিলাম। তাঁহার সাধুতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, ও পরোপকার-প্রবৃত্তি দেখিয়া অতিশয় উপকৃত হইলাম। তিনি তখন গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটি উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা সৌকিরাম তখনও জীবিত আছেন। তিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় সমাদরে গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহার ভবনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নবলরাও মহাশয়ের কাজ দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, প্রধানতঃ তাঁহার উৎসাহ ও যত্নে একটা সুন্দর বাগানের মধ্যে একটা সমাজ-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে সপ্তাহে একদিন বিশেষ উপাসনা হয়। তদ্ভিন্ন সভ্যগণ প্রতিদিন সায়ংকালে সেখানে উপস্থিত হইয়া ভগবানের নাম করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদের সহিত সেই সভাস্থলে গিয়া দেখিতাম পা টিপিয়া টিপিয়া নির্ব্বাক মৌনীভাবে সভ্যেরা আসিতেছেন; কেহ

ঘরের কোণে, কেহ এক পার্শ্বে, কেহ মাটীর উপর এক পার্শ্বে বসিতেছেন। একটী সংগীত ও একটি প্রার্থনার পর আবার সকলে নির্ব্বাক ও মৌনীভাবে ধীরে ধীরে বাহিরে যাইতেছেন। বাগানের মধ্যে গিয়া তবে পরস্পর কথাবার্ত্তা হইতেছে। নবলরাওয়ের পরোপকার প্রবৃত্তির চিহ্নস্বরূপ দেখিলাম তিনি মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর বালকদের জন্ম একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার উৎসাহী ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া সহরের ব্রাহ্মদল বৃদ্ধি করিতেছেন। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক রবিবার প্রাতে সমাজের উপাসনার পর স্থানীয় কারাগারে গিয়া কয়েদী-দিগকে সমবেত করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিবার নিয়ম করিয়াছেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অধিকার চাহিয়া লইয়াছেন। আমি দুই রবিবার তাঁহার সহিত জেলের এই মীটিংএ গিয়াছিলাম। দেখিলাম কয়েদীগণ দলে দলে আসিয়া মাটীতে বসিল। তিনি দাঁড়াইয়া সিন্ধি ভাষায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন। কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু দেখিলাম যে কয়েদীদের অনেকের চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতেছে। অনেকে "উঃ আঃ" প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবব্যঞ্জক শব্দ করিতেছে। পরে শুনিলাম তাঁহার এই-সকল উপদেশের ফলস্বরূপ অনেক কয়েদীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ একদিনের একটী ঘটনার কথা তিনি বলিলেন।

একবার তিনি রাজকার্য্যোপলক্ষ্যে মফস্বলে গিয়া একদিন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। পথে বনের মধ্যে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কোথায় রাত্রি যাপন করেন সেই ভাবনায় তিনি অস্থির হইলেন। এমন সময় অদূরে একখানি কুঁড়ে ঘর দেখিতে পাইলেন। তদভিমুখে অগ্রসর হইতে না হইতে একজন মানুষ তাহা হইতে বাহির হইয়া তাঁহার অভিমুখে আসিল এবং বলিল, 'আপনার কি স্মরণ হয়—আপনি অমুক মাসে জেলে

বক্তৃতা করিতে গিয়া একজন কয়েদীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা কহিয়াছিলেন! আমি সেই মানুষ। আপনার উপদেশ আমাকে পাপপথ হইতে ফিরাইয়াছে। আমি আর কোন খারাপ কাজ করি না। আমার ঘরে আসিয়া দেখুন, আমি স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিতেছি। তাহারা সকলেই আপনাকে ধন্যবাদ করে। আজ রাত্রে আপনাকে ঘরে স্থান দিয়া ও আপনার সেবা করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব।' নবলরাও বলিলেন সেরাত্রি তিনি যেরূপ সুখে বাস করিয়াছিলেন, জীবনে এরূপ অল্প রাত্রিই যাপন করিয়াছেন। বলিতে কি নবলরাওর গুণে হায়দরাবাদ আমার নিকট তীর্থস্থানের ন্যায় হইয়া গেল।

বোম্বাইয়ে বি এম ওয়াগলে, নারায়ণ পরমানন্দ, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, মিষ্টার কুণ্টে, তেলাঙ্গ, প্রভৃতি মহাত্মাগণের সহিত পরিচয় হইয়া আপনাকে বড়ই উপকৃত বোধ করিতে লাগিলাম। বিশেষতঃ পরমানন্দ মহাশয়ের অকৃত্রিম বিনয় ও বিমল সাধুতা আমার চিরদিন স্মৃতিতে রহিয়াছে। নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকার তখন কলেজের ছাত্র, কিন্তু তখনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি তখনই ইন্দুপ্রকাশ কাগজের সম্পাদকতা করিতেছেন। তিনি এযাত্রা আমার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

আমি লালসিংকে বোম্বাই নগরে রাখিয়া গুজরাটে গমন করি। বড়োদা, সুরাট হইয়া আমেদাবাদে যাই। সার টি মাধব রাও তখন বড়োদাতে প্রধান মন্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আমাকে রাজ-অতিথিরূপে গ্রহণ করেন এবং আমাকে বিধিমতে সম্মানিত করেন। আমেদাবাদে গিয়া আমি সুপ্রসিদ্ধ ভোলানাথ সারাভাই মহাশয়ের ভবনে অতিথি হই। এমন নির্ম্মল সাধুতা, এরূপ অকপট ঈশ্বরভক্তি, আমি অল্প মানুষেই দেখিয়াছি। তাঁহার সহবাসে কয়েক দিন থাকিয়া বড়ই উপকৃত

হইয়াছি। ভোলানাথ সারাভাই সুকবি ছিলেন, তিনি ভজন সঙ্গীত রচনা করিয়া গুজরাটী সঙ্গীতে অমৃত ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভজনাবলী এখনও ঘরে ঘরে গীত হইতেছে।

গুজরাট হইতে ফিরিয়া বোম্বাই নগরে আসিয়া আমি কলিকাতার বন্ধুদের টেলিগ্রাম পাইলাম যে অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। আমি ও লালসিং জব্বলপুর হইয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। এলাহাবাদ পৌঁছিলে লালসিং টেলিগ্রাম পাইলেন যে, তাঁহার জননী গুরুতর পীড়িত, তাঁহাকে অবিলম্বে অমৃতসরে যাইতে হইবে। আমাদের বিচ্ছেদের দিন আসিল। এতদিনের পর আমাদের ঝুলি পরীক্ষা করিয়া দেখি, আমার কলিকাতা পৌঁছিবার ও লাল সিংহের অমৃতসর পৌঁছিবার মত টাকা হইয়া দুই টাকা বেশী আছে। সে দুই টাকা আমার সঙ্গেই রহিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই কলিকাতা পৌঁছিতে, কি কি কারণে স্মরণ নাই, সে দুই টাকাও গেল। কি আশ্চর্য্য ভগবানের কৃপা! করুণাময় ঈশ্বর অনেকবার এইরূপে আমাকে প্রচারকার্য্য করাইয়াছেন। ধন্য তাঁহার করুণা! এই প্রচার-যাত্রা-কালের কয়েকটি ঘটনা স্মরণ আছে।

প্রথম, যেদিন স্বর্গীয় রাণাডে মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেদিন একটা স্মরণীয় দিন। সেই দিন প্রাতে চন্দাবরকার আসিয়া আমাকে বলিলেন, আমাদের বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শিক্ষিতদলের নেতা মিঃ রাণাডে মহাশয় গত রাত্রে তাঁহার কর্ম্মস্থান হইতে বোম্বাই আসিয়াছেন। অমুক স্থানে আছেন, চলুন তাঁহার সহিত দেখা করাইয়া দিই। আমি তৎক্ষণাৎ বাহির হইলাম। পথে ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম যে, বোম্বাইয়ের শিক্ষিত দলের নেতা ও গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীর সহিত দেখা করিতেছি, না জানি গিয়া কিরূপ মানুষ দেখিব। চন্দাবরকার পথে

আমাকে তাঁহার গুণকীর্ত্তি অনেক বলিতে লাগিলেন। আমি সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। গিয়া দেখি বাহিরের ঘরের মেজেতে জাজিমের উপর একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তাঁহার গায়ে একটা সামান্য বেনিয়ান, মাথায় একটা নাইট ক্যাপ, যেরূপ ক্যাপ আমরা কলিকাতায় রাজপথের সামান্য লোককে পরিতে দেখিয়াছি; সম্মুখে একটা তাকিয়ার উপরে একখানি সংবাদপত্র, তাহাই তিনি পড়িতেছেন। চন্দাবরকার আমাকে লইয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি আমাকে নমস্কার করিয়া বসিতে বলিলেন। তার পর প্রত্যেক কথায় এমন কিছু শুনিতে লাগিলাম ও শিখিতে লাগিলাম, যাহা তৎপূর্ব্বে শিক্ষিত মানুষদের মুখেও শুনি নাই। উঠিয়া আসিবার সময় তাঁহার সামান্য বেশ ও সবিনয় ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া ভবিতে লাগিলাম, শিক্ষিত বাঙ্গালী পদস্থ লোক ও বোম্বাইএর পদস্থ লোকে কত প্রভেদ। বাঙ্গালী পদস্থ লোকেরা হাব ভাব পোষাক পরিচ্ছদে বড়লোক হইয়া পড়েন এবং অনেক ব্যয় করেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভদ্র ও পদস্থ লোকেরা পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি তত দৃষ্টি রাখেন না। ইহা একটা চিন্তা করিবার মত কথা। ইহার পরেও কয়েকবার আমি রাণাডে মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হইয়া থাকিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ ও আড়ম্বরশূন্য। কেবল তাঁহার নহে, বোম্বাইয়ের অনেক বন্ধুর ঐরূপ আড়ম্বরশূন্য ব্যবহার দেখিয়াছি। কেবল বোম্বাইয়ের নহে, পাঞ্জাব মান্দ্রাজ প্রভৃতি সকল স্থানেই শিক্ষিত ভদ্রলোকদের আচরণ আড়ম্বরহীন দেখা যায়। মান্দ্রাজে রেলে পৌঁছিয়া ষ্টেশনে অনেকবার দেখিয়াছি সহরের পদস্থ হিন্দু ভদ্রলোকেরা একজন বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, পায়ে জুতা নাই। সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকদিগের পক্ষে চামড়ার জুতা পায়ে দেওয়া তখনকার রীতি ছিল না; এখন কি

দাঁড়াইয়াছে জানি না। ফল কথা এই, বাঙ্গালীরা ইংরেজদের সংশ্রবে আসিয়া যেরূপ বাবুগিরি শিখিয়াছেন অপরাপর প্রদেশের ভদ্রলোকেরা তাহা শেখেন নাই।

বোম্বাই-বাসকালের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাড্যাম ব্লাভাটস্কী ও তাঁহার সহকারী বন্ধু কর্ণেল অল্‌কটের সহিত সম্মিলন। ইহাঁরা আমার যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে আসিয়া বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মত প্রচারের নানা উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন। একজন বন্ধু আমাকে ও লালসিংকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমাদিগকে পাইয়া তাঁহারা আনন্দিত হইলেন, এবং আমাদিগকে তাঁহাদের দলস্থ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন তাঁহাদের সহিত মহা তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল; আমি তাঁহাদিগকে বলিতাম, আপনাদের অনেক কথার সহিত আমার মিল আছে, কিন্তু আপনারা ঈশ্বরের যে ভাব ব্যক্ত করেন, তাহার সহিত আমার মিল নাই। আপনাদের ভাব অদ্বৈতবাদের ভাব, আমি ভক্তিধর্ম্মাবলম্বী। আমার ঈশ্বর জীবন্ত শক্তিশালী, জ্ঞানময় ও প্রেমময় পুরুষ। তাঁহার সঙ্গে প্রেমযোগেই মানবের পরিত্রাণ। ইহা লইয়া ম্যাড্যাম ব্লাভাটস্কী আমাকে অনেক উপহাস বিদ্রূপ করিতেন। আমি তাহার প্রতি কর্ণপাত করিতাম না।

আমি লালসিংহকে বোম্বাইয়ে রাখিয়া গুজরাটে গেলে লালসিং প্রায় তাঁহাদের নিকট যাইতেন। আসিয়া শুনিলাম, তাঁহারা লালসিংকে পুত্রের ন্যায় বুকে ধরিয়া লইয়াছিলেন। দেখা করিতে গেলে ধরিয়া রাখিতেন; উঠিতে গেলে উঠিতে দিতেন না; এটা, ওটা খাইতে দিতেন। সে শিখের ছেলে, তাহার মাথায় লম্বা চুল ছিল,—ম্যাড্যাম ব্লাভাটস্কীর সঙ্গিনী একজন মেম তাহার চুল আঁচড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া বাঁধিয়া

দিতেন। আমি গুজরাট হইতে ফিরিয়া যখন তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লইলাম, এবং লালসিংকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলাম, তখন ম্যাডাম ব্লাভাটস্কী হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদিগকে এত বোঝান বৃথা হইল।"

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বাস কালের তৃতীয় ঘটনা গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদ নগরে ঘটে। তাহা এই,—

এই সময় রবিবাসরীয় মিরারের ডিভোশ্যনাল কলমে (Devotional Columnএ) ঈশ্বরের উক্তিরূপে নানা কথা প্রকাশিত হইত। উপাসক-মণ্ডলী ঈশ্বর-চরণে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের আচার্য্যকে তাঁহারা কি ভাবে দেখিবেন? ঈশ্বর তদুত্তরে আচার্য্যকে কি ভাবে দেখিতে হইবে তাহা বলিয়া দিলেন, ইত্যাদি। ডিভোশ্যনাল কলমটি কেশব বাবুর নিজের বিশেষ উক্তি বলিয়া সকলে জানিত এবং সেই ভাবে সকলে গ্রহণ করিত। উক্তিগুলির মধ্যে ভাল বিষয় অনেক থাকিত, যাহা পড়িয়া উপকার বোধ হইত; আবার, পড়িয়া হাসি পায়, এরূপ কথাও থাকিত। আমি যখন আমেদাবাদে তখন ঈশ্বরের উক্তিরূপে বিরোধী-দলের প্রতি এক অপূর্ব্ব গালাগালি প্রকাশিত হইল। আমার স্মৃতিতে যতদূর আছে তাহার ভাবটা এই প্রকার—Then the Lord God rolled down a hill and saw a number of men secretly working to undermine his kingdom. Then the Lord spoke: Ye sceptics, materialists, ইত্যাদি, ইত্যাদি, অনেক বিদ্বেষসূচক কটূক্তি।

আমি তখন কলিকাতা হইতে দূরে আছি, এখানে কি ঘটনা ঘটিয়া এই অভিনব তপ্ত আরক-স্রোত বাহির করিয়াছে, তাহা জানিতাম না; আমি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। সেখানকার একজন

বন্ধু এটা আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন, আমরা দুজনে খুব হাসিলাম। প্রথম প্রথম আমি এটাকে লঘুভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই ভাবে ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন পত্রিকাতে মুদ্রিত করিবার জন্য ইংরাজীতে একটি প্রার্থনা লিখিলাম, তাহার কয়েক পংক্তি মনে আছে :—Our Father Which art in the Sunday Mirror mellowed be Thy temper. It seems that Thy favorite children have spoiled Thee and have made Thee say things that are abominable. Indeed Lord, Thou must be ashamed to have used such expressions, ইত্যাদি। কিন্তু পরক্ষণে সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, লঘুভাব অন্তর্হিত হইয়া গভীর দুঃখের সঞ্চার হইল। কেশব-চন্দ্র সেন মহাশয় কি হইয়া দাঁড়াইতেছেন মনে করিয়া ক্ষোভ হইতে লাগিল। ঈশ্বরের জবানিতে এরূপ লেখা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া ক্রোধ হইতে লাগিল।

ইহার পর বোম্বাই হইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। এলাহাবাদ হইতে যখন কলিকাতা আসিতেছি, তখন মধ্যের এক ষ্টেশনে দেখি কেশব বাবু সদলে দণ্ডায়মান। সে ট্রেনে সিমলার কর্ম্মচারীরা নামিয়া আসিতেছিল, গাড়িতে বড় ভিড়, ফিরিঙ্গী ছোঁড়াতে ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ি পূর্ণ, তাহারা সারাপথ হাস্যপরিহাস করিতে করিতে আসিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এক গাড়িতে তিন চারিজন মাত্র ছিলাম। কেশব বাবুরা গাড়ি না পাইয়া প্লাটফরমে ছুটাছুটি করিতেছেন দেখিয়া আমরা যে কামরাতে ছিলাম তাহাতে উঠিবার জন্য আমি তাঁহাদিগকে ডাকিলাম। কেশব বাবু, বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি আমাদের কামরাতে উঠিলেন, আর উমানাথ গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন পাশের কামরাতে উঠিলেন। উমানাথ বাবুর হাতে খেরো কাপড়ের খোলের মধ্যে কি একটা ছিল।

সেই কামরাতে এক ফিরিঙ্গী যুবক শুইয়া ছিল, উহাঁরা প্রবেশ করিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল,—"What's that ?

উমানাথ বাবু—A bugle.

ফিরিঙ্গী—Bugle ! coming from the Afghan war ?

উমানাথ বাবু—No, from a Brahmo Samaj Expedition.

তখন আমি বুঝিলাম, তাঁহারা গাজিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে Salvation Army'র অনুকরণে যুদ্ধযাত্রা করিয়া আসিতেছেন, কারণ তাহার বিবরণ মিরারে অগ্রেই পড়িয়াছিলাম। আমি সেই ফিরিঙ্গী ছোক্‌রার রসিকতা নিবারণের জন্য একখানা কাগজে লিখিলাম, Keshub Chunder Sen with his friends, লিখিয়া তাহাকে দেখাইলাম, তাহাতে সে থামিল।

গাড়ি ছাড়িল, বেশ গল্পগাছা হইতে লাগিল, আমরা সুখেই চলিলাম। হঠাৎ বঙ্গচন্দ্র রায় কি আর কেহ ঠিক মনে নাই, রবিবাসরীয় মিরারের সেই গালাগালির উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহা দেখিয়াছি কি না। আর কোথায় যায়! আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় আমার পূর্ব্বসঞ্চিত ক্রোধ ফাটিয়া বাহির হইল। "কি! আপনারা সে জন্য লজ্জিত না হয়ে আবার হেসে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আমাদের প্রতি ওঁর ক্রোধ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়! এত ফাড়াছেঁড়া করা গেছে, ক্রোধ হওয়াই ত স্বাভাবিক; উনি কেন নিজের নামে আমাদিগকে গাল দিলেন না 'তোরা অধার্ম্মিক, তোরা নচ্ছার'; বুঝ্‌তাম মানুষ মানুষের সঙ্গে কার্‌বার কর্‌ছে। তা না করে ঈশ্বরকে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করা ও তাঁর মুখে যাচ্ছে-তাই অপভাষা দেওয়া এ কি-রকম ব্যবহার? ঈশ্বরে প্রীতি থাক্‌লে মানুষ কি এ রকম পারে?" আমি দেখিলাম কেশব বাবু মুখটা গম্ভীর করিয়া আর-একদিকে

চাহিয়া আছেন। প্রচারক বন্ধুদের চেহারা রাগে রক্তবর্ণ হইয়া যাইতেছে।

প্রশ্নকর্ত্তা—(আমার প্রতি) ধর্ম্মের চোখ থাক্‌লে ত দেখ্‌তে পেতেন কি মহৎভাবে ওগুলি লেখা হয়েছে।

আমি—(হাসিয়া) এদেশে একটা কথা চলিত আছে, "চিত্রগুপ্ত শালা, যত দোষ লিখেছ মানুষের বেলা, দেবতার বেলা লীলাখেলা।" এ দেখ্‌ছি তাই। উনি লিখেছেন কিনা তাই আপনাদের কাছে মহৎভাব হয়েছে, অন্য কেউ সেসব কথা লিখ্‌লে আপনারা তাকে নরকে ডোবাতেন।

এইরূপ ঝগ্‌ড়া হইতে হইতে আমরা বাঁকিপুর পৌঁছিলাম, তাঁহারা সদলে সেখানে নামিয়া গেলেন। আমি পরে শুনিয়াছি এখান হইতে নামিয়া গিয়া তাঁহারা বন্ধুবর প্রকাশচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহাদের এক কমিটি বসে, তাহাতে স্থির হয় যে, বিরোধী দলের সহিত তাঁহারা বাক্যালাপ বা সামাজিক সংশ্রব রাখিবেন না।

তাঁহারা নামিয়া গেলে আমার দুঃখ হইল যে ঝগ্‌ড়াঝাঁটির এতদিন পরে কেশব বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, কেন এত উত্তপ্ত হইয়া কথা কহিলাম। পরে ভাবিলাম ক্রোধটা যখন মনে ছিল, তখন তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করাই ভাল হইয়াছে। আমার মনে এই একটা সন্তোষ আছে যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা বলিবার তাহার অধিকাংশ তাঁহার সম্মুখেই বলিয়াছি।

আমি সহরে পৌঁছিয়া ঐ গালাগালির মূল-কারণ শুনিলাম। সে মূল কারণ এই, ঐ বৎসরের মধ্যভাগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী সভ্যগণের মধ্যে এক ব্যক্তির নামে কেহ তাঁহাদের নিকট অতি জঘন্য দুশ্চরিত্রতার কুৎসা করে। যেই এই কুৎসা শোনা অমনি তাঁহারা লম্ফ দিয়া উঠিলেন, এইবার শত্রুকুল বিনাশের অস্ত্র হাতে আসিয়াছে। এই উৎসাহ এত অধিক হইল যে, বলিতে লজ্জা হইতেছে যে, একটা বাজারের

স্ত্রীলোককে বাড়ীতে ডাকাইয়া আনাইয়া নিজেদের সভার মধ্যে তাঁহাকে বসাইয়া সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করাকেও ছোট কাজ মনে করিলেন না। ইহার পরে তাঁহারা মহম্মদের অনুকরণে বিরোধীদলের প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দর্‌বার হইতে আদেশবিধি প্রচার হইতে লাগিল; এবং কেশব-ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইবার চেষ্টা হইতে লাগিল; রবিবাসরীয় মিরারে ঐ ঈশ্বরীয় উক্তি প্রকাশিত হইল; এবং কেশব বাবু expedtion বাহির করিলেন। এই ভাব হইতেই পরে নববিধানের অভ্যুদয়। ইহা স্মরণ করিলেও মনে ক্লেশ হয়।

যে কুৎসাটা ইঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে আমি সহরে ছিলাম না, বিশেষ জানি না; দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী আমাদের মধ্যে সত্যানুরাগী, ন্যায়পরায়ণ, ও তেজীয়ান পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন; তিনি কাহাকেও ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, তিনি বহু অনুসন্ধান করিয়াও ঐ কুৎসার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পান নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি কলিকাতাতে ফিরিয়া নানা কাজের মধ্যে পড়িলাম। এইবার হইতেই বোধহয় আমি ইউনিভার্সিটির এণ্ট্রান্স ও এল এ পরীক্ষায় সংস্কৃতের পরীক্ষক হইতে লাগিলাম। তদবধি বহুবৎসর ধরিয়া প্রতি-বৎসর পরীক্ষকের কাজ করিয়াছি। প্রথম প্রথম পরীক্ষকের পারিশ্রমিক স্বরূপ ৫০০।৬০০ টাকা পাইতাম। ক্রমে কম হইয়া আসিয়াছে। সাড়ে তিন শত টাকা করিয়া ধরিলে আমি এইরূপে আট দশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি, তদ্ভিন্ন আমার পুস্তকাদির আয় দ্বারাও কয়েক হাজার টাকা পাইয়াছি। ইহার কিছুই সঞ্চিত রাখি নাই। অর্থসঞ্চয়ের কথা মনে হইলেই মনে হয় যে, যদি সেই পথেই যাইব, তবে বিষয়কর্ম্ম ছাড়িলাম কেন? নাচিতে উঠিয়া ঘোমটা দেওয়া ভাল নয়। দুই পথ আছে, এক বিষয়ীর পথ, অপর ধর্ম্মপ্রচারের পথ। বিষয়ীর পথে যদি যাও তবে অর্থের উপার্জ্জন ও সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি রাখ, যদি ধর্ম্মপ্রচারের পথে যাও তবে অর্থোপার্জ্জন ও সঞ্চয়ের দিকে প্রধান দৃষ্টি রাখিয়ো না, ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মসমাজের সেবার প্রতি প্রধান দৃষ্টি রাখ, ঈশ্বরের কৃপার উপরে নির্ভর কর। প্রশ্ন এই, এত হাজার টাকা কোথায় গেল? ভাল কাজেই গিয়াছে। সমাজের বন্ধুগণ আমাকে চিরদিন যাহা দিয়া আসিতেছেন, তাহা কোনও দিন আমার ব্যয়নির্ব্বাহের উপযুক্ত হয় নাই। আমার জননীর পীড়ার জন্য অনেকবার কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাসা করিয়া তাঁহাকে আনিয়া রাখিতে হইয়াছে। দেশে পর্ণ-কুটীরের পরিবর্ত্তে জনক-জননীর মাথা রাখিবার জন্য পাকাঘর করিয়া

দিয়াছি, তদ্ভিন্ন আমার পূর্ব্বকার দেনা শোধ করিয়াছি; তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের যে যে কার্য্যের ভার প্রধানরূপে আমার উপরে পড়িয়াছে, তৎসংক্রান্ত ঋণ শোধের জন্যও অনেক টাকা দিতে হইয়াছে, যথা, সাধনাশ্রম, প্রথম ব্রাহ্ম বালক-নিবাস, বাঁকীপুরের রামমোহন রায় সেমিনারি, প্রভৃতি। ধন্য মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপা। তিনি তাঁহার অনুপযুক্ত ভৃত্যকে চিরদিন পালন করিয়াছেন। আশ্চর্য্যরূপে আমার আর্থিক অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। আমি যখন ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলাম, তখন আমার কিছু টাকা চুরি যায়, এবং অপরাপর প্রকারে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ি। তখন বন্ধুবর দুর্গামোহন দাস আমাকে ৪০০ চারিশত টাকা কর্জ্জ দেন এবং বন্ধুবর আনন্দমোহন বসু ২৫০ কি ৩০০ টাকা কর্জ্জ দেন। পরে যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়া আমি ইহার প্রচারকদলে প্রবেশ করিতে উন্মুখ হই, তখন দুর্গামোহন বাবু ও আনন্দমোহন বাবুর কাছে প্রথম যাই, "দেনার টাকার কি হবে?" ঋণ থাকিতে আমি কিরূপে চাকুরী ছাড়িয়া প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইব। তাঁহারা তখন আমার এই চিন্তাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, বলেন, "সমাজের জন্য আমাদিগকে কত শত শত টাকা দিতে হবে, তুমি কি সামান্য ঋণের টাকার কথা বল! ও টাকা আমাদের সমাজে দান।" আমি বলি, "আচ্ছা, আমি যদি কখনও কোন প্রকারে টাকা উপার্জ্জন করি এবং আপনাদের ঋণ শোধ করতে পারি, আপনাদের টাকা আপনাদের নিতেই হবে।" তাঁহারা বলেন "আচ্ছা, তখন দেখা যাবে, এখন ত সমাজের কাজ কর।"

তখন এই কথা থাকে। তদনুসারে এবার পরীক্ষকের বৃত্তি পাইয়াই আমি দুর্গামোহন বাবুকে টাকা লইবার জন্য লোক পাঠাইতে লিখি।

তিনি উত্তরে লিখিলেন, "Good boy! Quite worthy of you. *Make over the four hundred rupees to G. C. Mahalanobish as part of my contribution to the Mandir building fund.*"

তিনি বন্ধুকে কর্ত্তব্য করিতে দিলেন, অথচ সমাজের সাহায্য করিলেন।

আনন্দমোহন বাবুর দেনা দিবার অবসর প্রায় বিশ বৎসর পরে উপস্থিত হইয়াছিল। বিশবৎসর পরে আমি যখন টাকা দিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিলাম, তখন তিনি লিখিলেন যে, "তাঁহার পুরাতন কাগজপত্র নাই এবং ঐ টাকার কথা তাঁহার স্মৃতিতেও নাই।" পরে যখন দেখিলেন যে ঋণটা না দিলে আমার মনটা শান্ত হয় না, তখন অনিচ্ছাসত্বেও টাকাটা লইলেন, কিন্তু পরে জানিয়াছি যে সে-টাকা স্বতন্ত্র করিয়া বাড়ীর মেয়েদের হাতে দিয়া এই আদেশ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা তাহা আমার সাহায্যার্থ ব্যয় করিবেন। তাঁহারা এইরূপে শত শত টাকা আমার সাহায্যার্থ দিয়া আসিতেছেন। তাহা আর কি বলিব। তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়। আজিও বহু পরিবারের বন্ধুগণ আমার পশ্চাতে সহায় হইয়া রহিয়াছেন। আমি কোনও অভাবে পড়িয়াছি জানিলেই সাহায্যের জন্য তাঁহাদের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হয়। বলিতে চক্ষে জল আসে, আমাকে কিছুদিন দেখিতে না পাইলেই তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠেন, তবে বুঝি কোনও ক্লেশের মধ্যে বাস করিতেছি! অমনি চিঠির উপর চিঠি আসে, বা নিজেরা কেহ আসিয়া উপস্থিত হন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাঘোৎসবের পূর্ব্বে প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী সন্তানদিগকে লইয়া মুঙ্গের হইতে সহরে আসিলেন। সেবারকার মাঘোৎসব অর্দ্ধনির্ম্মিত মন্দিরের উপর চাঁদোয়া দিয়া সমাধা করা হইল। ভাল স্মরণ নাই, বোধ হয় এই উপলক্ষেই, গোঁসাইজী, বিদ্যারত্ন ভায়া,

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী ও আমি এই চারিজনকে বিশেষ উপাসনান্তর প্রচারকরূপে বরণ করা হয়।

উৎসবের পরেই বোধ হয় ১লা বৈশাখ দিবসে দার্জ্জিলিং পাহাড়ের নবনির্ম্মিত উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত স্থলে যাই। তখন উত্তর বঙ্গে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত রেল ছিল। শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত রেল পাতা হইতেছিল, কিন্তু তখনও রেল খোলে নাই। আমি শিলিগুড়িতে গিয়া ডাক্তার আনন্দচন্দ্র রায়ের ভবনে আশ্রয় লইলাম। তখন শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত টোঙ্গা নামক একপ্রকার গাড়ি চলিত। কিন্তু তাহার ভাড়া এত অধিক ছিল যে আমার দরিদ্র ব্রাহ্মবন্ধু-দিগের পক্ষে আমার জন্য তত ব্যয় করা কষ্টকর বলিয়া অনুভব করিলাম। সে ভার তাঁহাদের উপর দিবার ইচ্ছা হইল না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে পাহাড়ে চড়িবার জন্য ঘোড়া পাওয়া যায়। জীবনে ঘোড়া কখনও চড়ি নাই। বালককালে সমবয়স্ক সঙ্গী বালকদের সঙ্গে জুটিয়া কখন কখনও ষাঁড় চড়িতাম বটে, একবার পড়িয়া গিয়া ব্যথা পাইয়াছিলাম, ইহাও বোধ হয় অগ্রে বলিয়া থাকিব। কিন্তু ঘোড়া চড়া কখনও ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু কি করা যায়, ১লা বৈশাখের পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং পঁহুছিতেই হইবে। দেখিলাম ইউনিটেরিয়ান মিশনরি ড্যাল সাহেব টোঙ্গার জন্য ডাকবাঙ্গালাতে অপেক্ষা করিতেছেন, কারণ তখন টোঙ্গা আবার রোজ চলিত না। আমার পয়সাও ছিল না, এবং অপেক্ষা করিবার সময়ও ছিল না। সুতরাং ঘোড়াতেই যাইতে প্রস্তুত হইলাম। একদিন প্রাতে আনন্দ বাবু এক পাহাড়ে ঘোড়া আনাইয়া আমাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিলেন। আমি ত হেলিয়া দুলিয়া অগ্রসর হইলাম। শুক্না পার হইতে না হইতে পাহাড়ে উঠিবার সময় সইস আমাকে বলিল ঘোড়াটা মাদী ঘোড়া এবং গাবিন। তখন আমার মনটা

বড় খারাপ হইয়া গেল। আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া সইসের হাতে লাগাম দিয়া পদব্রজেই পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যাহাকে পাহাড়ে short cut সোজা পথ বলে, সেই-সকল সোজা রাস্তা দিয়া উঠিতে লাগিলাম। তাহাতে পথ সোজা হয় বটে, কিন্তু বড় চড়াই উঠিতে হয়, বুকে পিঠে বেদনা লাগে। কি করা যায়, উপায়ান্তর না দেখিয়া মরিয়া ক্রুটিয়া উঠিতে লাগিলাম। এইরূপে যে খার্সিয়ানে ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের অপরাহ্ণ ২টা কি তিনটার সময় পৌঁছিবার কথা, সেখানে রাত্রি ৮টার সময় গিয়া পৌঁছিলাম।

তখন বার্ড কোম্পানি নামে এই পাহাড়ে এক কোম্পানী ছিল। তাহারা মালপত্র বহিয়া দিতেন। প্রিয়নাথ বসু নামে একটী বাবু খার্সিয়ানে তাঁহাদের কার্য্যকারক ছিলেন। পূর্ব্বকৃত বন্দোবস্ত অনুসারে আমি গিয়া তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইলাম। তৎপরদিন আমার দার্জ্জিলিং পৌঁছিতেই হইবে। নতুবা শরীর যেরূপ ক্লান্ত হইয়াছিল তাহাতে দুইদিন বিশ্রাম করিলে ভাল হইত। প্রিয়নাথ বাবু বলিলেন, তিনি পরদিন প্রাতে অশ্বারোহণে দার্জ্জিলিং যাইবেন, আমার জন্যও একটী ঘোড়া আনাইবেন। শুনিয়াই আমার ভয় হইল। তিনি অভয় দিয়া বলিলেন, ভয় নাই তিনি সঙ্গে থাকিবেন। তৎপরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখি, আমার জন্য গোলগাল এক পাহাড়ে টাট্টু আসিয়াছে এবং তাঁহার জন্য বার্ড কোম্পানীর আস্তাবলের এক দীর্ঘকায় সুন্দর শ্বেতবর্ণ ঘোড়া সাজিয়া অপেক্ষা করিতেছে। দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, "প্রিয়বাবু, এ কি করেছেন, এ যে বেশ জোরাল ঘোড়া, আমার জন্য একটা এক পা খোঁড়া ঘোড়া আনিলে ভাল হইত।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "উঠুন উঠুন, আমি সঙ্গেই আছি।" আমরা ত বাহির হইলাম। আমি আগে প্রিয়বাবু পশ্চাতে। ঘোড়াদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে তাহা অগ্রে জানিতাম

না। যেই প্রিয়বাবুর ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা, অমনি আমার ঘোড়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। আমি কখনও ঘোড়া চড়ি নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থাতে কখনও পড়ি নাই। আমি দুই পা দিয়া ঘোড়ার পেট চাপিয়া ধরিয়া দুই হাত দিয়া তার ঘাড়ের ঝুঁটি ধরিয়া তাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিলাম। ঘোড়াও বোধ হয় এরূপ অবস্থাতে কখনও পড়ে নাই! সে বোধ হয় মনে করিল, একি জন্তু আমার উপরে উঠিল; কারণ সে আরও ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। প্রিয়নাথ বাবু পশ্চাৎ হইতে চেঁচাইতে লাগিলেন, "মশাই থামুন, থামুন, গেলেন, গেলেন, এখনি খদের মধ্যে পড়ে যাবেন।" আমি বলিলাম—"আপনি থামুন, আপনি না থামিলে, আমার ঘোড়া থামিবে না।" তিনি নিজ অশ্বের বেগ সম্বরণ করিলেন, আমি এদিকে প্রাণপণে লাগাম টানিয়া ধরিলাম, ক্রমে আমার ঘোড়ার বেগ মন্দীভূত হইল। এই ভাবে গিয়া দার্জ্জিলিঙ্গে উপস্থিত হইলাম এবং মন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিলাম। আসিবার সময় বোধ হয় টোঙ্গাতে নামিয়াছিলাম।

ঠিক মনে নাই বোধ হয় দার্জ্জিলিং হইতে নামিয়া আসিয়াই মাদ্রাজে যাই। আমি ষ্টীমারযোগে মাদ্রাজ যাত্রা করি। তখন মাদ্রাজের অবস্থা কি ছিল, তাহা কতকটা লিখিয়া রাখা ভাল বলিয়া এই প্রচার-যাত্রার বিশেষ বিবরণ একটু দিতেছি। জাহাজ মাদ্রাজ উপকূলে পৌঁছিল। তখন মাদ্রাজের কৃত্রিম বন্দর (artificial harbour) প্রস্তুত হয় নাই। জাহাজ তীর হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল দূরে দাঁড়াইত। সেখান হইতে বোটে করিয়া তীরে উঠিতে হইত। সে বোটে যাওয়া নূতন মানুষদের পক্ষে বড় ভীতিজনক ব্যাপার ছিল। তরঙ্গের আঘাতে বোটে জলের ছাট লাগিয়া কাপড়-চোপড় ভিজিয়া যাইত। একবার বোট তরঙ্গের মাথায় দশহাত উপরে উঠিতেছে, আবার তরঙ্গের সঙ্গে দশহাত নিম্নে

নামিয়া জাহাজের লোকের চক্ষের অদর্শন হইয়া যাইতেছে। এইরূপ বোটযাত্রার পর ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে তীরে গিয়া নামিলাম। মান্দ্রাজ সমাজের কতিপয় সভ্য আমাকে লইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাকে লইয়া এক বাড়ীতে তুলিলেন। দেখিলাম তাহার উপরতালা আমার জন্য ভাড়া করিয়া রাখিয়াছেন এবং সমাজের ব্রাহ্মণসভ্য বুচিয়া পাণ্টুলু মহাশয়ের বাড়ী হইতে আমার ভাত আনিয়া দিবার জন্য এক ব্রাহ্মণ বালক নিযুক্ত করিয়াছেন। যথাসময়ে স্নান করিয়া বসিয়া আমি সমাগত ব্রাহ্মগণের সহিত আলাপ করিতেছি, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ বালক আসিয়া ইংরাজীতে আমাকে আহারের জন্য ডাকিল। আমি আহার করিতে যাইবার সময় সমবেত বন্ধুদিগকে বলিলাম, চলুন আমি আহার করিব, আপনারা সেখানে বসিয়া কথা কহিবেন। তাঁহারা উত্তর করিলেন না, কিন্তু সঙ্গে আসিলেন না। আমি গিয়া আহারে বসিয়া সেই ব্রাহ্মণ বালককে ইংরাজীতে বলিলাম, "উহাঁদিগকে আসিতে বল, আর বসিবার জন্য চেয়ার দাও।" সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিব কাটিয়া বলিল, They are sudras, how can they see you eating? ওরা শূদ্র, ওরা কি আপনার খাওয়া দেখ্‌তে পারে? পরে জানিলাম এই কারণেই তাঁহারা আমার সঙ্গে আসেন নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, সেদেশে ব্রাহ্মণের আহার শূদ্রের দেখিবার অধিকার নাই। এমন কি চেটী প্রভৃতি কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতার আহার পুত্রে দেখিবার অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্র একসঙ্গে পথে পথিক হইলে ব্রাহ্মণকে কাপড়ের কাণ্ডার খাটাইয়া তন্মধ্যে আহার করিতে হয়।

ইহার পর আমি মেম্বারদিগের সহিত জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম; এবং সে বিষয়ে একদিন বক্তৃতাও করিলাম। সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এই সময়ে আমি মান্দ্রাজ

সহরে পাচিয়াপ্পা হল নামক ভবনে ইংরাজীতে সাধারণ ভাবে একটী বক্তৃতা করি। তাহার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের বহুব্যয়-সাধ্যতার উল্লেখ করিতে গিয়া বলি যে তাহার এক ফল এই দেখ যে "The poor man's salt is not free from duty." তৎপরদিন Madras Mail নামক ইংরাজদের কাগজে "The poor man's salt is not free from duty" এই শিরোনামা দিয়া এক প্রবন্ধ বাহির হইল। তাহাতে বলা হইল যে বঙ্গদেশ রাজস্বের সমুচিত অংশ দেয় না বলিয়া অপর প্রদেশের দরিদ্র প্রজাদিগকে করভারে ক্লিষ্ট হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত তাহাতে বাঙ্গালীদিগকে নিন্দা করা হয়। আমি সেই নিন্দাগুলির উত্তর দিয়া এক পত্র লিখি এবং হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়কে অপর কথাগুলির উত্তর দিবার জন্য গোপনে পত্র লিখি। তিনি Bengal, the milch cow of the British Government of India বলিয়া এক নজির-পরিপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। এই সকল কারণে সেখানকার শিক্ষিত ও ইংরাজ দলে আমার নাম বাহির হইয়া যায়। তৎপরে পরশুবাকম, মাইলাপুর, প্রভৃতি মান্দ্রাজের অনেক উপনগরে আমাকে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে থাকে এবং অনেক স্থলে প্রকাশ্য সভাতে পুষ্পমালার দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করে। এই যাত্রাতেই দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও প্রভৃতি বড়লোকদিগের সহিত আলাপ ও আত্মীয়তা হয়।

আমি যখন মান্দ্রাজে কাজ করিতেছি, তখন উত্তর বিভাগে রাজমাহেন্দ্রী প্রভৃতি স্থানে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। সেখানে বীরেশলিঙ্গম্ পাণ্টুলু নামক একজন প্রতিভাশালী লেখক ও সমাজসংস্কারক দেখা দিয়াছেন, যিনি তেলুগু সাহিত্যের অদ্ভুত পুষ্টিসাধন করিয়াছেন,

এবং স্বদেশ মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহার উপদেশে অনেকে বিধবা বিবাহ করিয়া সমাজচ্যুত হইয়াছে, তাহা লইয়া মহা আন্দোলন চলিয়াছে। সে সময় রাজমাহেন্দ্রীর অদূরবর্ত্তী কোকোনাডা নামক সমুদ্রকূলবর্ত্তী নগরে রামকৃষ্ণিয়া নামক এক ধনী বাস করিতেন। তিনি জাতিতে কামটী অর্থাৎ আমাদের দেশীয় বৈদ্যের ন্যায় ছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষাবলম্বন করিয়া সমাজসংস্কারক দলের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত ও শাস্ত্রীদিগকে সমবেত করিয়া তর্ক উপস্থিত করিতেন। এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, এমন সময় রামকৃষ্ণিয়া মান্দ্রাজের সংবাদপত্রে আমার সংবাদ পাইলেন। তৎপরে কোকোনাডাতে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল। অবশেষে কোকোনাডা যাত্রা করিলাম। বন্দরে পৌঁছিয়া দেখি আমাকে লইবার জন্য রামকৃষ্ণিয়ার গাড়ি আসিয়াছে। আমি গিয়া তাঁহার বাড়ীতে উপনীত হইলাম। আমার সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ নাই দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আমি বলিলাম, "আমি গরীব প্রচারক, আমি কি সঙ্গে রাঁধুনী লইয়া বেড়াইতে পারি, আমি যেখানেই যাই, তাঁদের সঙ্গে খাই, আমি জাতি মানি না।" শুনিয়া রামকৃষ্ণিয়ার মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি বোধ হয় মনে মনে ভাবিলেন, কি সর্ব্বনেশে লোক এনে ফেল্লাম। যাহা হউক তাঁহার সৌজন্য ও আতিথ্যের কিছুই ত্রুটী হইল না। তিনি আমার থাকিবার জন্য তাঁহার বাসভবনের অদূরে একটী বাড়ী দিলেন এবং আমার পরিচর্য্যা ও অন্নাদি বহনের জন্য একটী ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দুই দিন যাইতে না যাইতে সেই ক্ষুদ্র সহরে জনরব উঠিল যে রামকৃষ্ণিয়া বঙ্গদেশ হইতে এক নাস্তিক পণ্ডিত আনিয়াছে, সে দেশের সমুদয় বিবাহোপযুক্তা বিধবার

বিবাহ দিয়া যাইবে। এই জনরব উঠাতে আমার মুস্কিল বোধ হইতে লাগিল। পথে ঘাটে বাহির হইবার জো নাই, বাহির হইলেই দলে দলে লোক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, রাস্তায় রাস্তায় জনতা হইয়া লোকে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করে, আমার দাড়ি ও খাট চুল দেখিয়া আমাকে খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া নির্দ্ধারণ করে এবং তাহা লইয়া মহা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। একদিন প্রাতঃকালে আমার সঙ্গে বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার করিবার জন্য একদল পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সংস্কৃতে কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সংস্কৃতের উচ্চারণ শুনিয়া আমাদের বঙ্গদেশীয় উচ্চারণ-প্রণালীর প্রতি ঘৃণা জন্মিতে লাগিল। তৎপূর্ব্বে আমার সংস্কৃতে কথা কহা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং সংস্কৃতে কথা কহিতে আমার একটু বাধ বাধ করিতে লাগিল। যাহা হউক একপ্রকার বিচার চলিল। ইতিমধ্যে এক ঘটনা উপস্থিত। রামকৃষ্ণিয়ার চাকর আমার স্নানের জল আনিতেছে। আমি দেখিলাম তাহাকে দেখিয়াই সমাগত ব্রাহ্মণেরা পরস্পর ইসারা, গা টেপাটেপি, কানে কানে ফুস ফুস করিতে লাগিলেন। তাহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহারা বিচার বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমি উঠিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দেখি তাঁহারা রাজপথে স্থানে স্থানে জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছেন। ভীমরাও নামক একটী ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ও আমার প্রতি অনুরক্ত ব্রাহ্মণ যুবক তাহার ভিতর হইতে দৌড়িয়া উপরে আসিয়া আমাকে বলিল, যে, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া কামটী চাকরের আনীত জলে স্নান করিতেছি দেখিয়া সমবেত ব্রাহ্মণেরা বিরক্ত হইয়াছেন এবং আমাকে সহর হইতে তাড়াইবার জন্য সদলে রামকৃষ্ণিয়ার নিকট যাইতেছেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "কামটির আনীত জলে স্নান করি বলে এত আন্দোলন, আমি তাঁহাদের অন্ন খাই তা বুঝি তাঁহারা জানেন না!"

ইহার পরে ব্রাহ্মণগণ সদলে রামকৃষ্ণিয়া বেচারার ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন; রামকৃষ্ণিয়া আপনাকে বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মান্দ্রাজ হইতে আনাইয়াছিলেন, সুতরাং আমাকে প্রকাশ্যভাবে কোকোনাডা পরিত্যাগ করিতে বলিতে পারেন না, অথচ ব্রাহ্মণদিগের কোপশান্তির জন্যও ব্যগ্র হইলেন। তিনি আমার নিকট দেখা করিতে আসা ত্যাগ করিলেন। আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম। তাঁহাকে বিপন্ন করিবার ভয়ে সেখানে আর থাকা উচিত বোধ হইল না। আমি নিরামিষাশী, ফিরিঙ্গীদিগের হোটেলেও যাইতে পারি না; আবার, খাট চুল ও দাড়ির জন্য দেশী হোটেলের লোকেও খ্রীষ্টিয়ান মনে করিয়া তাদের হোটেলে খাইতে দেয় না। কি করা যায়, অবশেষে স্থির করিলাম, রাজমাহেন্দ্রীতে বিধবাবিবাহের দল কাজ করিতেছেন, তাঁহারাও আমাকে ডাকিয়াছেন, সেখানে যাওয়াই ভাল। কিন্তু সেখানে বোটে করিয়া কাটা খাল দিয়া যাইতে হয়; বোট সপ্তাহে দুই একদিন আসে; কবে আসে তার স্থিরতা নাই; উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সেরূপেই বা কতদিন বসিয়া থাকি। অবশেষে রামকৃষ্ণিয়ার নিকট লোক পাঠাইলাম, আমাকে পাল্‌কী ও বেহারা দাও, আমি রাজমাহেন্দ্রী যাই। ত্রিশ মাইল পথ পাল্‌কীতে যাওয়া বড় কম ব্যয়সাধ্য নয়। সেই জন্যই বোধ হয় রামকৃষ্ণিয়া তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে ব্রাহ্মণতনয় ভীমরাওকে বলিলাম, "ওহে, তুমি আমার মালপত্রগুলা লইয়া যাইবার জন্য দুইজন কুলী ঠিক কর, আমি হাঁটিয়া রাজমাহেন্দ্রী যাই, বোটের জন্য তিন চারিদিন বসিয়া থাকা ভাল লাগিতেছে না।" এই প্রস্তাব শুনিয়া ভীমরাও বলিলেন,—"কি! আপনি হাঁটিয়া রাজমাহেন্দ্রী যাইবেন, তা হইতেই পারে না, আসুন আমার বাড়ীতে আসুন, এ কয়দিন আমার বাড়ীতে থাকুন।" আমি বলিলাম, "না ভীমরাও, তা হবে না, তুমি ব্রাহ্মণ,

দেখ্‌লে ত কায়স্থর জলে স্নান করাতে কি আন্দোলন উপস্থিত, তোমাকে বিপদে পড়্‌তে হবে, বিশেতঃ তুমি গরীব, সামান্য কেরাণীগিরি কর, কোনওরূপে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করে আছ, তার ভিতর আমাকে কোথায় নে যাবে ?" ভীমরাও কোন রূপেই শুনিলেন না, বলিলেন,—"আসুন না, সেই ঘরেই সকলে থাকব, আমাকে যা সাজা দিতে চায় দেবে, আমি তা গ্রাহ্য করি না।" এই বলিয়া আমার আপত্তির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া মাল বহিবার জন্য কুলী ডাকিয়া আনিলেন ; আমাকে লইয়া তাহার ভবনে উপস্থিত করিলেন এবং তথায় লইয়া তাঁহার মাতা ভগিনী ও স্ত্রীর সহিত এক ঘরে স্থাপন করিলেন। আমি বাহিরের দাবাতে মাদুর পাতিয়া বৈঠক করিলাম। তৎপর দিন প্রাতে ভীমরাও বলিলেন যে, সম্মুখের রাস্তার অপর পার্শ্বে একটা ছাপাখানা আছে, সন্ধ্যার পর তাহাদের আপীসে কেউ থাকে না, তাহাদিগকে বলিয়া সায়ংকালের জন্য আপীসটা চাহিয়া লইবেন, সেখানে লোকে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। কারণ অনেকে দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র। আমি বলিলাম, "আচ্ছা বেশ, ঠিক কর।" তদনুসারে ভীমরাও ছাপাখানার কর্তাদের নিকট গিয়া দুই তিন দিন সন্ধ্যাকালের জন্য তাঁহাদের আপীস-ঘরটা চাহিলেন। তাঁহারা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তদনুসারে সহরের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সম্বাদ দেওয়া হইল। কিন্তু আমরা সন্ধ্যার সময় বসিতে গিয়া দেখি প্রেসওয়ালারা প্রেসবাড়ীতে তালা দিয়া উধাও হইয়াছে। পরে শুনিলাম তাহারা প্রাতে স্বীকৃত হইবার পর সহরের ব্রাহ্মণেরা সদলে তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। শুনিয়া অনেক হাসিলাম, "বাপরে বাপ, বৈদ্যের জলে স্নান করার এত সাজা।" পরদিন প্রাতে ভীমরাওকে স্থানীয় ইংরাজী স্কুল কমিটির সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলাম। বলিলাম, "জেনে এস তিনি স্কুলগৃহে আমাকে বক্তৃতা করিতে

দিবেন কি না, এবং তিনি নিজে সভাপতি হবেন কি না।" বিষয় ছিল, "The Brahmo Samaj, its history and its principles।" মাজিষ্ট্রেট সাহেব অগ্রেই Madras Mailএ আমার নাম শুনিয়াছিলেন এবং আমার চিঠি পড়িয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের বিষয় শুনিতে ব্যগ্র ছিলেন, সুতরাং অনুরোধ করিবামাত্র তিনি স্কুলগৃহ দিতে এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। বক্তৃতার পরে ইংরাজেরা আমাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গে চা খাইতে প্রস্তুত কি না। আমি বলিলাম "প্রস্তুত।" তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু আমি পরদিন বোটে রাজমাহেন্দ্রী যাইব বলিয়া নিমন্ত্রণ লইতে পারিলাম না। রামকৃষ্ণিয়া বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, সহরের বড় বড় ইংরাজেরা আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছেন ও নিমন্ত্রণ করিতেছেন, তখন ভিড় একটু কমিলে আমার কাছে আসিয়া কানে কানে বলিলেন, "আমার একটা বাগানবাড়ী দিতেছি, সেখানে থাকিবেন চলুন, এরা ত দেখা করিতে আসিবে, ভীম-রাওর বাড়ীতে কি দেখা হতে পারে?" আমি হাসিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া বলিলাম, "আগামী কল্য বোটে রাজমাহেন্দ্রী যাইতেছি।"

তৎপর দিন আমি বোট যোগে রাজমাহেন্দ্রীতে গেলাম, এবং সেখানে গিয়া বীরেশলিঙ্গমের প্রেমালিঙ্গন পাইয়া ও তাঁহার পত্নীর আতিথ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বীরেশলিঙ্গমের পত্নী একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। একদিকে দৃঢ়চেতা, তেজস্বিনী ও কর্ত্তব্যপরায়ণা, অপর দিকে সদয়-হৃদয়া ও পরোপকারিণী। তাহার মত স্ত্রী পাইয়াছিলেন বলিয়াই বন্ধুবর বীরেশলিঙ্গম নানা সামাজিক নির্য্যাতনের মধ্যে কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। সেখানে খুব উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ হইল। রাজমাহেন্দ্রী হইতে আমি মান্দ্রাজে যাই। সেখানকার ভদ্রলোকেরা এক প্রকাণ্ড

সভাতে সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রীতির চিহ্নস্বরূপ আমাকে একটী ঘড়ি উপহার দিলেন। তৎপরে আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।

ইহার পরে আমি আরো অনেকবার মান্দ্রাজে গিয়াছি। তাহার সকল বারের সকল ঘটনা স্মরণ নাই। একবারের কয়েকটি ঘটনা স্মরণ আছে, তাহা এই স্থানে নির্দেশ করা ভাল।

দ্বিতীয়বার মান্দ্রাজে গেলে মান্দ্রাজবাসী ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাদের সমাজের সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ীর সন্নিকটে একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতে আমাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার ভবনে দুই বেলা আহার করিতাম, তাঁহার পত্নী ভগিনীর ন্যায় রন্ধন করিয়া আমার নিকট বসিয়া খাওয়াইতেন। আমি সমস্ত দিন পাঠ চিন্তা ও গ্রন্থরচনাদিতে যাপন করিতাম, বৈকালে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে যাইতাম।

একদিন আমি একজন ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি; পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক একটি অল্পবয়স্ক শিশুকে ভয়ানক প্রহার করিতেছে। শিশুটী অসহায় হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। তাহার চীৎকার শুনিয়া আমি দাঁড়াইয়া গেলাম। মনে করিলাম সে ব্যক্তি শিশুটীর পিতা, কোন অপরাধের জন্য বুঝি শাসন করিতেছে। দাঁড়াইয়া সঙ্গের একজন ব্রাহ্ম বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও কি ওর পিতা? এত মারিতেছে কেন?" তিনি বলিলেন, "ও ব্যক্তি ওর পিতা নয়, ওর কেহই নয়; ওই ছেলেটী পিতৃমাতৃহীন; ওর মাথা রাখিবার স্থান নাই; রাত্রে ভদ্রলোকের বাড়ীর দরজায় বারাণ্ডায় পড়িয়া ঘুমায়। পেটের ভাত জোটে না। লোকের বাড়ী ভিক্ষা করিয়া খায়। ওই মানুষটা ওই ছেলেটার সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিয়াছিল, যে, ছেলেটা সহরের গৃহস্থদের দরজা হইতে কয়লা কুড়াইয়া আনিয়া দিবে। মানুষটা দু চার দশ দিন অন্তর হয়ত একটা পয়সা দিবে। মার খাবার ভয়ে

ছেলেটা কয়লা আনে। আজ কয়লা আনে নাই বলিয়া মার খাইতেছে।” অনুসন্ধানে জানিলাম, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ প্রদেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তখন বহুসংখ্যক শিশু পিতৃমাতৃহীন হয়। ইহাদের অনেক-গুলিকে খ্রীষ্টীয়ান মিশনরিগণ সংগ্রহ করিয়া আপনাদের অনাথাশ্রমে আশ্রয় দিয়াছেন। কিন্তু বহুসংখ্যক শিশু নিরাশ্রয় অবস্থাতে বাস করিতেছে; আমি অনেক দিন প্রাতে এইরূপ বালক-বালিকাদিগকে ভদ্রলোকের দ্বারের সম্মুখস্থ বারান্দাতে পড়িয়া ঘুমাইতে দেখিয়াছি। এই দৃশ্য দেখিয়া ও এই বিবরণ শুনিয়া আমার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। সেই খারাপ মন লইয়া বাসায় ফিরিলাম। পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ দেখা করিতে আসিলে তাঁহাদিগকে বলিলাম, “হয় এইরূপ পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকার রক্ষা ও শিক্ষার জন্য কিছু করুন, নতুবা সমাজ-মন্দিরে বড় বড় কথা বল্‌বার ফল কি?” আমার দুঃখ দেখিয়া একজন ব্রাহ্মবন্ধু সেই প্রাতেই রাস্তা হইতে এইরূপ একটী বালক ডাকিয়া আমার নিকট আনিলেন। সে প্রথমে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চায় না। ওরূপ জাতিভ্রষ্ট বালকদের ভদ্রলোকদের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই; এই সংস্কার থাকাতে সে ইতস্তত করিতে লাগিল। অনেক বলাতে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া উঠানে আসিল। আমি উপরে আসিবার জন্য কত ডাকিলাম কোন মতেই আসিল না। অবশেষে খাইতে দিবার জন্য একখানি “আপম” লইয়া নীচে গেলাম। আমি বলিলাম, “হাত পাত।” হাত পাতিল, কিন্তু আমি যখন “আপম” দিতে গেলাম তখন পাছে হাতে হাতে ঠেকাঠেকি হয় এই ভয়ে হাত সরাইয়া লইল। তখন আমি তাহার হাত ধরিয়া হাতে আপমখানা দিলাম এবং তাহাকে টানিয়া উপরে লইয়া গেলাম। একটী ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিলাম সেই ঘরে সে রাত্রে থাকিবে, এবং যে বাড়ীতে আমি খাই সে বাড়ীতে খাইতে

পাইবে। এই বলিয়া চাকরের হাতে তাহাকে দেখিবার ভার দিয়া বন্ধুর বাড়ীতে আহার করিতে গিয়া তাঁহার পত্নীকে সমুদয় বিবরণ বলিয়া তাহাকে খাইতে দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি স্বীকৃত হইলেন। ছেলেটী কিছুদিনের মত আমার কাছে থাকিয়া গেল।

আমি নিশ্চিন্ত আছি—সে যথাসময়ে আহার পাইতেছে। কিন্তু একদিন প্রাতে কোন কাজে বাহির হইয়া বাড়ীতে ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল। আমার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আমি আহার করিতে গিয়া দেখি, বাহিরের দরজার সম্মুখে রাস্তার উপরে একখানা পাতে কুকুরের মত ছেলেটাকে ভাত দেওয়া হইয়াছে। সে বসিয়া আহার করিতেছে। দেখিয়া ভিতরে গেলাম। আহারে বসিয়া বন্ধুর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার ছেলেটাকে কুকুরের মত রাস্তায় ভাত দেওয়া হয় কেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ওর যে জাত গেছে। ও শ্রেণীর লোক ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রবেশ কর্‌তে পায় না। ওরা সকলেই ত রাস্তায় খায়।" তার পর তাঁহার সঙ্গে যে কথোপকথন হইল তাহা এই :—

আমি—তুমি কি মনে কর—আমার জাত গেছে কি আছে? তুমি ত জান আমি সকল জাতির বাড়ীতে খাই। কতদিন তোমাকে বলে গিয়েছি অমুক ফিরিঙ্গীর বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ আছে, আমার ভাত কোরো না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হয়ে পৈতা ত্যাগ করে এবং যার-তার বাড়ী খায়, তার কি জাত থাকে? তবে আমাকে তোমার নিজের ঘরের ভিতর খেতে দাও কেন?

বন্ধুপত্নী—(হাসিয়া) আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনি যা করেন তাই শোভা পায়। আপনি ব্রাহ্মণই আছেন।

আমি—ওটা তোমার ভালবাসার কথা।

আমার বন্ধুপত্নীর আমার প্রতি এই অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় অল্পদিনের মধ্যেই পাইলাম। কয়েকদিন পরে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে আমার নিকট আনিয়া বলিলেন, তাহার গর্ভে সন্তান রক্ষা হয় না। দুইবার নষ্ট হইয়াছে। তাহাকে এমন কিছু ঔষধ দিতে হইবে যাহাতে সন্তান রক্ষা পায়। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি ত চিকিৎসক নই! ঔষধ আবার কি দিব!" তিনি বলিলেন, "আপনি ওর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, এবং পদধূলি দিন, তাহলেই ওর সন্তান রক্ষা হবে।" যিনি জাতিভ্রষ্ট ছেলেকে রাস্তার কুকুরের মত ভাত দিতেছিলেন, অপর দিকে তাঁহার এই নিষ্ঠা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

এই স্থানে ইহা বক্তব্য যে সেই ছেলেটা আমাদের এত যত্ন সত্বেও এক সামাজিক উৎসবদিনে আমাদের বাড়ী হইতে পলাইয়া গেল। অনেক খুঁজিয়াও আর পাওয়া গেল না। পরে শুনিলাম, আবার রাস্তায় ঘুরিতেছে। শুনিয়া ভাবিলাম এই শ্রেণীর বালকবালিকাদের সর্ব্বপ্রধান বিপদ এই যে নিরাপদে বাস করা ও নিয়মাধীন থাকা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া যায়। যাহা হউক, এই অনাথ বালকবালিকার জন্য উৎকণ্ঠা বৃথা গেল না। মান্দ্রাজে ব্রাহ্মবন্ধুগণ ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহাদের মন্দিরসংলগ্ন গৃহে Shree Raja Rammohun Roy Ragged School নামে অনাথ শিশুদের জন্য একটী স্কুল স্থাপন করিলেন। তাহা ক্রমে একটি middle English school হইয়া দাঁড়াইল।

আর একটি ঘটনাও বোধ হয় সেইবারে কি তৎপরবারে ঘটিয়াছিল। সেটী এই সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি:—আমি মান্দ্রাজ বাস কালে অনেক ভদ্রলোকের মুখে তাঞ্জোর হইতে সমাগত গায়কদিগের গানবাদ্যের বড়

প্রশংসা শুনিতে পাইতাম। ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে বলিয়াছিলাম, তাঞ্জোরের গায়কগণ কোথায়ও গাহিতে আসিয়াছে শুনিলে আমায় বলিবেন, আমি গিয়া গান শুনিব। তাঁহারা এই কথা লইয়া নিশ্চয় লোকের সঙ্গে বলাবলি করিয়া থাকিবেন। কারণ একদিন একজন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক (যিনি সমাজের সভ্য নহেন) আসিয়া আমাকে তাঁহার ভবনে তাঞ্জোর গায়কদিগের গান শুনিতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি তৎপূর্ব্বে অনেক স্থলে দেখিয়াছিলাম যে Dancing Girls নামে এক-শ্রেণীর কুলটা স্ত্রীলোক আছে, দেবমন্দিরে পরিচর্য্যা করা তাহাদের প্রধান কার্য্য এবং অনেক স্থলে দেবদাসী বলিয়া তাহারা পরিচিত। তাহাদের অবস্থা সাধারণ বেশ্যাদিগের অবস্থা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত। তাহারা অবাধে ভদ্রলোকদের বাড়ীতে গতায়াত করে, বিবাহাদি উৎসবে নৃত্যগীত করে, ভদ্রলোকেরা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লজ্জা বোধ করেন না। এমন পারিবারিক উৎসব হয়ই না, যেখানে এই স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকে না। আমি মান্দ্রাজ প্রদেশে তাহাদের সর্ব্বত্র গতি ও মেশামেশি দেখিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত ছিলাম। সুতরাং ভদ্রলোকটী যখন আমায় নিমন্ত্রণ করিলেন তখন মনে ভয় হইল পাছে এইরূপ স্ত্রীলোকের ভিতরে গিয়া পড়ি। তাই উপস্থিত একটী ব্রাহ্মবন্ধুকে গোপনে ডাকিয়া কানে কানে সেই আশঙ্কা জানাইলাম। তিনি গিয়া ভদ্রলোকটীর সহিত কি কথা কহিলেন জানি না, আমাকে আসিয়া বলিলেন, যে ভদ্রলোকটী বলিয়াছেন, আমাকে Dancing Girlদের মধ্যে ফেলা হইবে না। তখন আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম ও সেইদিন অপরাহ্নে গান শুনিতে গেলাম। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখি একটা পাশের ঘরে স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থান। সেখানে অনেক ভদ্র স্ত্রীলোক বসিয়া গান শুনিতেছেন। আমি নির্ভয়ে গিয়া আসরের মধ্যে বসিলাম, এবং গীতবাদ্য শুনিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিন চারিটী সুসজ্জিত নানা অলঙ্কারে ভূষিত যুবতী মেয়ে সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। গৃহস্বামী উঠিয়া সমাদর পূর্ব্বক তাহাদিগকে সেই আসরে আমার পার্শ্বে বসাইলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, তারা বুঝি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে হবে, তাই তাহাদিগকে মেয়েদের সাধারণ ঘরে না বসাইয়া আসরের মধ্যে বসাইল। ভদ্রলোকটী আমাকে কথা দিয়াছিলেন, যে, Dancing Girlদের মাঝে আমায় ফেলিবেন না, সুতরাং আমার মনে সে চিন্তাও আসিল না। কিন্তু আমি চাহিয়া দেখি যে দুই ব্রাহ্মবন্ধু আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহারা পরস্পর চোখোচোখী করিয়া হাসিতেছেন। তখন আমি তাঁহাদিগকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলাম, "Who are they ?" তাঁহারা উত্তর করিলেন "They are dancing girls"। আমি তখনি সে আসর হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তখন গৃহস্বামী আমার সম্মুখে মাটীতে মাথা দিয়া পড়িয়া গেলেন, এবং আমাকে আসর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। এই বিষয় লইয়া আসরের মধ্যে একটা আন্দোলন ও কানাকানি হইতে লাগিল। Dancing Girls আসিয়াছে বলিয়া চলিয়া যাইতেছি শুনিয়া সমাগত ব্যক্তিগণ হাঁ করিয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকগুলির ত কথাই নাই। তাহারা এরূপ ব্যবহার কখনও কোথায়ও পায় নাই, সুতরাং হাঁ করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। আমি অনুনয় বিনয় করিয়া গৃহস্বামীর হাত ছাড়াইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। সেইরাত্রেই সেই কথা সহরে ছড়াইয়া পড়িল। "ওরে ভাই শুনেছিস Dancing Girls এসেছিল বলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সেস্থান পরিত্যাগ করে গিয়েছেন!" তৎপরদিন আমি বেড়াইতে বাহির হইলেই লোকে গা টেপাটেপি করে ও আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া

দেয়। কোন কোন ভদ্রলোক সাক্ষাতে আমার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন, "আপনি একটা সামাজিক ব্যাধির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ভালই করিয়াছেন। ভদ্রলোকেরা দেখুক সমাজের অবস্থা কি।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মান্দ্রাজ হইতে ফিরিবার পর, বোধ হয় ইহার কিছু পরে, একটা ঘটনা ঘটে যাহা উল্লেখযোগ্য। একদিন প্রাতে ৯৩ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীটে বসিয়া ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের বা তত্ত্বকৌমুদীর কাপি লিখিতেছি এমন সময় যত্নমণি ঘোষ নামে একজন ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়া উপস্থিত। ইনি উড়িষ্যাজাত বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইহাকে আমরা কেশব বাবুর বিশেষ অনুগত প্রচারকদলে প্রবেশার্থী শিষ্য বলিয়া জানিতাম। আমি উঠিয়া অভ্যর্থনা করিতে না করিতে যত্নমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, বিনা ষ্ট্যাম্পে হ্যাণ্ডনোটে নালিশ চলে কি না?"

আমি—বসুন বসুন, সে কথা পরে হবে।

যত্নমণি—পরে বস্‌ছি, বলুন না নালিশ চলে কি না?

আমি—যতদূর জানি, চলে না।

যত্নমণি—বাঃ তবে ত আমার অনেক হাজার টাকা গেল।

আমি—সে কি, কার নামে নালিশ কর্‌বেন?

যত্নমণি—কেশবচন্দ্র সেনের নামে।

আমি—সে কি! কেশব বাবুর নামে নালিশ!

তৎপরে যত্ন বাবু বলিলেন যে কেশব বাবু কমলকুটীর কিনিবার সময় তাঁর নিকট কয়েক সহস্র টাকা কর্জ্জ লইয়া একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ষ্ট্যাম্প দেন নাই। পরে কথা হইয়াছে যে, কমলকুটীরের উত্তরে মঙ্গলবাড়ী-পাড়ায় যত্নমণির জন্য একটি বাড়ী নির্ম্মিত হইবে। সেই জমির দাম ও গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় বাদে যে টাকা প্রাপ্য

থাকিবে তাহা যদুমণিকে প্রদত্ত হইবে। এই প্রস্তাবে যদুমণি স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়াছে।

আমি বলিলাম, "বিনাষ্টাম্পে হ্যাণ্ডনোটখানা দেওয়া ভাল হয় নাই। যদি হ্যাণ্ডনোট দিলেন, তবে ষ্ট্যাম্প দিয়ে দেওয়াই ভাল ছিল। কিন্তু আপনি এজন্য কেশব বাবুর প্রতি সন্দেহ কর্‌লেন কেন? হ্যাণ্ডনোটেরই বা কি প্রয়োজন? তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ কি নাই? তিনি কি মনে কর্‌লে আপনার টাকা দিতে পারেন না? আর আপনি তাঁকে না বলেই বা ছুটে বাহির হলেন কেন?" দেখিলাম তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করাই দায়, তাঁহার চক্ষুদুটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই মনে হইল, উন্মাদের লক্ষণ। তৎপরে যে ভয়ানক কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আর আমার সন্দেহ রহিল না। তিনি বলিলেন, গত কল্য বৈকালে ঝি আমার দুধ জ্বাল দিতেছিল, কেশব বাবুর গৃহিণী ঝিকে বলিলেন, 'ঝি তুই কাজে যা, আমি দুধ জ্বাল দিচ্ছি।' বলিয়া দুধ জ্বাল দিতে বসিলেন। বলুন আমার দুধ জ্বাল দিবার জন্য কেশব বাবুর স্ত্রীর এত গরজ কেন?"

আমি—এ ত খুব ভাল কথা; এজন্য ত তাঁর প্রতি আপনার কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। আপনি তাঁদের বাড়ীতে থাকেন, তাঁরা সন্তানের ন্যায় দেখেন, ঝির অন্য কাজ আছে, তাকে সরিয়ে ঠাকরুণ আপনার দুধ জ্বাল দিতে বস্‌লেন, এ ত মায়ের কাজ কর্‌লেন, এর ভিতরে আবার কি আছে? তাঁর ভালবাসার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ করা উচিত।

যদুমণি—না, আপনি বুঝ্‌লেন না, আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা, তা হলে আর টাকাগুলো দিতে হবে না।

আমি—(দুই কানে হাত দিয়া) ছি, ছি, এমন কথা শুন্‌লেও পাপ হয়। আপনি ঐ সাধ্বীসতী সরলহৃদয়া নারীকে আজও চেনেন নাই।

যদুমণি—আচ্ছা, আমি ভুবনমোহন দাস এটর্নির নিকট চল্‌লাম, আইনানুসারে কি করা যায় আমাকে দেখ্‌তে হবে।

আমি উঠিয়া হাতে ধরিলাম, "বসুন বসুন, যা কর্‌বার আমরা করে দেব, ব্যস্ত হবেন না। স্নান করুন, আহার করুন, শান্ত হোন।"

তিনি আমার অনুরোধ উপরোধের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া ভবানীপুর যাত্রা করিলেন। আমার লেখা পড়িয়া রহিল, আমি তখনি ভুবনমোহন দাসকে লোকের হস্তে এক পত্র পাঠাইলাম, যেন এই উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির কথায় তিনি কর্ণপাত না করেন। ভুবন বাবুকে পত্র লিখিয়াই কমলকুটীরে কেশব বাবুর নিকট ছুটিলাম। তাঁহাকে গিয়া সমুদয় বিবরণ বলিলাম।

কেশব বাবু—কি আশ্চর্য্য! ওর মনে মনে এত সন্দেহ হচ্চে, তার কিছুই ত আমাকে জান্‌তে দেয় নি।

আমি—এই ত আমারই আশ্চর্য্য মনে হচ্চে। আপনি হ্যাণ্ডনোট যদি দিলেন, তাতে ষ্ট্যাম্প দেওয়া উচিত ছিল। ঐটে তার সন্দেহের কারণ হয়েছে।

কেশব বাবু—আরে ঐ হ্যাণ্ডনোট কি সে নেয়, কোনও মতে নিতে চায় না, অবশেষে কতটা টাকা নেওয়া গেল তার একটা লিখিত নিদর্শন তার কাছে রাখ্‌বার জন্য আমি জোর করে এটা লিখে দিলাম।

তিনি বলিলেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে তার টাকা ফেলিয়া দিবেন, এবং পরে তাহাই দিয়াছিলেন। যদুমণির জন্য যে বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা অপরকে দেওয়া হইল। যদুমণি টাকা লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। পরিশেষে ইউরোপে গিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ভুবনমোহন দাস মহাশয়ও এটর্নির পত্র না দিয়া

বন্ধুভাবে গোপনে টাকাটা ফেলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কেশব বাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু হায়, বলিতে লজ্জা হইতেছে! দলাদলিকে শত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করিতেছে! ইহা মানব-প্রকৃতিকে কিরূপ বিকৃত করে ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে! ইহার পরেও কেশব বাবুর অনুগত প্রচারকগণ তাঁহাদের সংবাদপত্রাদিতে শ্লেষ করিয়া লিখিলেন, যে, বিরোধীদল কি কম করিয়াছেন, আচার্য্যের নামে নালিশ পর্য্যন্ত করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; এবং ঐ শ্লেষের ভঙ্গীতে বুঝিতে পারা গেল যে, তাঁহাদের অভিপ্রায় যে আমি প্রধানতঃ ঐ কার্য্যে উদ্যোগী ছিলাম। ঐ শ্লেষোক্তি পাঠ করিয়া আমার চক্ষে জলধারা বহিল এবং দলাদলির অনিষ্ট ফল মনে বড়ই জাগিয়া উঠিল।

আবার সমাজের কাজের কথা বলি। মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতা ফিরিবার কয়েক মাসের মধ্যেই আমার প্রতি এক মহাকাজের ভার পড়িয়া গেল। সেটী অৰ্দ্ধনির্ম্মিত উপাসনা-মন্দিরটীকে সম্পূর্ণ করিবার উপায় বিধান করা। ১৮৭৯ সালের প্রারম্ভে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তখন আনন্দমোহন বসুর শ্বশুর ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় ছুটীতে ছিলেন। তিনি দয়া করিয়া ঐ মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যের ভার লইতে চাহিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রুড়কি ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র বিনা ব্যয়ে প্ল্যান প্রভৃতি করিয়া দিয়া বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। নির্ম্মাণকার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৮৮০ সালের মাঘোৎসব অৰ্দ্ধনির্ম্মিত মন্দিরের মধ্যেই হইল। তখন আশা করা গিয়াছিল যে, ১৮৮১ সালের মাঘোৎসব সমাধাপ্রাপ্ত মন্দিরের মধ্যেই হইবে। কিন্তু ১৮৮০ সালের আগষ্ট মাসে দেখা গেল যে, অবশিষ্ট কয়েক মাসের মধ্যে অবশিষ্ট কার্য্য শেষ হওয়া কঠিন। ভগবান বাবুর উদ্ভাবনী শক্তি বড় প্রবল ছিল। তাঁহার

মাথাতে অনেক পরামর্শ আসিত। এজন্য নানা কাজের সৃষ্টি করিয়া তিনি অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য হাতে লইয়া তিনি ভাবিলেন, যে, নেপাল তরাই হইতে শালকাঠ আনাইলে সস্তা হইতে পারে। তদনুসারে নেপাল তরাইয়ে শালকাঠের অর্ডার দিয়াছিলেন। সে কাঠ কয়েক মাস ধরিয়া নানা নদ নদী দিয়া ভাসিয়া আসিবে। কাজেই বিলম্ব হইতে লাগিল। অবশেষে কাঠ যখন আসিল, তখন তাহার অনেক কাঠ কম-মজবুত বোধ হইল। কি করা যায়, কি করা যায়, করিতে করিতে দিন যাইতে লাগিল। ওদিকে ভগবান বাবু স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন। তখন কমিটি অনন্যোপায় হইয়া গুরুচরণ মহলানবিশ ও আমার প্রতি মাঘোৎসবের পূর্ব্বে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিবার ভার দিলেন। আমি এরূপ কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কি করিতে হইবে বুদ্ধিতেই আসে না, মহা চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। অবশেষে রাত্রে শয়ন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে এক পরামর্শ মনে পড়িয়া গেল। আমি যখন ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলাম, তখন সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার রাধিকাপ্রসাদ মুখুয্যে মহাশয়ের সহিত আমার বন্ধুতা হয়। এই বিপদে তাঁর শরণাপন্ন হইব বলিয়া স্থির করিলাম। পরদিন প্রাতে স্নান উপাসনা সমাপন করিয়া রাধিকা বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার মুখে সমুদয় বিবরণ শুনিয়া এ কাজের ভার লইতে স্বীকৃত হইলেন। তৎক্ষণাৎ টম্‌টম্ যোতা হইল, আমরা দুইজনে মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তিনি অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া নেপাল-সমাগত কাঠ বাছিয়া যেগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে সেগুলিতে খড়ির দাগ দিলেন। কি প্রণালীতে মন্দিরের অবশিষ্ট কার্য্য শেষ করিতে হইবে তাহা আমা-দিগকে জানাইলেন; এবং লোহার থাম ও কড়ি কোথায় পাওয়া যাইবে তাহা লিখিয়া দিলেন এবং তৎপরেই নিজে কতকগুলি থামের মাথায়

বসাইবার মত লোহার বাক্সের অর্ডার দিবার জন্য সেই টম্‌টমে চিৎপুরের লোহার কারখানাতে চলিয়া গেলেন। আমাকে তৎপর দিন প্রাতে তাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন। আমার মাথার বোঝা যেন নামিয়া গেল। তৎপরদিন ভবানীপুরে তাঁহার ভবনে গিয়া দেখি একজন কণ্ট্রাক্‌টর বসিয়া আছেন। তাঁহাকে তিনি ডাকাইয়া আনিয়াছেন। সেই কণ্ট্রাক্‌টরের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট স্থির হইল। পরদিন লেখাপড়া হইল; অগ্রিম টাকা দেওয়া গেল। দুই দিনের মধ্যে মন্দিরের কাজ আরম্ভ হইল। মহলানবিশ মহাশয় প্রতিদিন নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। আমি সে দায় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম এবং মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১৮৮১ সালের ১০ই মাঘ ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন হইতে নগর কীর্ত্তন করিয়া আসিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করা গেল। সেই এক দিন। আমরা গাইতে গাইতে আসিয়া দেখি বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মন্দিরের চাবি হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা পূর্ব্বক মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। মহোৎসাহে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা করা গেল।

এই বৎসরের শেষভাগে মান্দ্রাজ হইতে ঘন ঘন টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল—আসুন আসুন আসিতেই হইবে। ব্যাপারখানা এই—নববিধানের প্রচারক অমৃতলাল বসু মহাশয় তখন মান্দ্রাজ প্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া মান্দ্রাজে আসিয়াছিলেন। অমনি আমাদের বুচিয়া পাণ্টলু ভায়া ভয় পাইয়া ঘন ঘন পত্র লিখিতে ও টেলিগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি যে কাজ গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাহা বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়। এরূপ স্থলে যাওয়া উচিত ছিল কি না সন্দেহ। যাহা হউক কমিটি আমাকে

পাঠাইলেন। গিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলাম। অমৃত বাবুর সঙ্গে আমার বহুদিনের আত্মীয়তা, সুতরাং বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিতাম; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ চলিল। এই সময়ে আমি New Dispensation and Sadharan Brahmo Samaj নামে ইংরাজী পুস্তক রচনা করি। তাহা মান্দ্রাজ হইতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

বোধহয় এই বারেই আমি কোইম্বাটুর নগরে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যাই। সে সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনা স্মরণ আছে। মান্দ্রাজ সমাজের সম্পাদক রঙ্গনাথম্ মুদালিয়ার মহাশয় ও আমি একত্রে গমন করি। কোইম্বাটুর সমাজের সভ্যগণ পদনুর ষ্টেসন পর্য্যন্ত আগ বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রেলগাড়ীতে আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কোইম্বাটুরে অবস্থিতি কালে আমাকে জাতি মানিয়া চলিতে হইবে।

আমি—সে কি রকম হবে? আমি ত বহুকাল জাতি মেনে চলি নাই।

তাঁহারা—তা বল্‌লে কি হবে, তা না হলে এখানকার সব কাজ মাটি হবে।

আমি—আমরা বস্তুতঃ যা করি ও যা মানি তা মানুষের জানাই ভাল। আমরা জেতের প্রশ্রয় দিতে পার্‌বো না।

তাঁহারা—এ বাঙ্গলা দেশ নয়, এখানে জাত যে না মানে সে খ্রীষ্টান বলে পরিত্যক্ত হয়। এখানে অনেক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ও জাত রেখে চল্‌তে বাধ্য হয়েছেন।

বাস্তবিক তাই। পরে আমি পৈতাধারী খ্রীষ্টান দেখেছি এবং জাতমানা খ্রীষ্টানের সঙ্গে অনেক আলাপ পরিচয় হয়েছে।

এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে আমরা কোইম্বাটুরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি তাঁহারা আমাদের জন্য একটী স্বতন্ত্র বাড়ী

রাখিয়াছেন। আহারের সময় এক ব্রাহ্মণ পাচক আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। খাইতে গিয়া দেখি, কেবল আমার আসন, আমার বন্ধু রঙ্গনাথমের আসন নাই। জিজ্ঞাসা করাতে পাচক বলিল, "তিনি অন্যত্র খাইতেছেন।" কি করি একাই খাইলাম। আহারের পর তিনি আসিলে শুনিলাম, তাঁহাকে কোথায় একটা অন্ধকার গোয়ালঘরে লইয়া খাওয়াইয়াছে, তিনি শূদ্র তাই তাঁর এই শাস্তি। শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। সমাজের সভ্যেরা বৈকালে আসিলে তাঁহাদিগকে বলিলাম।

আমি—তোমরা কর কি? আমি ওঁর বাড়ীতে আহার করি, ওঁর স্ত্রী আমাকে রাঁধিয়া খাওয়ান, উনি সমাজের সেক্রেটারী, আমার বন্ধু, ওঁকে খাবার সময় অন্যত্র নিয়ে যাও কেন?

তাঁহারা—(হাসিয়া) এখানে আমরা কর্ত্তা, আমাদের বন্দোবস্ত, আপনি কিছু বলবেন না।

বন্ধু রঙ্গনাথমও বলিলেন, "যেমন চল্‌ছে চল্‌তে দিন, গোল কর্‌বেন না।"

কাজেই আমি মৌনাবলম্বন করিলাম, কিন্তু মনটা বড় প্রসন্ন রহিল না।

ইহার পর প্রাতে ও সন্ধ্যাতে আমাদের ভবনে সমাজের লোকের ও স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের জনতা হইতে লাগিল। প্রত্যেক সময়েই দেখি একটী লোক উপস্থিত থাকে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে বিছানাতে বসে না, মাটিতে বসিয়া থাকে। অনুসন্ধানে জানিলাম, সে একজন সমাজের সভ্য। এরূপে বসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে ব্যক্তি একজন পঞ্চমা; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ চারিবর্ণের বহির্ভূত অস্পৃশ্য লোক। সে সমাজের অনুরাগী সভ্য বটে, কিন্তু অপর সভ্যগণের সহিত একাসনে বসিতে সাহস পায় না। ক্রমে তাহার ইতিবৃত্তাদি তাহার মুখে শুনিলাম।

সে পুলিসে কাজ করে, সামান্য বেতন পায়, কোইম্বাটুর সহরের সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র কুটীরে সপরিবারে বাস করে।

একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার বাড়ী কতদূর, আমি তোমার ঘর ও স্ত্রীপুত্র দেখিতে চাই।"

সে—আপনি রোজ প্রাতে আমার বাড়ীর নিকট রাস্তা দিয়া বেড়াইয়া থাকেন।

আমি—বটে, তবে কাল পথে দাঁড়িয়ে থেক, আমি আস্‌বার সময় ডেকে নিয়ো।

সে—আপনি সকালে বেড়িয়ে এসে দুধ খান, আমার বাড়ী গেলে আপনার খাবার বিলম্ব হবে।

আমি—তুমি আমার জন্য একটু দুধ রেখ, আমি খেয়ে আস্‌ব, তাহলেই ত হবে।

এ প্রস্তাবে সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল, আমি তখন তাহার কারণ তত অনুভব করিতে পারিলাম না।

পরদিন প্রাতে আমি বেড়াইয়া আসিবার সময় তার বাড়ীতে গেলাম। তারা উঠানে একটী মোড়া দিল, তাহাতে বসিলাম, তার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিলাম, অনেক প্রশ্ন করিলাম, বাঙ্গলা দেশের ও ব্রাহ্মসমাজের কথা অনেক বলিলাম। তারা দুধ ও 'আপম' দিল, আমি খাইলাম।

ফিরিয়া আসিয়া ঘরে বসিতে না বসিতে এই কথা সহরে ছড়াইয়া পড়িল যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একজন পঞ্চমার ঘরে গিয়া দুধ ও 'আপম' খাইয়াছেন। সমাজের সভ্যগণ পিল পিল করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, "হায়, হায়, কি হলো, কি হলো!" আমি বলিলাম, "খাবার সময় এত কথা মনে হয় নি, আর সে অনুরোধ কর্‌লেই বা কিরূপে অগ্রাহ্য কর্‌তাম?"

ইহার পর লোকে জানিল আমি অন্য লোকের অন্ন খাই। তারপর সহরের শূদ্র ভদ্রলোকদের বাড়ীতে সদলে আমাদের নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। কয়েকদিন মহাভোজ চলিল। লোকে জানিয়া লইল যে আমি জাতি মানি না; ইহা জানিয়াও দলে দলে আমার বক্তৃতাদিতে আসিতে লাগিল। সভ্যগণের ভয় ভাবনা দূর হইয়া গেল।

এই যাত্রাতেই বোধ হয় আমি মহীশূরের রাজ্যান্তর্গত বাঙ্গালোর সহরে যাই। সেখানে সেনাদলের মধ্যে এক রেজিমেণ্টাল ব্রাহ্মসমাজ ছিল। এক সুবাদার সেই সমাজের প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং গোপাল-স্বামী আয়ার নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক ঐ সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। সমাজের কার্য্যের জন্য উক্ত সুবাদার একটী বাড়ী দিয়াছিলেন, তাহাতে একটী বালিকা-বিদ্যালয় হইত এবং সমাজের কাজও হইত। আমি গিয়া সেই বাড়ীতে থাকিতাম এবং গোপালস্বামী আয়ারের বাড়ীতে আহার করিতাম।

আমার যাওয়াতে বাঙ্গালোরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমার বক্তৃতা শুনিতে লোকারণ্য হইতে লাগিল। একটী বক্তৃতাতে মহীশূরের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান রঙ্গাচার্লু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

বাঙ্গালোর অবস্থিতি কালে এক ঘটনা ঘটিল যাহা চিরদিন স্মৃতিতে মুদ্রিত রহিয়াছে। একদিন এক স্থানীয় পরিবার তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে অনুরোধ করিলেন। গিয়া শুনি গৃহস্বামিনী এক ব্রাহ্মণ-কন্যা, বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে থাকিবার সময় এক শূদ্রের সহিত প্রণয়-পাশে বদ্ধ হন এবং পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তার অনুগামিনী হন। সেই অবস্থাতে একটী কন্যা জন্মিয়াছে। আমি যখন দেখিলাম তখন কন্যাটীর বয়স ১৬।১৭ বৎসর হইবে। পিতার মৃত্যু হইলে কন্যাটী স্বীয় মাতার সহিত ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রাচীন সভ্যের তত্ত্বাবধানে থাকে। সেই

অবস্থাতে আশ্রয়দাতারা মেয়েটাকে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিখাইয়াছেন। আমি মেয়েটাকে উভয় ভাষাতে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তাহার জননী তাহাকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় আনিয়া তাহার বিবাহ দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তখনও আমাকে অনেক স্থানে যাইতে হইবে বলিয়া আমি তাহা করিতে পারিলাম না।

কয়েক বৎসর পরে বাঙ্গালোরে আবার গিয়া মেয়েটার বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে লোকে বলিল যে তাহার মার মৃত্যু হইয়াছে, এবং মেয়েটি খারাপ হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া বড় দুঃখ হইল। মনে করিলাম কেন মেয়েটাকে সঙ্গে করিয়া আনি নাই, তাহা হইলে ত তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত রাখিতে পারিতাম।

এই সংবাদে তাহার অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে একদিন সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছি, তখন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে "একটী ভদ্রলোকের মেয়ে আপনার সহিত দেখা করিতে চাহিতেছে।" পার্শ্বের ঘরে গিয়া দেখি কমলাম্মা অর্থাৎ কমলিনী উপস্থিত। তখন ২২।২৩ বছরের মেয়ে। আমাকে দেখিবামাত্র সে আমার পায়ে কতকগুলি ফুল রাখিয়া আমার পায়ে পড়িয়া প্রণিপাত করিল এবং আপনার পতি বলিয়া একজন শূদ্রজাতীয় ভদ্রলোককে আমার সহিত পরিচিত করিয়া দিল। ক্রমে শুনিলাম, তাহার জননীর শেষাবস্থাতে ঐ শূদ্রজাতীয় ভদ্রলোকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার মাতার অভিভাবক সেই প্রাচীন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটী সে বিবাহ দিয়াছিলেন। ঐ বিবাহ অতি গোপনে হইয়াছিল বলিয়া লোকে জানে না। এই বিবাহের জন্য তাহার পতিকে স্বীয় সমাজে জাতিচ্যুত হইতে হইয়াছে, ইত্যাদি। শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। এই বিষয়টী নূতন ধরণের বলিয়া স্মরণ আছে। ইহার পরে আর তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই।

বাঙ্গালোর হইতে আমি মান্দ্রাজে ফিরিয়া আসিলাম এবং কিছুদিন পরে কলিকাতায় ফিরিলাম।

ইহার পরে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে যে যে বিশেষ কাজ হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম, এই সময়ের মধ্যে বালক-বালিকাদিগের জন্য দুইটি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথমটীর প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা ছিলেন, "সখা"-সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন। প্রমদা হেয়ারস্কুলে আমার নিকট পড়িত এবং সে সময় আমি ছাত্রদিগকে লইয়া যে-সকল সভা সমিতি করিতাম তাহাতে উপস্থিত থাকিত। সেই সময় হইতে সে আমাকে পিতার ন্যায় ভাল বাসিত এবং সর্ব্ববিষয়ে আমার অনুসরণ করিত। ধর্ম্মপুত্র কথাটি যদি কাহারও প্রতি খাটা উচিত হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে প্রমদা আমার ধর্ম্মপুত্র ছিল। ইহার পরে সে ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হয় এবং আমার বাড়ীর ছেলের মত হয়। সিটিস্কুল স্থাপিত হইলে সে তাহার একজন শিক্ষক হইয়াছিল। সে উদ্যোগী হইয়া অপর কয়েক জন যুবক বন্ধুকে লইয়া সিটিস্কুল ভবনে বালকদিগের জন্য একটী নীতিবিদ্যালয় স্থাপন করে। সাক্ষাৎভাবে আমার সহিত ঐ নীতিবিদ্যালয়ের যোগ ছিল না, কিন্তু আমি তাহার উৎসাহদাতা ও পরামর্শদাতা ছিলাম। মধ্যে মধ্যে তাহাতে উপস্থিত থাকিতাম ও উপদেশ দিতাম। যে নীতিবিদ্যালয়টীর সহিত আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিল, তাহা আমাদের উপাসনা-মন্দিরে বসিল। ইহার প্রধান উদ্যোগকারিণী ও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, আমাদের কয়েকটি কন্যা। গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের কন্যা সরলা, ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা লাবণ্যপ্রভা, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী এবং আমার কন্যা হেমলতা। হেম ইহাঁদের মধ্যে বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠা ছিল। আমি এই নীতিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা ও উৎসাহদাতা ছিলাম। এই কন্যাদের

সঙ্গে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতাম, নীতিবিদ্যালয়ের কার্য্যাদি বিষয়ে পরামর্শ করিতাম, ইহাঁদের সকল কাজে সঙ্গে থাকিতাম। কয়েক বৎসর পরে ইহাঁরা বালকবালিকাদিগের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। তখন আমি তাহার সম্পাদক হইয়া "মুকুল" নাম দিয়া এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলাম এবং কিছু দিন তাহার সম্পাদকতা করিলাম। ঈশ্বর-কৃপায় ঐ নীতিবিদ্যালয় এখনও আছে এবং প্রতি রবিবার প্রাতে ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে তাহার অধিবেশন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, ঐ কালের মধ্যে আর একটী কাজে হস্তার্পণ করিতে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিয়া রাখিতেছি। আমাদের সমাজের ইংরাজী সংবাদপত্র Brahmo Public Opinionএর যে ভাবে জন্ম হইয়াছিল, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এই কালের মধ্যে তাহাতে দুইটী পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রথম, ভুবনমোহন দাস মহাশয় ইহার রাজনীতিক ভাগের সম্পাদকতা ত্যাগ করেন; দ্বিতীয়তঃ, যে দুই বন্ধু ইহার স্বত্বাধিকারী হইয়া ইহার পরিচালন-ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা সে ভার ত্যাগ করেন। তখন সমাজের উহার স্বত্বাধিকারী হওয়া আবশ্যক হয় এবং আমি প্রস্তাব করি যে কাগজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, তাহাকে ধর্ম্মভাবপ্রধান করিয়া রাজনীতিকে দ্বিতীয় স্থানে রাখিয়া একখানি কাগজ বাহির করা হউক। তদনুসারে Indian Messenger নামে কাগজ বাহির করা হয় এবং আমি তাহার সম্পাদক হই। Indian Messenger প্রথমে অন্যের ছাপাখানাতে ছাপা হইত, তাহাতে অধিক ব্যয় লাগিত এবং প্রেসের সহিত আমার সর্ব্বদা ঝগড়াঝাটি হইত। সেজন্য সমাজের স্বতন্ত্র প্রেস করা আবশ্যক বোধ হইল। কিন্তু সমাজের সভ্যগণ অগ্রে একটী প্রেস করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া আর প্রেস স্থাপন করিতে নারাজ হইলেন। স্বর্গীয় বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয় কমিটিতে বার বার

আমার প্রস্তাবে বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু এই কয় বৎসরে আমার মনের ভাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, যেটী আমি সমাজের জন্য অত্যাবশ্যক মনে করিতাম সেটী আমাকে করিতেই হইত। বন্ধুরা যদি বাধা দিতেন তাহা হইলে নিজের শক্তিতে কুলাইলে নিজেই সে কাজ করিতাম, পরে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া সে কাজে লইবার চেষ্টা করিতাম। তদনুসারে নিজে টাকা কর্জ্জ করিয়া Brahmo Mission Press নামে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলাম। ঐ ঋণ পরে প্রেসের টাকা হইতে শোধ করা হইয়াছে।

এই প্রেস স্থাপন বিষয়ে আমাকে অতি কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অক্ষরওয়ালার সহিত অক্ষরের বন্দোবস্ত করা, বাজারে গিয়া প্রেস প্রভৃতি ক্রয় করা, প্রিণ্টার প্রভৃতি নিযুক্ত করা, কাজ চালাইবার উপযুক্ত লোক প্রভৃতি স্থির করা, প্রতিদিন তাহাদের কার্য্য পরিদর্শন করা, প্রভৃতি সমুদয় কাজ করিতে হইতে। ওদিকে এই মুদ্রাযন্ত্র সমাজের সম্পত্তি করাইবার জন্য সমাজের কমিটিতে গাঙ্গুলিপ্রমুখ বন্ধুগণের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে হইত।

বন্ধুরা কেহ কেহ বলিতেন, নিজে টাকা ধার করিয়া প্রেস করিয়াছেন, নিজের সম্পত্তি করিয়া রাখুন না, এত ঝগ্ড়া কেন? আমার মনের ভাব সেরূপ ছিল না। আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সমাজের নিজের একটী মুদ্রাযন্ত্র চাই, যাহা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারোপযোগী পুস্তক পুস্তিকাদি প্রকাশিত হইবে। এই জন্যই ইহার নাম ব্রাহ্মমিসন প্রেস রাখিয়াছিলাম এবং সমাজের হস্তে ইহাকে অর্পণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। কমিটির সভ্যগণকে আমার ভাবাপন্ন করিতে না পারিয়া কয়েক বৎসর প্রেসটী নিজের হাতে রাখিতে হয়, এবং চিন্তার ভার গ্রহণ করিতে হয়। অবশেষে সমাজ ইহা গ্রহণ করেন।

এই কালের মধ্যে একটী দুর্ঘটনা ঘটে। ১৮৮৪ সালের প্রথম

ভাগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার বহুমূত্র রোগ ধরা পড়ে। আমরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মমন্দির হইতে তাড়িত হওয়ার পর তাঁহার কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ভগ্নপ্রায় সমাজকে দণ্ডায়মান করিবার জন্য তাঁহাকে ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয়। তৎপরে আমাদের শ্লেষ, কটূক্তি প্রভৃতিতে তাঁহার মানসিক দুঃখ অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত করে। আমরা চলিয়া আসিবার অল্পদিন পরেই তাঁহার brain fever হইয়া তিনি বহুদিন শয্যাস্থ থাকেন। তৎপরে যদিও অসাধারণ মানসিক বল ও উৎসাহের প্রভাবে উঠিয়া কার্য্যারম্ভ করেন, তথাপি বার বার পীড়িত হইতে থাকেন। এই-সকল শারীরিক ও মানসিক পীড়ার মধ্যে আবার নববিধানের অভ্যুদয় করিয়া তাহার প্রচার ও পুষ্টি সাধনে দেহ-মনের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করেন। অনুভব করি এই-সকল কারণে তাঁহার বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হয়। প্রথমে তাঁহার নিকটস্থ বন্ধুগণ ঐ রোগের সঞ্চার অনুভব করিতে পারেন নাই। অবশেষে রোগ যখন ধরা পড়িল, তখন সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। নববিধানী বন্ধুগণ স্বীকার করুন আর নাই করুন, আমরাও তাঁহার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ১৮৮৩ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য শিমলা শৈলে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের স্থায়ী উপকার হইল না। ঐ সালের অক্টোবর মাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আমরা সংবাদ পাইলাম তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। সংবাদ পাইবামাত্র আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। তাঁর রোগের বিবরণ সব বলিলেন। পায়ের কাপড় সরাইয়া পা দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ আমার পায়ের গুলি কখনও এত সরু হয় নাই, এইটাই কুলক্ষণ।" আমি

বলিলাম, "ঈশ্বর করুন এযাত্রা আপনি সারিয়া উঠুন।" তারপর তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, আমি মধ্যে মধ্যে গিয়া দেখিয়া আসিতাম। তাঁহার পত্নীর মুখ যখন দেখিতাম, তখন চক্ষের জল রাখিতে পারিতাম না। কি সুখেই ভারতাশ্রমে ছিলাম, আর কি দুঃখই পরে ঘটিল, তাই মনে হইত। আমরা পরোক্ষভাবে তাঁহার মৃত্যুর অন্যতম কারণ এই মনে হইয়া সেই দুঃখ ঘনীভূত হইত।

পরে শুনিলাম যে চিকিৎসকগণ তাঁহাকে মাংসের যূষ খাওয়াইতেছেন, তাহাতে তাঁহার মূত্রে আলবুমেন (albumen) হইয়া, যকৃতে গ্রাভেল (gravel) দেখা দিয়াছে। শুনিয়া ছুটিয়া দেখিতে গেলাম। গিয়াই কমলকুটীরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনিলাম। রোগীর এরূপ আর্ত্তনাদ অল্পই শুনিয়াছি। নিকটে গিয়া দেখি তিনি যন্ত্রণাতে ছটফট করিতেছেন। শয্যাতে একপার্শ্বে স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। সে যন্ত্রণা, সে আর্ত্তনাদ, সে কাতরানি দেখিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না। ৮ই জানুয়ারি প্রাতে তাঁহার আত্মা নশ্বরধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিল। সে প্রাতে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। বৈকালে তাঁহার মৃতদেহ লইয়া পাদুকাহীন পদে সকলের সঙ্গে আমরা অনেকে শ্মশানঘাটে গেলাম এবং অশ্রুজলে ভাসিয়া এ জীবনের অন্যতম গুরুকে চিতানলে অর্পণ করিয়া আসিলাম।

এতদিন ঝগড়া করিতেছিলাম, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ যখন চলিয়া গেলেন, তখন মনটা কিছুদিন নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবিতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের সহিত ব্রাহ্মসমাজ লোকচক্ষে উঠিয়াছিল, তাঁহাতে নিরাশ হইয়া তাঁহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই যে পশ্চাতে পড়িল আর সম্মুখে আসিতেছে না। কোথায় তাঁর জীবনের মহাশক্তি, আর কোথায় আমাদের মত দুর্ব্বল অসার মানুষের চেষ্টা!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

১৮৮৪ সালে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ হইল। ১৮৮৮ সালে আমার বিলাত গমন পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যে যে যে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল তাহার সকলগুলি স্মরণ নাই। দুই একটী যাহা স্মরণ হইতেছে তাহা লিখিয়া রাখিতেছি।

প্রথম স্মরণীয় বিষয়: বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বড়বেলুন নামক গ্রামে প্রচার-যাত্রা। এই গ্রামে পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার নামে একজন অনুরাগী ব্রাহ্ম বাস করিতেন। তিনি কয়েকজন বন্ধুকে তাঁহার গ্রামে গিয়া ব্রহ্মোৎসব করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া যথাসময়ে বড়বেলুনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমরা গিয়া পুণ্যদাপ্রসাদের নির্ম্মিত একটী খড়ের ঘরে আশ্রয় লইলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি একটী যুবককে কি জিনিস ক্রয় করিবার জন্য বাজারে পাঠাইলাম। সে আসিয়া সংবাদ দিল যে দোকানে আমাদিগকে জিনিসপত্র বিক্রয় করিবে না। আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইল। কারণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনেকবার অনেক নগরে ও গ্রামে গিয়াছি, কিন্তু মানুষের এরূপ ভাব কোথাও দেখি নাই। পুণ্যদাপ্রসাদ আসিয়া বলিলেন গ্রামের জমিদার বাবু দোকানদারদিগকে কলিকাতা হইতে সমাগত বাবুদিগকে জিনিসপত্র যোগাইতে বারণ করিয়াছেন। পুণ্যদাপ্রসাদ নিজে দরিদ্র, তথাপি তিনি আমাদিগের প্রয়োজনীয় যাহা কিছু যোগাইতেন, কিন্তু তাঁহার বাড়ীর লোক বিরূপ, তাঁহাকেও দোকানীরা কিছু দিবে না। শুনিয়া আমার

বড় হাসি পাইল। বলিলাম—"এস, উপাসনা ত করি, তার পর দেখা যাক্ কি দাঁড়ায়।" এই বলিয়া স্নানান্তে আমরা উপাসনাতে বসিলাম। উপাসনান্তে উঠিয়া দেখি যে, পাশের ঘরেতে কে আমাদের জন্য জল-খাবার ও রাঁধিবার জন্য চাউল, ডাউল, তর্‌কারি প্রভৃতি ও ভোজন-পাত্রের জন্য বড় বড় পদ্মপাত রাখিয়া গিয়াছে। দেখিয়া ত আমাদের বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। উত্তমরূপে জলযোগ করিলাম। আমাদের একজন সেই পাশের ঘরেই উনুন কাটিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাসময়ে উত্তম আহার করা গেল। বৈকালে আমরা ধর্ম্মালোচনাতে নিযুক্ত আছি, এমন সময় কে আসিয়া সেই পাশের ঘরে আমাদের বৈকালে খাইবার সমুদয় আয়োজন রাখিয়া গিয়াছে। পুণ্যদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে এইরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইতেছে। তিনি কিছু সন্ধান বলিতে পারিলেন না। পরদিনও এইরূপ চলিল। আমরা ব্রহ্মোৎসব করিলাম; উপাসনা, পাঠ, ধর্ম্মালোচনাদি সকলি চলিল, গ্রামের এক প্রাণী একবার উঁকি মারিল না। তৃতীয় দিবস প্রাতে আমি বলিলাম, "গ্রামের এক প্রাণী ত এল না, চল আজ নগরকীর্ত্তনে বাহির হই।" আমরা ৭টার সময় নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলাম; দেখি মধ্যরাত্রে গ্রাম যেমন নিস্তব্ধ থাকে, তেমনি নিস্তব্ধ। যে পথ দিয়া যাই, সে পথের সকল বাড়ীর দ্বার বন্ধ, জনমানবের দেখা নাই। আমি বলিলাম, "আচ্ছা করিয়া কীর্ত্তন কর ত, লোকে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া আছে তাই থাক, ঈশ্বরের দয়ার কথা কানে ঢালিয়া দাও।" খুব উৎসাহে কীর্ত্তন চলিল। পথিমধ্যে এক বীভৎস ব্যাপার উপস্থিত। দেখি একজন লোক নগ্নদেহ হইয়া তাহার পরিধানের ধুতিখানি মাথায় বাঁধিয়াছে এবং তাহার হুঁকাটি বাঁশীর মত করিয়া নাচিতে নাচিতে আমাদের দিকে আসিতেছে! আমি বন্ধুদিগকে বলিলাম, "ওদিকে চাহিও না, গেয়ে চলে

যাও।” কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি, সে লোকটি লজ্জা পাইয়া কাপড় পরিয়াছে এবং অধোবদনে একদিকে চলিয়া যাইতেছে। তারপর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে আর এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। দেখি একদল নিম্নশ্রেণীর লোক মদ খাইয়া, ঢোল প্রভৃতি বাজাইতে বাজাইতে ও চীৎকার করিতে করিতে হুড়মুড় করিয়া আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। আমি সঙ্গীদিগকে বলিলাম, “ওদের যাবার পথ ছেড়ে দাও, তোমাদের গান চলুক, ওদিকে চেয়ে দেখো না।” তাহারা পথ পাইয়া চলিয়া গেল। আমরা আবার অগ্রসর হইলাম। শেষে আমরা একটা চৌরাস্তায় গিয়া উপস্থিত। আমি বলিলাম, “দাঁড়িয়ে খুব কীর্ত্তন কর, দেখি ওরা কতক্ষণ দ্বার বন্ধ করে থাকে।” কীর্ত্তন খুব জমিয়া গেল। অন্যে না শুনুক, আমাদের কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইতে লাগিল। শেষে দেখি, খট্ করিয়া একটা বাড়ীর দরজা খুলিল ও কয়েকজন লোক আসিয়া আমাদের নিকট দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি আর-একটা বাড়ীর দরজা খুলিল, আবার কয়েকজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্যক লোক আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন আমি বলিলাম, “আমাকে একটা উঁচু কিছু এনে দেও ত, আমি কিছু বল্‌ব।” পুণ্যদা ছুটিয়া গিয়া নিকটস্থ কোনও এক বাড়ী হইতে একটা খালি কেরোসীনের বাক্স আনিয়া দিলেন; আমি তাহার উপরে উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। “তোমরা দ্বার দিয়ে ছিলে কেন? ভগবানের নাম শুন্‌বে না? ভগবানের সঙ্গে কি তোমাদের বিবাদ আছে? তিনি ত সকলের প্রভু, সকলের পরিত্রাতা, ইত্যাদি ইত্যাদি।” এমন জোরে ও সুযুক্তিপূর্ণ ভাষাতে বক্তৃতা অল্পই করিয়াছি। দেখিলাম তাহাদের অনেকের চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। আমরা মহোৎসাহে কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাজঘরে আসিলাম। গ্রামবাসীদের অনেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজমন্দিরে

আসিল। তৎপরে জমিদার-বাবুদের ভাব বদলাইয়া গেল। তাঁহারা আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। আমরা ঈশ্বরের করুণার জয় গান করিতে করিতে কলিকাতায় ফিরিলাম। পরে শুনিয়াছি যে জমিদারগণ আমাদের খাওয়া বন্ধ করিতেছেন শুনিয়া গ্রামের নারীগণ দয়া করিয়া গোপনে গোপনে আমাদের খাবার পাঠাইতেছিলেন। সাধে আমি নারীকুলের এত গোঁড়া।

দ্বিতীয় স্মরণীয় বিষয়, একবার আমরা সমাজের চারিজন প্রচারক—অর্থাৎ নবদ্বীপচন্দ্র দাস, রামকুমার বিদ্যারত্ন, শশীভূষণ বসু, ও আমি—এই সংকল্প করিলাম, যে, আমরা হিমালয় পাহাড়ে কিছুদিন নির্জ্জনে বাস করিব।তৎসঙ্গে এই সংকল্পও করা হইল যে, কাহারও নিকটে সাহায্য ভিক্ষা করা হইবে না। আলোচনার পর স্থির হইল যে আমরা খার্সিয়াঙ্গে গিয়া থাকিব। দার্জিলিং বহুকোলাহলময়, ততদূর যাওয়া হইবে না। তদনুসারে আমরা খার্সিয়াঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একটী ঝুলি করিয়া তাহাতে যাহার যাহা দিবার মত ছিল, ফেলিয়া দিলাম। সেই ঝুলিটী বন্ধুবর নবদ্বীপচন্দ্র দাসের হস্তে রহিল। তিনি আমাদের কোষাধ্যক্ষ হইলেন। আমরা পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের নিকট ফ্রী পাশ পাইয়া খার্সিয়াঙ্গে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া সাধন ভজনে বসিলাম। একটী চাকর রাখিলাম, সে বাসন মাজিত, ঘর ঝাঁট দিত, ও অপরাপর কাজ করিত। নবদ্বীপ বাবু বাজার করিবার ভার লইলেন; শশী বিছানা তোলা ও ডাকঘরে যাওয়ার ভার লইলেন; বিদ্যারত্ন ভায়া খাওয়া ও লোকের সঙ্গে দেখা করার ভার লইলেন; আমি রন্ধনের ভার লইলাম। আমরা প্রত্যূষে উঠিয়া সমবেত উপাসনা করিতাম, তৎপরে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ ও উপাসনা করিয়া যে যেদিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতাম; এইরূপে দুই ঘণ্টা কাল

প্রত্যেকে একান্তে যাপন করিতাম। সেই সময়টা প্রত্যেকে নিজ নিজ অভীষ্ট প্রণালীতে চিন্তা, ধ্যান, উপাসনাদি করিতাম। আমাকে রন্ধনের জন্য সকলের অগ্রে ফিরিতে হইত। আমি বাড়ীর অনতিদূরে পাহাড়ের উপরে নির্ঝরের পার্শ্বে একখানি প্রস্তরের উপরে আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে প্রতিদিন বসিয়া চিন্তা ধ্যান ও উপাসনা করিতাম। একমাস এইরূপ সাধন করিয়া প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছিলাম। এমন কি, এখনও দার্জ্জিলিং যাইবার সময় সেই পাথর খানির উপর যখনি দৃষ্টি পড়ে, তখনি মনে উপাসনার ভাব উপস্থিত হয়। সেই সাধনের ফল চিরদিন রহিয়াছে। এখানে বাসকালে ব্রাহ্মবন্ধুগণ অনেকে দার্জিলিং যাইতে আসিতে আমাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য অর্থাদি দিয়া যাইতেন। এইরূপে প্রায় এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা একদিন উপাসনান্তে স্থির করিলাম যে, নামিয়া যাইব। তখন কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের অর্থের ঝুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে ফিরিতে যে ব্যয় হইবে তাহার এগারটী টাকার অপ্রতুল। ভৃত্যকে বেতন দিতে হইবে এবং বাড়ী ভাড়া দিতে হইবে, ইত্যাদি। আমি প্রস্তাব করিলাম, ভিক্ষা করা হইবে না; ভৃত্যকে আমার গায়ের মোটা কম্বল দেওয়া হইবে, ল্যাম্পটী বিক্রয় করা যাইবে, ইত্যাদি। তদনুসারে ল্যাম্পটী বিক্রয় করা গেল। আমি ভৃত্যের নিকট বেতনের প্রাপ্য অংশ স্বরূপ কম্বল দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। সে শুনিয়া হাসিতে লাগিল। আমরা যে এত দরিদ্র যে গাত্রের কম্বল দিয়া ভৃত্যের বেতন দিতে হয়, এ কথা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

অবশেষে কি করা যায়? আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভিক্ষা করাই স্থির হইল। আমি একজন ব্রাহ্মবন্ধুর নিকট ভিক্ষা করিবার জন্য চিঠি লিখিতে বসিলাম এবং আমার দেখাদেখি বিদ্যারত্ন ভায়া

দার্জিলিঙ্গের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়কে পত্র লিখিতে বসিলেন। দুই চারি পংক্তি লিখিয়াই আমার মনটা কেমন করিতে লাগিল। নিয়মটা ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হইল না। সুতরাং যে কয় পংক্তি লিখিয়াছিলাম, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। আমি পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, দেখিয়া বিদ্যারত্ন ভায়াও অর্দ্ধলিখিত পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সেই দিনেই দার্জিলিং হইতে আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান মিশনরি সি এইচ এ ড্যাল সাহেবের এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি পরশু নামিয়া যাইতেছি, তুমি কবে নামিবে? তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে, যদি সেই দিন যাও একসঙ্গে যাইতে পারি এবং সে কথাটা বলি।" আমি উত্তরে লিখিলাম, "আমাদের হাতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত গাড়িভাড়া দিবার পয়সা নাই, আমরা বোধ হয় হাঁটিয়া শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত যাইব।"

তৎপরদিন এক আশ্চর্য্য ঘটনা। ডাকযোগে কলিকাতা হইতে এক পত্র আসিল। খুলিয়া দেখি তাহার মধ্যে দশ টাকার করেন্সি নোট; প্রেরকের নাম নাই; কেবল এইমাত্র লেখা "আপনাদের খরচের জন্য।" কি আশ্চর্য্য! আমরা দশ টাকার জন্য ভাবিয়া আকুল হইতেছিলাম, ঠিক সেই দশটা টাকাই আসিয়া উপস্থিত। আমরা তখনই দেনপত্র শোধ করিয়া দার্জিলিং মেইলে শিলিগুড়ি নামা স্থির করিলাম। তদনুসারে পরদিন থার্ড ক্লাসের টিকিট লইয়া ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া আছি দেখি ড্যাল সাহেব আসিয়া উপস্থিত। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাঃ, এই তুমি লিখিলে পয়সা নাই, হাঁটিয়া শিলিগুড়ি নামিবে, আবার এ কি?" আমি হাসিয়া বলিলাম, একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। তিনি আমাকে টানিয়া সেকেণ্ড ক্লাসে তুলিয়া লইলেন, আমার সেকেণ্ড ক্লাসের অতিরিক্ত ভাড়া দিলেন, এবং শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা তাঁর মনে উদ্ভাবিত

একটা নূতন কাজের পরামর্শ বিবৃত করিতে করিতে আসিলেন। প্রস্তাবিত কাজটার বিষয়ে যতদূর স্মরণ আছে তাহা এই—তিনি প্রস্তাব করিলেন, এস আমরা একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটা সভা গঠন করি। তাহারা খ্রীষ্টান বা ব্রাহ্ম হউক আর না হউক কেবল নাস্তিক না হইলেই হইল। এই দলকে লইয়া এক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করি, ইত্যাদি। এই মূলভাবের অনেক শাখা প্রশাখা ছিল, সকল মনে নাই। কলিকাতায় ফিরিয়াই এই কার্য্যের সূচনার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু হায়, ড্যাল সাহেব কলিকাতায় পৌঁছিবার অল্পদিন পরেই গুরুতর কুক্ষিরোগে আক্রান্ত হইয়া মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই হিমালয়-বাসকালে আমি "হিমাদ্রি কুসুম" নামক এক পদ্যগ্রন্থের কিয়দংশ লিখি, তাহা পরে বর্দ্ধিত আকারে মুদ্রিত হয়।

বোধ হয় এই সময়েই বা ইহার কিঞ্চিৎ পরে আমি ধর্ম্মপ্রচারার্থ আসাম প্রদেশে গমন করি। ধুবুড়ী, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, তেজপুর, নওগাঁ, শিবসাগর, ডিব্রুগড় ও শিলং সমুদয় স্থানে গমন করি। যে কারণে এই প্রচার-যাত্রার বিবরণ মনে আছে তাহা এই—আমি ধুবুড়ী হইতে ডিব্রুগড় অভিমুখে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে একস্থানে আমার স্বর্গীয় বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি আসিয়া আমার সঙ্গে জুটিলেন। তিনি ভারতসভার সহকারী সম্পাদকরূপে ও সঞ্জীবনীর এজেণ্টরূপে আসিয়াছিলেন। আসামের কুলি আইনের কার্য্য বিষয়ে ও অপরাপর কোনও কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে জোটাতে এক নূতন ঘটনা ঘটিল। যেখানে যাই এবং বক্তৃতার নোটিস বাহির করি, সেইখানেই ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ সেখানকার উকীল ও অপরাপর ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "এ শিবনাথ শাস্ত্রী

কে, এ কি কুলিআইন প্রভৃতি রাজনীতিমূলক বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ আসিয়াছে ?” তাঁহারা বলেন “না, ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক।” প্রশ্ন, “তবে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি সঙ্গে কেন ?” উত্তর, “দুজনে বন্ধুতা আছে, সেজন্য এক সঙ্গে বেড়াইতেছেন এই মাত্র।” কর্ম্মচারিগণের সতর্কতার প্রমাণ কোন কোনও নগরে পাইলাম। সেই সেই স্থানের ডেপুটী কমিশনার প্রভৃতি ইংরাজ কর্ম্মচারীরা কেহ কেহ আমার বক্তৃতাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এমনকি ডিব্রুগড়ে যে দিন আমার বক্তৃতা হয় সেদিন ভয়ানক দুর্য্যোগ; বক্তৃতাস্থলে গিয়া দেখি স্থানীয় ভদ্রলোকেরা অনেকে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু ডেপুটী কমিশনার উপস্থিত।

আমরা ডিব্রুগড় হইতে ফিরিবার পথে শিবসাগর যাই। এখানে যাতায়াতে দুই বিভিন্ন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইল। যাইবার সময় ষ্টীমার-ঘাটে দেখিলাম, শিবসাগরের বন্ধুগণ আমার জন্য হাতী প্রেরণ করিয়াছেন। দুই বীরপুরুষে হাতীতে আরোহণ করিলাম। হাতীর যে মেজাজ আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখিবার ভাল সুযোগ হয় নাই। এবারে তাহা দেখিলাম। মাহুতের দুর্ব্যবহারেই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, হাতী পথের মধ্যে বড় রাগ করিল; এবং আমাদিগকে লইয়া পথ ছাড়িয়া এক পুষ্করিণীর মধ্যে নামিল। আমাদের পা জলে ডোবে আর কি ? হাসিব, কি ত্রস্ত হইব ও লাফাইয়া পড়িব, স্থির করিতে পারি না। শেষে মাহুত অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া মিষ্টকথা বলিয়া হাতীকে রাস্তাতে তুলিয়া আনিল। আমরা যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিবার সময় আর-এক বিপদ উপস্থিত। মধ্যে কয়েকদিন প্রবল বৃষ্টি হইয়া চারিদিক ভাসিয়া গেল। সংবাদ পাওয়া গেল যে ব্রহ্মপুত্র ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু কি করা যায়, আমাদের শীঘ্র আসা আবশ্যক, আমরা আমাদের যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য সেখানকার বন্ধু-

দিগকে অস্থির করিয়া তুলিলাম। তাঁহারা সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। যাত্রার দিন প্রাতে দেখিলাম, একটী হাতী আসিল। মনে মনে ভাবিলাম এটা বোধ হয় শান্ত শিষ্ট, পুষ্করিণীতে নামিবে না। কিন্তু আমরা আহারাদি করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলে দেখা গেল, যে, হাতী সেখানে নাই, বনের ভিতর কোথায় প্রবেশ করিয়াছে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। অবশেষে সেখানকার উকীল বন্ধুদিগের মধ্যে একজন আমাদিগকে তাঁহার গাড়িখানা দিলেন। যথাসময়ে গাড়িতে উঠিয়া কিয়দ্দূর গিয়া দেখি যে কাদা ঠেলিয়া যাওয়া ভার। কাদাতে গাড়ির চাকা বসিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে দ্বারিবাবু নামিয়া গাড়ি ঠেলিতে ও টানিতে লাগিলেন। ক্রমে গাড়িও ছাড়িয়া দিতে হইল। তখন আমরা মুটের মাথায় জিনিসপত্র দিয়া ৮ মাইল হাঁটিয়া ষ্টীমারঘাট পর্য্যন্ত যাওয়া স্থির করিলাম। কিন্তু নগরের বাহিরে মাঠের ধারে গিয়া দেখিলাম একখানা শাল্‌তি অর্থাৎ শাল কাঠের ডোঙ্গা আছে। চারিদিক জলপ্লাবিত হওয়াতে সেখানা নগরের পার্শ্বে আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে ভাড়া স্থির করিয়া দুই তিন জনে তাহাতে উঠিলাম। দুই দশ হাত যাইতে না যাইতে দেখা গেল যে শাল্‌তিখানার স্থানে স্থানে গর্ত্ত আছে, কাদা দিয়া তাহা বুজাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের ভারে কাদাগুলি ঠেলিয়া শাল্‌তির মধ্যে জল উঠিতে লাগিল। তখন আমরা নামিয়া পড়িলাম; এবং একহাঁটু জল ঠেলিয়া পদব্রজেই ষ্টীমার-ঘাটের অভিমুখে চলিলাম। সে এক কৌতুকের ব্যাপার। গাঙ্গুলি ভায়া আমার আগে আগে বিশ পঁচিশ হাত দূরে চলিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ দেখে কে? আমি অত চলিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কাজেই একটু পিছাইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে দুইজনে চলিয়াছি। হঠাৎ দ্বারি বাবু ডুবিয়া গেলেন! তখন ভারবাহক মুটের মুখে শুনিলাম, সেখানে একটা খাল ও তদুপরি এক পুল ছিল, ব্রহ্মপুত্রের জলবৃদ্ধি হইয়া খাল ভাসিয়া

পুল বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া দেখি, দ্বারি বাবু কিছু দূরে মাথা জাগাইয়া একবার উঠিয়া আবার "আমি গেলাম" বলিয়া ডুবিলেন। সে বার আমি নিরাশ হইলাম, ভাবিলাম খালের স্রোতে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে দেখি *কিয়দ্দূরে তিনি আবার মাথা জাগাইয়া হাত দিয়া যেন কি একটা* ধরিলেন। পরে জানিলাম, খালের পার্শ্বস্থ কোনও গুল্মের শাখা ধরিয়াছেন। খালের অপর পার্শ্বে কিয়দ্দূরে একখানা শাল্‌তি দাঁড়াইয়া ছিল, আমি তখন উচ্চস্বরে তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম। "বাবুকে বাঁচা, বাবুকে বাঁচা, বক্‌সিস কর্‌ব।" আমার চেঁচাচেঁচিতে তারা শাল্‌তিখানা লইয়া দ্বারি বাবুকে গিয়া তুলিল। তাঁহার সাম্‌লাইতে অনেকক্ষণ গেল। তৎপরে আমরা দুইজনে চলিতে লাগিলাম। বেলা অবসান হইয়া আসিতে লাগিল; তৃষ্ণায় দুই জনের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে; কাদা-জল পান করিতে পারি না। কি করি, কি করি, ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে পাইলাম, কিয়দ্দূরে একটা উচ্চ ভূমির উপরে একটা বাঙ্গলা ঘর দাঁড়াইয়া আছে। মনে ভাবিলাম সেখানে নিশ্চই মানুষ আছে, তারা জল দিতে পারিবে। উঠিয়া দেখি সেটা গবর্ণমেণ্টের ইনস্পেক্‌শন বাঙ্গলা, সেখানে একজন আসামী চাকর আছে। তার একটি পানীয় জলের কলস দেখিলাম। তার মুখে একটী বাটি চাপা। তার নিকট জল চাহিলাম। তারপর যে কথাবার্ত্তা হইল তাহা এই—

ভৃত্য—কিসে করে খাবে?

উত্তর—কেন তোমার ঐ বাটিতে করে দাও।

ভৃত্য—তা হবে না, তোমাদিগকে বাটি ছুঁতে দেব না। তোমরা "কলা বাঙ্গাল"; আমাদের জলপাত্র তোমাদের ছুঁতে দি না।

উত্তর—আচ্ছা, আমরা হাতে অঞ্জলি করে পাতছি, তাতে জল ঢেলে দাও।

ভৃত্য—হাতে ও বাটিতে যদি ঠেকাঠেকি হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে দ্বারি বাবু গাছের পাতা ছিঁড়িয়া আনিতে গেলেন, বলিয়া গেলেন, "আচ্ছা, আমি গাছের পাতা আন্‌ছি, তার বাটি করে তাতে জল দিবে।"

তাঁহার ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আমি সেই ব্যক্তির কাছে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বলিলাম, "তোমার কি লজ্জা হচ্ছে না,—যে ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদিগকেও সৃষ্টি করেছেন। বল্‌তে গেলে তুমি আমাদের ভাই। আজ এই বিপদের দিন, জলাভাবে প্রাণ যায়, তোমার জল আছে অথচ তুমি দিতে পার্‌ছ না। ভগবান যে জল সকলের জন্য দিয়েছেন, তাই একটু তুমি আমাদের জন্য দিতে পার্‌লে না, কি লজ্জার কথা!"

কেন জানি না, আমার কথা শেষ হইলে সে ব্যক্তি ধীরভাবে বলিল, "আচ্ছা, আমার বাটিতে জল খাও।" তখন আমি দ্বারি বাবুকে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "আসুন, আসুন, আমি একে ব্রাহ্ম করেছি, বাটিতে জল দিতে রাজি হয়েছে।" দুজনে কত হাসিলাম, তার বাটিতে পেট ভরিয়া জল পান করিলাম। আবার পদব্রজে জল ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইলাম। সন্ধ্যাকালে ষ্টীমারঘাটের ষ্টেসনে উপস্থিত। সেখানকার বাবুরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আশ্চর্য্য এই জলপ্লাবনে আপনারা এলেন কিরূপে? আমি হাসিয়া বলিলাম, "হস্তী দর্শন, গাড়ি কর্ষণ, নৌকা স্পর্শন, ও শেষে সন্তরণ।" ইহার অর্থ যখন ব্যাখ্যা করিলাম তখন একটা হাসাহাসি পড়িয়া গেল। তৎপর দিন আমরা উভয়ে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

১৮৮৭ সালের একটী বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা আছে। আমি উপবীত পরিত্যাগ করার দিন হইতে আমার পিতাঠাকুর মহাশয় আমাকে এক-প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদবধি এই দীর্ঘকাল আমার মুখ দেখেন নাই। প্রথম-প্রথম আমি মাতাঠাকুরাণীকে দেখিবার জন্য গ্রামে গেলে, গুণ্ডা আনিয়া আমাকে মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিতেন। কয়েক বৎসরে এইরূপে নাকি ২০।২১ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালে সে প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিলে, নিজে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতেন। কিন্তু আমাকে বাড়ীতে থাকিতে ও খাইতে দিতে আপত্তি করিতেন না; বরং নিজে বাজারে গিয়া যে-সকল দ্রব্য আমি ভালবাসি তাহা কিনিয়া আনিতেন, মাকে বলিতেন, "কলা-ভোঁদড় ঘরে এসেছে, কলা কিনে এনেছি, খেতে দাও।" এইরূপ কিছুকাল চলিতেছিল। প্রথম-প্রথম আমার উপার্জ্জিত সিকিপয়সা লইতে চাহিতেন না। আমি আমার পিস্তুতো বড়ভাইয়ের হাত দিয়া শীতকালে কম্বল প্রভৃতি দিতাম, তিনি কৌশলে তাহা বাবার হাতে দিয়া দাম লইতেন; এবং সেই মূল্য গোপনে আমার মায়ের হাতে দিতেন। আমি যখন ভবানীপুরে সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলে কর্ম্ম করি, তখন আমার মধ্যম ভগিনীর বিবাহ হয়। সে সময়ে আমি বিবাহ-ব্যয়ের সাহায্যার্থ গোপনে মায়ের হাতে কিছু টাকা দিয়াছিলাম। পরে শুনিলাম যে বাবা তাহা জানিতে পারিয়া এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, ঘরের চালে আগুন দিয়াছিলেন, পাড়ার লোকে আসিয়া নিবাইয়াছিল। তৎপর এই ক্রুদ্ধভাব ক্রমে চলিয়া গিয়াছিল। তখন আমি মায়ের হাতে প্রত্যেক মাসে দশ টাকা করিয়া দিতেছি জানিয়া ক্রুদ্ধ হইতেন না; কিন্তু সে অর্থ স্পর্শ করিতেন না, তাহা মায়েরি থাকিত।

এইরূপ চলিতেছিল, মধ্যে বাবা কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া সংকল্প করিলেন, দেশভূমি পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইবেন, যেন আর অধম পুত্রের মুখ দর্শন করিতে না হয়। তাঁহারা কাশীতে বসিবার পূর্ব্বে গয়া বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিতে বাহির হইলেন। তখন আমি তাঁহাদের তীর্থভ্রমণের ব্যয়ের জন্য অর্থসাহায্য করিলাম, বাবা দয়া করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। ক্রমে তাঁহারা কাশীধামে আসিয়া বাস করিলেন। সেখানে বাবার মান সম্ভ্রম হইল। তাঁহার পেন্‌সনের টাকাতে ও আমার সামান্য সাহায্যে তাঁহারা সুখে বাস করিতে লাগিলেন। আমি আমার ভগিনী ঠাকুরদাসীকে পৈত্রিক ভিটাতে স্থাপন করিয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে লাগিলাম।

দিন একপ্রকার চলিতেছে। এমন সময় ১৮৮৭ সালের এক রবিবার রাত্রে আমি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে নামিয়াছি, এমন সময় কাশী হইতে আমার একজন ডাক্তার বন্ধুর নিকট হইতে তারে সম্বাদ পাইলাম যে পিতাঠাকুর মহাশয় গুরুতর পীড়িত, আমাকে অবিলম্বে যাত্রা করিতে হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজ-মোহিনীকে সঙ্গে লইয়া তৎপরবর্ত্তী ট্রেনে কাশী যাত্রা করিলাম। পরদিন দুপুর বেলা কাশীতে পৌঁছিয়া পথে সেই ডাক্তার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া শুনি বাবা ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত, নাড়ী নাই। আমি ডাক্তার সঙ্গে করিয়া বাবার বাসাতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহার নাড়ী নাই, তাহার উপর হিক্কা হইয়াছে। সকলে মহা উদ্বিগ্ন। এই অবস্থাতে আমি গিয়া যখন নিকটে দাঁড়াইলাম, তখন বাবা আঠার বৎসরের পর প্রথম আমার মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন। বিরাজ-মোহিনীকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। বিরাজমোহিনী যখন তাঁহার

পদধূলি লইয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন, তখন বাবা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ডাক্তার বন্ধুকে বাবাকে দেখিয়া পার্শ্বের ঘরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া সেই ঘরে গেলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন, যে, নাড়ী আবার পাওয়া যাইতেছে। আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিলাম। ইহার পরে আমি আমার জননীর দ্বারা বাবাকে আমার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলাম। বলিলাম, "আমাকে রোগের বিষয় বিশেষ বিবরণ না বলিলে আমি কিরূপে ডাক্তারকে বুঝাইয়া দিব।" তাই বুঝিলেন বলিয়াই হউক, বা তাঁহার যে দিন পীড়া হইয়াছে তৎপরদিনেই কিরূপে আসিলাম, এই ভাবিয়াই হউক, আমার উপবীত পরিত্যাগের আঠার উনিশ বছরের পরে বাবা আমার মুখ দেখিলেন ও আমার সঙ্গে কথা কহিলেন।

এত যে গুরুতর পীড়া তাহাতে বাবাকে কিছুমাত্র ম্লান বা বিষণ্ণ মনে হইত না। ডাক্তার হাত দেখিয়া বলিতেছেন, "নাড়ী পাওয়া যাচ্চে"। বাবা হাসিয়া বলিতেছেন "আনাড়ীর আবার নাড়ী!" মা কাঁদিতেছেন, বাবা তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে বলিতেছেন, "কেমন অস্ত্র দেখেছ, যার জন্য কাশীতে আসা তাই ঘটবার উপক্রম। কোথায় আমোদ করবে, না, কান্না। কাশীতে কিছু বিষয়-বাণিজ্য করতে আসি নি। মরতে এসেছি, সেই মরণ এসে উপস্থিত, তাতে আবার শোক কেন?" আমি বলিলাম, "বাবা! আপনি ত সহজ কথাগুলো বল্লেন, যার প্রাণ তা শুনবে কেন?" বাবা, "তবে ওঁর এখানে আসা উচিত হয় নি।" তার পর শোনা গেল যে কচি তালের জল দিলে হিক্কা থামিতে পারে। কচি তাল কোথায় পাওয়া যায় আমি সেই চেষ্টায় বড় ব্যস্ত হইলাম। পরদিন প্রাতে আমার একজন বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। বাবা হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ হে, তাল না পেলে এ তাল সামলাচ্চে না।"

তিনি যাইবার সময় হাসিয়া বলিয়া গেলেন, "এঁকে মারে কে? এমন মানসিক বল ত সচরাচর দেখা যায় না।"

যাহা হউক বাবা কয়েক দিনের মধ্যে সারিয়া উঠিলেন। তিনি অন্ন পথ্য করিলে, আমরা তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। আমাদের যাত্রা করিবার সময় তিনি বলিলেন, "আমি বৌমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আস্‌ব।" আমি বলিলাম, "না বাবা, তা হবে না। আপনার বৌমাকে ত আমি এনেছি, আমিই নিয়ে যাব, আপনার যাওয়া হবে না!" তিনি কোনও মতেই সে কথা শুনিলেন না; মহা চেষ্টাতে উঠিতে চাহিলেন। কি করা যায়, দুই জন লোক তাঁর কাধে হাত দিয়া তাঁহাকে শয্যা হইতে তুলিলেন এবং ধরিয়া আস্তে আস্তে সিঁড়ী দিয়া নীচে নামাইলেন, তারপরে বাবা কোনও মতে লাঠিতে ভর দিয়া ও মানুষের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে গলির মোড়ে বড় রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ির নিকট পর্য্যন্ত আসিলেন। যেই আমি ও বিরাজমোহিনী তাঁর পদধূলি লইয়া গাড়িতে উঠিলাম অমনি বাবা কাঁদিয়া মাথা ঘুরিয়া রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন। সেখান হইতে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাসায় লইয়া যাওয়া হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে বন্ধুবর দুর্গামোহন দাস ও তৎসঙ্গে ডেপুটী কলেক্টর বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় ইংলণ্ড গমনের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। দুর্গামোহন বাবু তাঁহাদের সঙ্গে আমাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া আমার জাহাজ-ভাড়া দিবার ইচ্ছা জানাইলেন। আমি আসিয়া বন্ধুগণের মধ্যে সেই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেই অপর কেহ কেহ অর্থসাহায্য করিতে চাহিলেন। তাঁহাদের সকলের প্ররোচনাতে আমি দুর্গামোহন বাবু ও পার্ব্বতীবাবুর সহিত ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। আমি সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট লইয়াছিলাম। দুর্গামোহন বাবু ও পার্ব্বতী বাবু ফার্ষ্টক্লাসে থাকিতেন। বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াই পার্ব্বতী বাবুর সামুদ্রিক বমন (Sea sickness) আরম্ভ হইল, তিনি নিজ ক্যাবিনে পড়িয়া রহিলেন। দুর্গামোহন বাবু একটু ভাল ছিলেন; কিন্তু দেশ হইতেই তিনি কাহিল হইয়া বাহির হইয়াছিলেন। আমি একপ্রকার পালাজ্বর লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে আমার জ্বর হইত। আমি জ্বরে ক্যাবিনে একা পড়িয়া থাকিতাম। পড়িয়া পড়িয়া সে সময়কার ভাবে এই গানটী বাঁধিয়াছিলাম। তাহা পরে কলিকাতায় প্রেরণ করি এবং তাহা বোধ হয় তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হয়, পরে ব্রহ্মসংগীত গ্রন্থে উঠিয়াছে।

সংগীত।

আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে—
আর কোন্ মা আছে এমন করে পালিতে জানে?
কি স্বদেশে কি বিদেশে, মা আমার সর্ব্বদা পাশে,
প্রাণে বসে কহেন কথা মধুর বচনে।

• আমি তো ঘোর অবিশ্বাসী, মাকে ভুলে থাকি দিবানিশি,
মা আমার সকল বোঝা বহেন যতনে।
এ অনন্ত সিন্ধুজলে, মা আমায় রেখেছেন কোলে,
কত শান্তি কত আশা দিতেছেন প্রাণে!
হায় আমি কি করিলাম, এমন মায়ে না চিনিলাম,
না সঁপিলাম প্রাণ মন এমন চরণে।

জাহাজে থাকিতে থাকিতে দুইটী ঘটনা দ্বারা আমি ইংরেজ-চরিত্র ও ফরাসী-চরিত্র উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারিলাম। প্রথম ঘটনাটী এই—আমাদের সঙ্গে একজন ইংরেজ যাইতেছিলেন। তিনি ছয়মাস পূর্ব্বে এদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, বেড়াইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি একদিন আহারে বসিয়া অপরাপর ইংরেজের নিকট এদেশীয়দিগকে খুব গালাগালি দিতে লাগিলেন। ভারতবাসী ইংরেজদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন ও নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া এদেশীয়দিগের প্রতি ঘৃণাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি তখন কিছু বলিলাম না। পরে আহারান্তে উপরকার ডেকে তিনি যখন বেড়াইতেছেন আমিও বেড়াইতেছি তখন আমি তাঁহার নিকট গিয়া ভদ্রভাবে বলিলাম, "আপনি টেবলে যে-সকল কথা বলিতেছিলেন, সে বিষয়ে আমি আপনার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি। আপনি ছয়মাস বৈ এদেশে আসেন নাই, বেশি দেখেন নাই, যা শুনেছেন তার অনেক ঠিক নয়।"

এই কথা শুনিয়াই মানুষটা মুখ ফিরাইয়া লইল, বলিল, "দর্‌কার নেই, আমি কিছু শুন্‌তে চাই না।" সেইদিন অবধি আমি তাহাকে ত্যাগ করিলাম, সে আমাকে ত্যাগ করিল। এক ষ্টীমারে এক ক্লাসে আছি, একসঙ্গে খাই, যেন কত দূরে আছি। আলাপ পরিচয় সম্ভাষণ নাই।

দ্বিতীয় ঘটনাটী এই। জাহাজ যখন গিয়া ফ্রান্সের মার্সেলিস বন্দরে দাঁড়াইল, তখন আমরা স্থির করিলাম যে একবার সহরটা দেখিতে যাইব। বড় বড় নৌকা আসিয়া জাহাজের মাল তুলিতেছে, আমি এক পাশে দাঁড়াইয়া আছি, অপেক্ষা করিতেছি, একটু ভিড় কমিলে নামিব। দেখিলাম, ফরাসি ভদ্রলোক দুই-একজন আসিতেছেন, তাঁহারা সেখান হইতে আরোহী হইবেন। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের বন্ধুরা তাঁহাদিগকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। একজন ভদ্রলোক বন্ধুকে তুলিয়া দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন আমি একপাশে দাঁড়াইয়া আছি। নিকটে আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছেন?"

আমি—হাঁ।

প্রশ্ন—আপনাদের পথে ক্লেশ হয়.নাই ত?

আমি—না, আমরা বেশ আসিয়াছি।

তিনি আমাকে চুরুট দিতে চাহিলেন, আমি তামাক খাই না শুনিয়া সেটা লুকাইলেন। শেষে বলিলেন, "আপনি কি তীরে যাইবেন? সাবধান, ভাল ইনটারপ্রেটার লইবেন, নতুবা লোকে ঠকাইবে।" এই বলিয়া যাইবার সময় একজন চেনা ইণ্টারপ্রেটারকে ডাকিয়া আমার কাছে দিয়া গেলেন। ইংরাজদের ব্যবহারের সহিত কি প্রভেদ!

সেই সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে আর-একটী স্মরণীয় ঘটনা আছে। জাহাজে আরোহীগণ আপনাদের বিনোদনের জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। সাহেব ও মেমদিগের নাচ, গান ও খেলা, সকলি চলিতে থাকে। আমরা মির্জাপুর নামক জাহাজে যাইতেছিলাম। তাহার ফার্ষ্ট ক্লাসের আরোহীগণ এইরূপ নাচ, গান, খেলা আরম্ভ করিলেন। সেকেণ্ড ক্লাসে চীন দেশ হইতে কতকগুলি ইংরাজ মিশনারি, কলম্বো বন্দরে

আসিয়া আমাদের সঙ্গে জুটিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আমি বলিলাম, আসুন, আমরা সপ্তাহে একদিন করিয়া সেকেণ্ড ক্লাসে বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করি ও প্রথম শ্রেণীর আরোহীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া শুনাই। ক্রমে আমাদের সাপ্তাহিক বক্তৃতা আরম্ভ হইল। তাহার এক বক্তৃতা আমাকে দিতে হইল। যদিও অনেকে আসিলেন না, যাঁহারা আসিলেন তাঁহারা সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এই উপলক্ষে নরওয়ে দেশের একজন ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় ও বন্ধুতা হইয়া গেল। তিনি ফাষ্ট ক্লাস ত্যাগ করিয়া অনেক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন।

ক্রমে আমরা লণ্ডনে উপস্থিত হইলাম। দুই দিনের মধ্যেই আমি ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষিণী মিস কলেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি তখন উত্তর লণ্ডনে হাইবরির সন্নিকটে এক বাড়ীতে একলা থাকিতেন। একটী চাকরাণী তাঁহার পরিচর্য্যা করিত। তদ্ভিন্ন বোধ হয় একটী ভ্রাতুষ্পুত্রীও তাঁহার সঙ্গে থাকিত। মিস কলেট বলিলেন, "তুমি এই উত্তর লণ্ডনে একটা থাক্‌বার জায়গা দেখে লও, দুজনে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হবে।" আমি তাঁহার কথা অনুসারে উত্তর লণ্ডনে ক্যামেডেন ষ্ট্রীটের পার্শ্বে, হিল-ড্রপ রোড নামক গলিতে এক পরিবারে থাকিবার স্থান করিয়া লইলাম। বাড়ী দেখিয়া বসিলাম বটে, কিন্তু বহুদিন মনটা দেশের দিকে পড়িয়া রহিল। পথে ঘাটে কেবল সাদা মানুষ। বাহির হইলেই সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া তাকায়, আমার ভাষা কেহ বোঝে না; আমি থাকি কি মরি কেহ দেখে না। এসব যেন আমার কেমন কেমন লাগিতে লাগিল। তাহার উপরে দেশ হইতে যে জ্বর লইয়া গিয়াছিলাম, তাহা ইংলণ্ডে পৌছিয়া কয়েকমাস ছিল। জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ঘরে পড়িয়া থাকিতাম, একবার উঁকি মারিবার একজন লোক ছিল না।

বাড়ীর মেয়েরা কেহ পুরুষের ঘরে প্রবেশ করিতেন না; চাকর একবার চা দিয়া যাইত, এই মাত্র। ইহার উপরে আবার প্রাণে শুষ্কতা অনুভব করিতে লাগিলাম। কোলাহলপূর্ণ রাজনগরে ঈশ্বর যেন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই অবস্থাতে কয়েকদিন বড় কষ্টে কাটাইলাম। এই সময়ে বা কিছুদিন পরে বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া একটি সংগীত বাঁধি, তাহা এই :—

জান্‌লাম না মা, বুঝ্‌লাম না মা, এ তোর রীতি কেমন ধারা,
থাক থাক লুকাও কোথায় করে আমায় দিশেহারা,
আমি আঁচল-ধরা ছেলে, যেতে হয় কি একলা ফেলে,
মায়ের মুখ না দেখতে পেলে ভয়ে ছাওয়াল হয় যে সারা।
যদি বল কি গুণ আছে, বাঁধা রবে আমার কাছে,
তুমি আপনার গুণে আপনি বাঁধা ও আমার মা চমৎকারা।

যে পরিবারে আমি থাকিবার স্থান পাইলাম, তাঁহারা ইংলণ্ডের মধ্য-শ্রেণীর নিম্নস্তরের লোক। তাঁহাদের মেয়েরা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া দরজা, জানালা প্রভৃতির পর্দা প্রস্তুত করিতেন, আর ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ গৃহস্বামী পিতা সেগুলি ভৃত্যের মস্তকে দিয়া ভদ্রলোকের বাড়ীতে ও দোকানে বিক্রয় করিয়া আসিতেন। সে পরিবারে বৃদ্ধ পিতা মাতা ও তিন কন্যা মাত্র ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা আপনাদের বাড়ীতে আমার ন্যায় আগন্তুক লোকও রাখিতেন। আমি যে সময়ে ছিলাম, সে সময়ে সে ভবনে আমি ছাড়া একজন জাপানী, তৎপরে তৎস্থানে একজন রুশীয়ান, একজন আইরিশম্যান ও দুজন ইংরেজ যুবক থাকিতেন। বাড়ীওয়ালী দুই দিনেই আমাকে চিনিয়া লইয়াছিলেন, এবং আমার কাপড় চোপড়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, এবং সর্ব্বদা লণ্ডন পরিদর্শন বিষয়ে জ্ঞাতব্য অত্যাবশ্যক সংবাদ সকল আমাকে দিতেন। তিনি আমাকে এমনি

চিনিয়াছিলেন যে, আমি চা খাইতে গেলেই হাসিয়া বলিতেন, "মিষ্টার শাস্ত্রী! রসো, রসো, তোমার গলায় আগে বিব্ (bib) বেঁধে দিই।" আমি তাঁহাদের ভবনে নিরুপদ্রবে ও সুখে বাস করিতে লাগিলাম এবং ক্রমে ইংরেজ সমাজের ভাল মন্দ দেখিতে লাগিলাম।

সাধারণ প্রজাদের মোটামুটি সত্যপ্রিয়তার ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্মরণ আছে। একবার মিস ম্যানিং আমাকে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি যাইব বলিয়া প্রস্তুত হইতেছি, আমার বাড়ীওয়ালী বলিলেন, তোমার প্যাণ্টালুন পার্টিতে যাইবার উপযুক্ত নয়, তুমি একটা নূতন কোট ও নূতন প্যাণ্টালুন করাইয়া লও।

আমি—আর সাত দিন পরে পার্টি, এর মধ্যে কি প্যাণ্টালুন ও কোট করা যাইবে?

বাড়ীওয়ালী—রসো, আমি একটা দরজীকে ডাক্‌ছি, সে বোধ হয় করে দিতে পার্‌বে।

যথাসময়ে একজন দরজী আসিল; সে আমার মাপ লইয়া গেল, এবং যথাসময়ে জিনিস দুটা দিবে বলিয়া গেল। দুদিন পরে তার স্ত্রী কাটা কাপড়গুলা লইয়া উপস্থিত। বলিল, "আপনার কাজের ভার লওয়ার পর, আমার স্বামীর স্কটল্যাণ্ড হতে একটা বড় কাজের ডাক এসেছে; অনেক দিন হতে এই ডাকের কথা বল্‌ছিল, এখন তাকে যেতেই হবে। আমরা কাপড় কেটেছি, কিছু সেলাই করেছি; আপনি আর কোনও দরজীকে ডাকিয়ে অবশিষ্ট করে নিন।" তাহারা যে কাপড় কাটিয়াছিল ও কিছু সেলাই করিয়াছিল, তাহার দাম লইতে চাহিল না। আমি মনে মনে ভাবিলাম, পাছে আমার অসুবিধা হয়, সেদিকে এদের এত দৃষ্টি। আমাদের দেশে শ্রমজীবীদের মধ্যে এটা দেখা যায় না।

আর একটি ঘটনা এই। আমি দেশে ফিরিবার সময় বাড়ীওয়ালী

একদিন একজন লোককে ডাকিলেন, সে আমার পুস্তক প্রভৃতি আনিবার জন্য একটি প্যাকিং কেস করিয়া দিবে। প্যাকিং বাক্সটি টিন দিয়া এমন করিয়া মুড়িতে হইবে যেন জাহাজে তাহাতে জল প্রবিষ্ট হইতে না পারে। মানুষটাকে ঠিক আমার মনের কথাগুলা বুঝাইতে দেরি হইতে লাগিল। হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কিছু বলে না। আমি তার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, ঠিক আমার মনের ভাবটা ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। যখন বুঝিল, তখন ঠিক সেইরূপ করিয়া দিবে বলিয়া ভার লইয়া গেল। কথা রহিল, যে, তৎপরদিন ১২ টার মধ্যে বাক্সটি আনিবে, আমরা আহারান্তে প্যাকিং আরম্ভ করিব। তৎপরদিন প্রাতে আহার করিতেছি, ঘড়িতে ১১টা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে, এমন সময়ে প্যাকিং বাক্সের শব্দ শোনা গেল। আমরা উঠিয়া গিয়া দেখি, সুন্দর বাক্সটি করিয়াছে, দোষ দেখাইবার কিছু নাই। বস্তুতঃ ইংরেজ কারিকরগণ যে কার্য্যটার ভার লয়, সেটা ভাল করিয়া করিবার চেষ্টা করে; সেটা লইয়া বসিয়া যায়, তাহার মধ্যে যত ভাল হইতে পারে তাহা করিয়া তোলে।

বস্তুতঃ সেখানকার প্রজাসাধারণের এই সত্যপরায়ণতার ও সততার জন্য দেশে এমন সকল কাজ চলিতেছে, যাহা এ দেশ হইলে দুদিন চলিত না। তাহার একটার উল্লেখ করিতেছি। আমি সে-দেশে পৌঁছিবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সে দেশের প্রজাসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা চলিতেছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস পাইতেছিলেন।

ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। মিষ্টার টয়েন্‌বী (Toynbee) নামে অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী যুবকের মনে হইল যে, তাঁহার যখন অবস্থা ভাল, উদরান্নের জন্য চিন্তা নাই, তখন তিনি তাঁহার জীবন কোনও

ভাল কার্য্যে দিবেন; তিনি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবার প্রয়াসে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন। এই সংকল্প করিয়া তিনি লণ্ডন সহরের পূর্ব্বভাগে আসিয়া একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; কারণ ঐ বিভাগেই অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী লোকের বাস। টয়েন্‌বী প্রথম প্রথম ঐ শ্রেণীর লোকদিগকে নিজ ভবনে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সঙ্গে পাঠ ও মৌখিক উপাসনাদি দ্বারা কার্য্যারম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার কার্য্যের আশ্চর্য্য ফল দেখা গেল, এবং অপর কয়েকজন শিক্ষিত যুবক আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। তাঁহারা নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শ্রমজীবীদিগকে রীতিমত শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের ফল ত্বরায় ফলিল। নৈশবিদ্যালয় করিয়া শ্রমজীবীদিগকে শিক্ষাদান করিবার জন্য চারিদিকে আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমে নানা স্থানে working men's institute নামে পাঠাগার-সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। ইহার কোনও কোনও মন্দির আমি গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ক্রমে টয়েন্‌বীর মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার স্বদেশবাসীগণ তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শনার্থ লণ্ডনের ঐ পূর্ব্ব-বিভাগে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের সন্নিধানে Toynbee Hall টয়েনবী হল নামে এক শিক্ষামন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। তাহা অদ্যাপিও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন লণ্ডনের ঐ পূর্ব্বভাগেই The People's Palace অর্থাৎ প্রজাকুলের প্রাসাদ নামে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল, তাহা এক্ষণে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষালয়-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। আমি সে প্রাসাদ দেখিয়াছি। তাহাতে নিম্ন-শ্রেণীর জন্য পাঠাগার, পুস্তকালয়, রঙ্গালয়, ভোজনাগার প্রভৃতি সকলই আছে। ঐ প্রাসাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে ইংরেজদের পরহিতৈষণার নিদর্শন দেখিয়া শরীর কণ্টকিত হইতে থাকে।

যাহা হউক, যে জন্য এ-সকলের উল্লেখ করিতেছি, তাহা এই। আমি গিয়া দেখিলাম, শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের মনে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উৎসাহ অতিশয় প্রবল। তাহার ফলস্বরূপ ঐ শ্রেণীর মানুষের মনে জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছে এবং তাহাদের ব্যবহারের জন্য চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক রাজপথে দুই-দশখানি বাড়ীর পরেই একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়। নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সেখানে নামমাত্র কিছু পয়সা জমা দিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে বই লইয়া যাইতেছে ও ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া সে পুস্তক আবার ফিরাইয়া দিতেছে। ইহার অনেক পুস্তকালয় দোকান-ঘরের মধ্যে। দোকানদার অপরাপর জিনিসের ব্যবসা করিতেছে, সেই সঙ্গে একপাশে একটি পুস্তকালয় রাখিয়াও কিছু উপার্জ্জন করিতেছে। ইহা ভিন্ন স্বল্পমূল্যে বিক্রেয় ব্যবহৃত পুস্তকের দোকান অগণ্য। এইরূপ একটি পুস্তকালয় বিশিষ্ট দোকানে গিয়া একদিন যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহা মনে রহিয়াছে। আমি দোকানে অন্য কাজে গিয়া দেখি, এক পার্শ্বে দুইটি আল্‌মারিতে কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে। মনে করিলাম পুস্তকগুলি স্বল্পমূল্যের ব্যবহৃত পুস্তক। জিজ্ঞাসা করিলাম এ-সব পুস্তক কি বিক্রয়ের জন্য ?

উত্তর—না, এটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরী।

আমি—এসব পুস্তক কারা লয় ?

উত্তর—এই পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা।

আমি—আমি কি বই লইতে পারি ?

উত্তর—হাঁ পারেন, এ ত সাধারণের জন্য।

তারপর আমি একখানি ৬৷৭ টাকা দামের বই লইয়া দুই আনা পয়সা জমা দিয়া ও আমার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া

আসিলাম। আবার সপ্তাহান্তে বইখানি ফেরৎ দিয়া আবার দুই আনা দিয়া আর-একখানি বই লইয়া আসিলাম। এইরূপ তিন চারি সপ্তাহের পর একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ ব্যবসা তোমরা কতদিন চালাইতেছ?"

উত্তর—গত ৮।৯ বৎসর।

আমি—মধ্যে মধ্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও না?

উত্তর—কিরূপে?

আমি—লণ্ডনের মত প্রকাণ্ড সহরে মানুষ একপাড়া হতে আর এক পাড়ায় উঠে গেলে খুঁজে পাওয়া ভার। মনে কর, যদি বই ফিরিয়ে না দিয়ে এ পাড়া হতে উঠে যায়, তা হলে বই কি করে পাবে?

এই প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহারা বলিল, "তা কি করে হতে পারে? এ যে আমাদের বই? তাকে উঠে যাবার সময় ফিরে দিতেই হবে।"

আমি—মনে কর যদি না দেয়!

তাহারা হাসিয়া কহিল, "সে হতেই পারে না।" বই না দিয়া যে কেহ চলিয়া যাইতে পারে, ইহা যেন তাহাদের ধারণাই হয় না।

অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক কোনও উপাসনা-স্থানে যায় না, এই অভাব দূর করিবার জন্য আমি যাইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সেখানে একটা কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। কোন কোন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ উপদেষ্টাগণ রবিবার রবিবার প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ও উদ্যান প্রভৃতির বৃক্ষতলে উপাসনা ও উপদেশ আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমি অনেক সময় এই-সকল উপাসনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতাম। দেখিতাম নিম্নশ্রেণীর নরনারী অনেকে দাঁড়াইয়া শুনিতেছে। কোনও কোনও স্থলে দেখিতাম যে ধর্ম্মপ্রচারকদের দেখাদেখি রাজনীতির

পক্ষীয়গণ এবং 'ব্রাড্‌লা'র দলের নাস্তিকগণও তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে আসিতেন। সে বড় কৌতুকের ব্যাপার। এক বৃক্ষতলে একজন খ্রীষ্টীয় উপদেষ্টা বাইবেল গ্রন্থখানা ঊর্দ্ধে ধরিয়া বলিতেছেন, "দেখ, এই গ্রন্থ ঈশ্বরদত্ত। ইহাতে তোমরা দুর্ব্বলতার অবস্থাতে বল, নিরাশায় আশা, শোকে সান্ত্বনা ও বিপদে আশ্রয় লাভ করিবে।" অপরদিকে কিয়দ্দূরে ব্রাড্‌লা'র একজন শিষ্য হয়ত চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "বাইবেল মানুষের গ্রন্থ, ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, ঈশ্বর বলিয়া যে কেহ কোথাও আছেন তার প্রমাণ কি? তোমরা বুদ্ধিজীবী জীব, ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়া শুনিয়া কাজ কর।" তখন রাজকার্য্যের ভার টোরীদিগের হস্তে ছিল। একজন বক্তা সেই টোরী গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করিতেছেন; তাহারা যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেছেন। এদিকে দেখি, একজন সামান্য ছুতার বা কামার, যাহার পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র, পদদ্বয় পাদুকাহীন, অঙ্গুলিগুলি বড় বড় চাটিম কলার ন্যায়, মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ, বামহস্তের উপর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টির আঘাত করিয়া, ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া বলিতেছেন, the Tories are rascals, অর্থাৎ টোরীরা বদ্‌মায়েস। যাহাকে তাহারা অন্যায় বা অসত্য বা অধর্ম্ম মনে করে তাহার প্রতি তাহাদের এতই ক্রোধ। নিম্নশ্রেণীর লোকের অনেক সভাতে উপস্থিত থাকিয়া দেখিতাম, তাহারা যাহাকে অন্যায় মনে করে, হৃদয়-মনের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছে, এবং যাহাকে সৎ মনে করে তাহাতে মন প্রাণ ঢালিয়া দিতেছে; গড়ের উপরে এই কথা বলি যে এই হীনশ্রেণীর লোকদের কথা শুনিয়া অনুভব করিতাম, ধর্ম্মবিশ্বাস ইহাদের মনে স্বাভাবিক।

কোনও দর্‌জীর দোকানে গিয়া কোনও কাপড়-চোপড়ের ফর্‌মাস দিয়া আসিতাম, একপ্রকার নিশ্চয় জানিতাম যে তাহা সময়ে পাইবই

পাইব। কথা ভাঙ্গা, কাজ করিতে বসিয়া কাজ না করা, সামান্য প্রবঞ্চনা করা, এ-সকল কাজকে সে দেশের সাধারণ লোক বড় ঘৃণার চক্ষে দেখে।

তৎপরে দেখিতাম, যেমন একদিকে দারিদ্র্য আছে, দুর্নীতি আছে, বিবিধ সামাজিক পাপ আছে, তেম্নি আর একদিকে সে-সকল দূর করিবার জন্য শত শত ব্যক্তির হস্ত প্রসারিত আছে। পাশ্চাত্য জগতের অন্য খ্রীষ্টীয় দেশে যাই নাই, সুতরাং সে-সকল দেশের নর-হিতৈষী পুরুষ ও মহিলাগণের কার্য্যের কথা জানি না; কিন্তু ইংলণ্ডে নরহিতৈষণার যে ব্যাপার দেখিলাম, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। মানব-বুদ্ধিতে যে জনহিতকর এতপ্রকার কার্য্য উদ্ভাবিত হইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্য। তাহার কতগুলির উল্লেখ করিব? অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লণ্ডনে ডাক্তার বার্ণার্ডোর অনাথাশ্রম বাটিকা ও ব্রিষ্টলে সাধু ভক্ত জর্জ মূলার মহাশয়ের অনাথাশ্রম বাটিকা যখন দেখিলাম, তখন বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ঈশ্বর-ভক্তি, নরহিতৈষণা বা কার্য্যদক্ষতা, কোন্‌গুণের অধিক প্রশংসা করিব! তৎপরে শ্রমজীবীদিগের ইনষ্টিটিউট, পীপলস্ প্যালেস, শ্রমজীবীদিগের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়, পুওর হাউস বা দরিদ্র-দিগের আশ্রয়-বাটিকা, প্রভৃতি যাহা দেখিতে লাগিলাম, তাহাতেই বিস্ময় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইংরাজ জাতির কিরূপ নরহিতৈষণা তাহার প্রমাণ-স্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। আমি যখন সেখানে তখন তিন প্রকার কাজের বিষয় আমার শ্রুতিগোচর হইল।

প্রথম মিষ্টার বেঞ্জামিন ওয়া নামে একজন পাদ্রী একদিন কোনও নগরের রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন যে একটী শিশু পথে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখে নানা আঘাতের দাগ, মুখ ফুলিয়া রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, তাহার পিতা বা মাতা মাতাল হইয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছে। তখন মিষ্টার ওয়ার মনে মনে প্রশ্ন উঠিল,

তবে ত পিতামাতার হস্ত হইতেও অসহায় বালক-বালিকাকে রক্ষা করা চাই। এই চিন্তা লইয়া তিনি ঘরে গেলেন, এই চিন্তা তাঁহার মনকে ঘিরিয়া লইতে লাগিল, এবং তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত ঐ বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার ফলস্বরূপ শিশুরক্ষিণী-সভা নামে একটী সভা স্থাপিত হইল; শত শত ব্যক্তি তাহার সভ্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তৎপরে এই কয়েক বৎসরে সেই সভার সভ্যগণ মহাকার্য্য সমাধা করিয়াছেন, শিশুরক্ষার জন্য পার্লেমেণ্টের দ্বারা নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। সে আইন অনুসারে শিশুদের প্রতি নির্দ্দয়তার জন্য পিতামাতাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। ইংলণ্ডের ন্যায় মাতাল দেশে এইরূপ আইন নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

আর একটী কার্য্যের সূচনাও এইরূপ কারণে হইয়াছিল। একদিন এক ভদ্রমহিলা লণ্ডনের রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, বৈকাল বেলা সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজপথে হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা, অর্থাৎ ১৬ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কা যুবতী স্ত্রীলোক বেড়াইতেছে। এরূপ দৃশ্য সেখানে নূতন দৃশ্য নহে, কিন্তু সেদিন ঐ দৃশ্য উক্ত মহিলার অন্তরে এক নূতন ভাবের উদয় করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই-সকল মেয়ে মফস্বল হইতে আসিয়াছে, কাজকর্ম্ম লইয়া এখানে বাস করে। কেহ দোকানে কাজ করে, কেহ পোষ্ট আফিসে কাজ করে। কেহ হোটেলে কাজ করে, সন্ধ্যা হইলে ছুটি পায়, রাস্তাতে বেড়ায়, দশজনে মেস করিয়া থাকে, পিতামাতা নিকটে থাকে না। ইহাদিগকে দেখে কে? এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি বাড়ীতে আসিলেন। স্বীয় পতির সহিত এই কথাতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং বন্ধু-বান্ধবের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই চিন্তা তাঁহাকে ঘিরিয়া লইল। অবশেষে

তাঁহারা কতিপয় মহিলা একত্র হইয়া একটি ছোট সভা করিলেন। প্রথমে লণ্ডনের যে বিভাগে এই শ্রেণীর বালিকা অধিক পরিমাণে বাস করে ও বেড়ায় সেই বিভাগে একটা বড় ঘর ভাড়া করিলেন। ঘরটী উত্তমরূপে সাজাইলেন, বসিবার উত্তম আসনের ব্যবস্থা করিলেন, একটা পিয়ানো লইয়া গেলেন। গানবাদ্যের সমুচিত ব্যবস্থা করিলেন এবং কতিপয় মহিলা বন্ধুতে মিলিয়া কে কে সপ্তাহের কোন্ কোন্ দিন সন্ধ্যার সময় এই গৃহে গিয়া মেয়েদিগকে গান বাদ্য শুনাইবেন ও মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবেন তাহা স্থির করিলেন। তৎপরে একদিন ছোট ছোট কাগজে একটি ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়া রাজপথে-ভ্রমণকারিণী বালিকাদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইল। "তোমরা যদি অমুক নম্বর বাড়ীতে নিম্ন তলের ঘরে এস, তবে তোমাদিগকে গানবাজনা শুনান হইবে," ইত্যাদি। প্রথম দিনে দুই একটা বালিকা আসিল। মহিলারা গান বাজনা শুনাইলেন, তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন, এবং তাহারা কোথায় থাকে, কিরূপ সঙ্গে বেড়ায়, কিরূপে দিন কাটায়, এই-সকল সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। তাহারা সেদিন আপ্যায়িত হইয়া ফিরিয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যার সময় বহুসংখ্যক বালিকা উপস্থিত হইল। ক্রমে আর সে ঘরে লোক ধরে না। একটীর পর আর-একটী এইরূপ করিয়া লণ্ডনের সেই বিভাগে ক্রমে ক্রমে সাত আটটী ঘর লইতে হইল। শত শত যুবতী স্ত্রীলোক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ঐ-সকল গৃহে আসিয়া গান বাজনা উপদেশাদি শুনিতে লাগিল। এদিকে উদ্যোগকারিণী মহিলাদের সভা বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য পরোপকার-প্রবৃত্তি!

একটী কার্য্যের কথা তখন শুনিলাম। ইহার আয়োজন বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই হইয়া থাকিবে। সে কাজটী এই। একবার কয়েকজন

ভদ্রলোক এই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, "যাহারা একবার কোনও অপরাধে লিপ্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহারা যখন কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, তখন বাহিরে আসিলে ত আর পূর্ব্বের ন্যায় সমাজে মিশিতে পায় না, লোকে তাহাদিগকে কাজ দিতে ভয় পায়, ঘরে রাখিতে ভয় পায়, সমাজে তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লজ্জা বোধ করে। তখন তাহাদের কি অবস্থা দাঁড়ায়! এই কারণেই বোধ হয় অনেক কারামুক্ত লোক আবার অপরাধে লিপ্ত হইয়া কারাগারে ফিরিয়া যায়। কারামুক্ত মানুষদিগকে সুপথে রাখিবার জন্য ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কিছু করা যায় কি না?" এই চিন্তা করিতে করিতে কতিপয় ভদ্রলোক "কারামুক্তের সাহায্য-সভা" নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। তাহার ফল এই হইয়াছে যে ইংলণ্ডের অনেকগুলি কারাগার কয়েদীহীন হইয়াছে। সেখানকার সহৃদয় মধ্যবর্ত্তীশ্রেণীর পুরুষ ও নারীগণের পরোপকারস্পৃহার কথা অধিক কি বলিব। সেখানে অনেক ভদ্র-মহিলা হাঁস্‌পাতালে রোগীগণের নিকট ফুলের তোড়া পাঠাইবার জন্য স্থানে স্থানে সভা করিয়াছেন; নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র শিশুদিগকে বড়দিনের সময় পুতুল উপহার দিবার জন্য বড় বড় সভা করিয়াছেন; বড় বড় সহরে নিম্ন-শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগকে মধ্যে মধ্যে সহরের বাহিরে লইয়া গিয়া বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করাইবার ও প্রকৃতির শোভা দেখাইবার জন্য সভা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মানবের পরহিতৈষণা-প্রবৃত্তি হইতে কতপ্রকার সদনুষ্ঠান উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়।

তৎপরে সেখানে গিয়া যাহা প্রধানরূপে আমার চক্ষে পড়িল এবং যাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম, তাহা নারীজাতির উন্নত অবস্থা। আমি প্রায় প্রতিদিন দেখা হইলেই দুর্গামোহন বাবুকে বলিতাম,

"দুর্গামোহন বাবু, এ ত মেয়ে-রাজার দেশ, মেয়েদের গুণেই এ দেশ এত বড়।" তিনি বলিতেন, "তাই ত এখন বুঝিতেছি, কেন নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের মেয়েদের মতন মেয়ে দেও, আমি ফ্রান্সকে সামাজিকভাবে বড় করিয়া তুলিতেছি।" বস্তুতঃ ইংলণ্ডে গিয়া আমার এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে ইংলণ্ডের মহত্বের পশ্চাতে ইংলণ্ডের নারীগণ। আমি ধনী রমণীগণের সহিত মিশিবার অবসর পাইতাম না, সুতরাং তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্রের কথা কিছু বলিতে পারি না; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মিশিতাম, সুতরাং তাঁহাদের বিষয়ই জানি। এদেশের লোক অবরোধপ্রথার মধ্যেই বর্দ্ধিত, সুতরাং তাঁহাদের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল যে নারীগণ স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র গতায়াত করিলে তাহারা আপনাদের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে না। এ যে কি ভ্রান্ত ধারণা, তাহা একবার ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের সহিত মিশিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন নারীকুলের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্য, নারীকুলের রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের জন্য, নারীকুলের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। তাহার ফলস্বরূপ নারীগণের মধ্যে এক নূতন ভাব ও উন্নতি-স্পৃহা দেখা দিয়াছিল। তাহার ফলস্বরূপ সকল ভাল কাজে, সকল উন্নতির চর্চ্চাতে, সকল আলোচনাতে, সকল সদনুষ্ঠানে নারী-দিগকে দেখিতাম। কোনও সদনুষ্ঠানের সভাতে গিয়া দেখি অর্দ্ধেকের অধিক নারী; কোনও প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যের উপদেশ শুনিতে গিয়া দেখি, নারী ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে হয়; কোনও বন্ধুর ভবনে কোনও সদালোচনার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া দেখি, অর্দ্ধেকের অধিক নারী। দুই-একটী বিষয় উল্লেখ করিলেই সেখানে নারীগণের কি অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমি যাঁহাদের ভবনে থাকিতাম-

তাঁহাদের বর্ণনা অগ্রেই করিয়াছি। তাঁহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর মধ্যবিত্ত পরিবার বলিলেও হয়। তাঁহারা দ্বার-জানালার পর্দা সেলাই করিয়া বিক্রয় করিয়া খাইতেন। অথচ বৃদ্ধ পিতাকে প্রতি সোমবার গৃহের নারীগণের পাঠের জন্য মুডীর সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকালয় হইতে একতাড়া বই আনিতে হইত। সপ্তাহকাল গৃহের তিন কন্যা ও তাহাদের মাতা ঐ-সকল পুস্তক পাঠ করিতেন। সেগুলি ফিরাইয়া দিয়া আবার সোমবার নূতন পুস্তক আসিত। কোনও দিন সায়ংকালীন আহারের পর মহিলাদের বসিবার ঘরে যদি উঁকি মারিতাম, দেখিতাম যে তাঁহারা সকলেই পাঠে গভীর নিমগ্ন আছেন। এই পাঠ রাত্রি ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত চলিত। গৃহস্বামীর বড় মেয়েটী ভোজনের সময় আমার পার্শ্বে ভোজনে বসিতেন। আমি ইংরাজ কবি শেলি ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভক্ত ইহা দেখিয়া তিনি আমাকে শেলির অনেক কবিতা মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন; এবং শেলির প্রতিভার প্রশংসা করিতেন। আমি একদিন এডুইন আর্নল্ডের লিখিত (Indian Idylls) ইণ্ডিয়ান আইডিল্স্ নামক কবিতা-পুস্তক কিনিয়া আনিয়া মেয়েটিকে উপহার দিলাম। বলিলাম, “এই কবিতাগুলি তুমি পড়, পরে তোমার মুখে শুনিব আমাদের দেশের প্রাচীন কবিতা তোমার কেমন লাগিল।” ঐ গ্রন্থে রামায়ণ মহাভারত হইতে সাবিত্রী-চরিত প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। মেয়েটী পুস্তকখানি পাইয়াই সেই রাত্রে প্রায় ১টা ২টা পর্য্যন্ত পড়িল। তৎপরদিন প্রাতে আহারে বসিয়া আমাকে বলিল, “ও মিষ্টার শাস্ত্রী, তোমাদের সাবিত্রীর ছবি কি সুন্দর! কি সুন্দর! কতদিন পূর্ব্বে এ ছবি আঁকা হয়েছে?” আমি হাসিয়া বলিলাম, “যীশু জন্মাবার দুই চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কি পরে ঠিক বলিতে পারি না।” তখন মেয়েটী বলিল, “যে জাতি এতদিন পূর্ব্বে এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছে, সে জাতি ত সামান্য জাতি নয়!”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, একটী বিষয়ের উল্লেখ করিলেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। আমার সেখানে অবস্থান কালে একটী বাঙ্গালি যুবকের মুখে যে ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিতেছি। ঐ যুবকটি মফঃস্বলে কোনও স্থানে বাস করিতেন। সেখানে নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর এক যুবকদম্পতীর গৃহে বাসা লইয়াছিলেন। তাহাদের বাড়ীর বাহির দিকে একটী দোকান ছিল, তাহাতে কিছু আয় হইত; এবং তদ্ভিন্ন তাহারা বাড়ীর মধ্যে একটী ঘরে একটী ভাড়াটিয়া লইত, তাহার ঘরভাড়া ও খাইখরচ হিসাবে কিছু পাইত। বাড়ীতে চাকর-বাকর ছিল না, মেয়েটীই সব কাজ করিত। মেয়েটীর বয়স তখন ২২।২৩ এর অধিক হইবে না। আমাদের বাঙ্গালি যুবকটীর বয়স বোধ হয় ২৬।২৭ হইবে। মেয়েটীর পতিরও ঐ বয়স। আমাদের বাঙ্গালি যুবক বড় সৎলোক। তাঁহাকে পাইয়া যুবকদম্পতী আনন্দিত ছিল। কিন্তু এদিকে এক বিপদ উপস্থিত। মেয়েটী সরলভাবে যখন যুবকটীর কাছে আসে, চা আনিয়া দেয়, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া আনে, এটা ওটা করিতে বলে, নির্জ্জন গৃহে কাছে আসিয়া, কেমন আছ, তোমার মুখ কেন শুক্‌নো, প্রভৃতি প্রশ্ন যখন জিজ্ঞাসা করে, তখন আমাদের বাঙ্গালি যুবকটীর চিত্ত বড় বিচলিত হয়। কিন্তু আমাদের ছেলেটী ভাল বলিয়া সে মনে মনে এই সংগ্রাম নিবারণ করে, মেয়েটিকে কিছুই জানিতে দেয় না। এই অবস্থাতে সে অবশেষে স্থির করিল

যে সে-বাড়ীতে আর তার থাকা উচিত নয়, কখন্ কি বলিয়া ফেলিবে, কখন্ কি করিয়া বসিবে, তার ঠিক কি! একটা মহা ক্লেশকর ব্যাপার ঘটিবে। এই ভাবিয়া সে স্থির করিল যে আর সে সে-বাড়ীতে থাকিবে না; অন্যত্র বাসা লইবে। এই স্থির করিয়া একদিন সায়ংকালীন আহারের সময় কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া যুবকদম্পতীকে ঐ সংকল্প জানাইল। তাহারা উভয়েই মহাদুঃখিত হইয়া তাহাকে থাকিবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন আর সে অধিক কিছু বলিতে পারিল না; সে যে ঘোর প্রলোভন ও সংগ্রামের মধ্যে বাস করিতেছে তাহা জানিতে দিল না। দুশ্চিন্তাতে রাত্রে তাহার ভাল নিদ্রা হইল না। পরদিন দুপুর বেলা মাথা ধরিয়া সে অসময়ে কলেজ হইতে বাড়ীতে আসিল। তখন একাকিনী সেই মেয়ে ঘরে আছে, পতি দোকানে। সে আসিয়া মেয়েটাকে বলিল, "দেখ, আজ মাথাটা বড় ধরেছে, আমাকে এক পেয়ালা চা করে দিতে পার?" মেয়েটী বলিল, "পারি বৈ কি।" এই বলিয়া চা প্রস্তুত করিতে গেল। চা লইয়া আমাদের যুবকের নির্জ্জন বৈঠক-গৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হয়েছে? কেন মাথা ধরেছে? তোমার মুখ বড় খারাপ দেখাচ্ছে, রাত্রে কি ঘুমাও নাই? তোমার মনে কোনও অসুখ নিশ্চয় আছে, কি তা বল না, আমাদের দ্বারা যদি দূর হয় আমরা তা কর্‌তে রাজি আছি। ইত্যাদি।

এই সন্ধিক্ষণে আমাদের যুবকটী মেয়েটীর মুখের দিকে চাহিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। মনের আবেগে তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল, "তুমি বসো, আমি বলিতেছি।" এই হাত ধরিবার ভাবে ও মুখের ভাবেই মেয়েটী আসল কথা বুঝিতে পারিল। এতদিন তাহার কাছে যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল, "এ কি মিষ্টার অমুক, তুমি না

বিবাহিত লোক? তোমার না দেশে স্ত্রী আছে? ভারতবর্ষের বিবাহিত মানুষেরা কি এরূপ ব্যবহার করতে পারে?"

তারপর আমাদের সেই যুবকটীর মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা এই। "মেয়েটীর এই কথাতে আমার যেন মনে হইল, যে, আমার বুকে একখানা শাণিত ছোরা বসাইয়া দিল; আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল; আমি তার হাত ছাড়িয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম। মেয়েটী কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া থাকিয়া চায় পেয়ালাটা আমার টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। আমি আর চা কি খাইব, চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া তাহার পতিকে এক পত্র লিখিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই। 'আমি যে তোমাদের বাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছিলাম, তাহার কারণ এই, তোমার স্ত্রীকে দেখিয়া প্রলুব্ধ হইতেছিলাম, যদিও সে বেচারি কিছু জানিত না। আজ আমি তাকে নির্জ্জন ঘরে পাইয়া মনের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া অপমান করিয়াছি। কিরূপ অপমান করিয়াছি, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে। এখন তুমি আমার নিকট কি প্রতিশোধ চাও জানাইবে। যদি তুমি পদাঘাত করিয়া আমাকে তাড়াও, তাহাতে দুঃখিত হইব না; যদি অর্থদণ্ড কর, কত অর্থ দিতে হইবে তাহা জানাইবে; আর আমার নিকট যাহা প্রাপ্য হইয়াছে, তাহার একটা বিল দিবে। কল্য প্রাতেই আমি তোমাদের ভবন পরিত্যাগ করিব। তোমার স্ত্রীকে মাপ করিতে বলিবে। আর আমি আজ সন্ধ্যার সময় তোমাদের সহিত আহার করিব না, আমার খাদ্যদ্রব্য আমার ঘরের টেবলে রাখিতে বলিবে, আমি বেড়াইয়া আসিয়া রাত্রে আহার করিব।'

"সন্ধ্যার সময় এই পত্র তাহার পত্নীর হাতে দিয়া আমি বেড়াইতে গেলাম। তারপর রাত্রে আসিয়া দেখি, আমার টেবলের উপর আমার

খানা রহিয়াছে। আহার করিয়া শয়ন করিলাম। প্রাতে উঠিয়া আমার জিনিসপত্র বাঁধিতেছি, এমন সময়ে দেখি মেয়েটী চা লইয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়াই আমি লজ্জাতে মুখ অবনত করিলাম। মেয়েটী বলিল, 'তুমি আমার স্বামীকে যে পত্র লিখেছ, তা আমি পড়েছি। তুমি বড় ভাল লোক। দেখ এরূপ প্রলোভন আমাদের অনেকের পথে আস্‌তে পারে, ঈশ্বরের নাম করে তাকে দূরে ফেলে দিলেই হলো, তোমার ও প্রলোভন থাকবে না, তুমি আমাকে বোনের মত দেখ না, আমাকে বোন ভেবে আমার মুখের দিকে চাও না, আমি তোমাকে বল দেব। আমি ও আমার স্বামী দুজনেই পরামর্শ করেছি, তোমাকে কখনই যেতে দেওয়া হবে না। তুমি আমাদের বন্ধু, এমন বন্ধু সহজে পাওয়া যায় না।' তারপর আমি সেই গৃহেই রহিলাম। তদবধি আমি তাদের বন্ধুই আছি।"

নিম্নশ্রেণীর মধ্যবিত্ত মেয়েদের স্বভাব চরিত্র যখন এই, তখন সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যবিত্ত নারীদের স্বভাব চরিত্র কিরূপ!

পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণ স্বাধীন ভাবে সকল স্থানে, সকল আলোচনাতে, সকল কাজে যোগ দেন, তাহাতে যেন কাহারও মনে না হয় যে তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক শাসন নাই। এমন কঠিন সামাজিক শাসন অল্পই দেখা যায়। আমি যাঁদের বাড়ীতে থাকিতাম, সে বাড়ীতে দেখিয়াছি, যদি কোনও দিন বাহিরের দরজার একটা চাবি সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলিতাম এবং ফিরিতে অনেক রাত্রি হইত, তখন দেখিতাম দ্বারে আসিয়া আঘাত করিলেই সিঁড়িতে উপর হইতে নামিবার খট্‌খট্‌ শব্দ শোনা গেল। একটী মেয়ে আসিয়া দ্বার খুলিলেন, কিন্তু আমি খট্‌ করিয়া দ্বার খুলিতে না খুলিতে তিনি অন্তর্দ্ধান। আমি

উপরের দিকে চাহিয়া সিঁড়ির উপরে নাইট-গাউন-পরা নারীমূর্ত্তির পৃষ্ঠদেশ মাত্র দেখিতে পাইলাম। ছয় সাত মাস তাঁহাদের বাড়ীতে ছিলাম, মেয়েরা যে কোন্ ঘরে ঘুমাইত তাহা জানিতাম না। সেদেশে মেয়েদের শয়ন-ঘরে পুরুষের প্রবেশের ন্যায় নিন্দনীয় কাজ আর কিছুই নাই। মেয়ে পুরুষে বৈঠকঘরে বসা মেশা, রাস্তা-ঘাটে একত্রে বেড়ান নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু আদব-কায়দার এত বাঁধাবাঁধি যে তার একটু লঙ্ঘন করিলে বন্ধুতার বিচ্ছেদ ঘটে। মনে কর একটী মেয়ের সঙ্গে দুইদিন হইল আলাপ পরিচয় হইয়াছে, এরূপ অবস্থাতে হঠাৎ যদি পত্রে একটু ভালবাসার ভাষা ব্যবহার করিলাম, অমনি তাদের বাড়ীতে কথা উঠিল, এ ত লক্ষণ ভাল নয়, গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি। অমনি আর তাহার নিকট হইতে উত্তর আসিল না, হয় ত তার ভগিনী গম্ভীরভাবে জ্ঞাতব্য কথাটা জানাইল। আমি বুঝিলাম, আমাকে দশ হাত দূরে ফেলাই উদ্দেশ্য, আর বন্ধুভাবে লইবে না। এইরূপ আদব-কায়দার অনেক বাধন আছে, স্বাধীনতার সঙ্গে শাসনও আছে।

ইংলণ্ডের নারীগণের উন্নত অবস্থার প্রমাণ স্বরূপ আর-একটী বিষয় স্মরণ আছে। সমার্সেটশিয়ারে ষ্ট্রীট নামে একটী গ্রাম আছে। সেখানে কোয়েকার-সম্প্রদায়-ভুক্ত একটী পরিবার বাস করেন। সে পরিবারে পুরুষ কেহ নাই, বিধবা মাতা ও দুইটী অবিবাহিতা কন্যা। তাঁহাদের পিতা কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত বীজ বিক্রয়ের কাজ করিতেন। সেই কাজে তিনি বেশ উপার্জ্জন করিতেন এবং মৃত্যুকালে যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে বড় কন্যাটী পিতার কাজে গিয়া বসিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায়ে আরও কোন কোন ব্যবসায় যোগ করিয়া কার্‌বার ফাঁপাইয়া তুলিলেন। অপরাপর ব্যবসায়ের মধ্যে তাঁহারা যে-একটা মহা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, তাহার কথা বলি। সে জেলাতে অনেক আপেল

ফল উৎপন্ন হয়। সে দেশে লোকে আপেল ফলে মদ প্রস্তুত করে, সুতরাং আপেলের ব্যবসা খুব চলে। আমি যে পরিবারটীর কথা বলিতেছি, তাঁহারা সকলেই সুরাপান-বিদ্বেষী, সুতরাং তাঁহারা মায়ে ঝিয়ে এই পরামর্শ করিলেন, যে, আপেল হইতে যদি জেলি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা যায়, তবে হাজার হাজার আপেল সুরার ব্যবসায় হইতে তুলিয়া লইয়া আহারের কাজে লাগান যাইতে পারে। এই পরিবারের জননী তাঁহার ভ্রাতার সহিত এই পরামর্শ করিয়া উভয়ের অর্থসাহায্যে একটী জেলি প্রস্তুত করিবার কল খাড়া করিলেন। ভাই হইলেন sleeping partner অর্থাৎ অর্থ দিলেন মাত্র, কাজে বসিবেন না। ভগিনী হইলেন ম্যানেজিং পার্টনার অর্থাৎ কার্য্যাধ্যক্ষ। এই পরিবারের ছোট কন্যা পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগিণী ছিলেন, এবং আমাদের অনেকের নাম শুনিয়াছিলেন। তিনি আমাকে লণ্ডনে বার বার পত্র লিখিতে লাগিলেন যে, আমাকে একবার তাঁহাদের গ্রামে ও তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতেই হইবে। তাঁহার পত্রে বার বার দেখিতে লাগিলাম, "একবার আসিয়া দেখ, তিনজন মেয়ে জীবনকে কিরূপে চালাইতেছে।" একবার সেই ছোট কন্যা ক্যাথারিন লণ্ডনে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন; এবং আমাকে ষ্ট্রীটে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমি ইহাঁদের ভবনে কিছুদিন যাপন করিবার পরে প্রোফেসার এফ্ ডব্লিউ নিউম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব এই মানসে লণ্ডন হইতে যাত্রা করিলাম। ইহাঁদের ভবন হইতে ফিরিবার সময় প্রোফেসার নিউম্যানের ভবনে দুই দিন অতিথিরূপে ছিলাম।

ষ্ট্রীটের রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া দেখি ক্যাথারিন গাড়ি লইয়া উপস্থিত। অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে আমার জিনিসপত্র গাড়িতে উঠিল, ক্যাথারিন আমাকে পাশে বসাইয়া গাড়ি হাঁকাইয়া চলিলেন। দুপুরবেলা বাড়ীতে পৌঁছিয়া

তাঁহার মাতাকে দেখিলাম, তাঁহার দিদিকে দেখিলাম না, তিনি তখন তাঁহার আপীসে আছেন। আমাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়াই ক্যাথারিন বলিলেন, "চল, বেড়াইয়া আসি।" এই বলিয়া আমাকে এক নির্জ্জন পাহাড়ের উপর বনের ভিতর লইয়া গেলেন। গিয়া বলিলেন, "আমার ধর্ম্ম-জীবনের অবস্থার বিষয় তোমাকে বলিবার জন্য এই নির্জ্জনে আনিয়াছি। আমি প্রাতঃকাল হইতে হাঁটিয়া বড় ক্লান্ত আছি, আমি এই ঘাসের উপর শুইয়া কথা কহিব, তুমি কিছু মনে করিও না।" এই বলিয়া আমার সম্মুখে ঘাসের উপরে শুইয়া পড়িলেন; এবং নিজের ধর্ম্মজীবনে কিরূপে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিতে লাগিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। তিনি পঠদ্দশাতে একজন সহাধ্যায়িনী বালিকার ভ্রাতার সংস্রবে আসিয়া ব্রাডলার দলের নাস্তিকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্যাথারিনের মাতা ও ভগিনী কিন্তু গোঁড়া খ্রীষ্টান। তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তনের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া জননী ও ভগিনী বড়ই দুঃখিত হন। কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহাকে ত্বরায় এই নাস্তিকতা হইতে উদ্ধার করেন। তখন তাঁর মত সার্ব্বভৌমিক একেশ্বরবাদে দাঁড়ায়। তখন ঘটনাক্রমে ব্রাহ্ম-সমাজের কথা জানিতে পারিয়া তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। শেষে মনে মনে সংকল্প করেন যে, অবিবাহিতা থাকিয়া ঈশ্বর ও মানবের সেবাতে আপনার দেহমনের সমুদয় শক্তি অর্পণ করিবেন। তাহাই তখন করিতেছেন। আমি দুই দিন ইহাঁদের ভবনে থাকিয়া অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিলাম। অগ্রেই বলিয়াছি, তাহা স্ত্রীলোকের বাড়ী, পুরুষের নাম গন্ধ নাই; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটী পুরুষের মুখ দেখা যায় না। যেরূপে তাঁহাদের দিন যাইত তাহা এই। বড় কন্যাটীর ধর্ম্ম-ভাব বড় প্রবল। তিনি ভোরে উঠিয়া নানাপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ বা ভাল ভাল উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিতে থাকেন এবং নিজে

উপাসনা করেন। প্রাতঃকাল হইবা মাত্র যে যে অংশ বড় ভাল লাগিয়াছে, তাহা দাগ দিয়া ছোট ভগ্নী ক্যাথারিনের মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আপীসের জন্য প্রস্তুত হন। ৭টার সময় প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়ে, তখন গিয়া দেখি, মা, জ্যেষ্ঠা কন্যা, কনিষ্ঠা কন্যা, অপর দুই চারিটী ভদ্রমহিলা ও চাকরাণীরা উপাসনাস্থলে উপস্থিত। সে উপাসনা নূতন ধরণের। গান হইল না, কেহ মুখে প্রার্থনা করিলেন না, জ্যেষ্ঠা কন্যা কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পড়িয়া শুনাইলেন, তৎপরে সকলে মুদ্রিত নেত্রে দশ পনর মিনিট ঈশ্বর-ধ্যানে নিযুক্ত থাকিলেন। তৎপরে প্রাতরাশ সমাপন হইল। দেখিলাম, ইহাঁরা নিরামিষাশী পরিবার, টেবলে মাছ-মাংসের গন্ধ নাই।

এই যে দুই একটী অপর স্ত্রীলোক দেখিতাম, তাঁহাদের বিবরণ এই। মা ও জ্যেষ্ঠা কন্যা নিজ নিজ পরিশ্রমের গুণে যখন বিষয়ের উন্নতি করিতে লাগিলেন, তখন তিন মায়ে ঝিয়ে বসিয়া এই পরামর্শ করিলেন যে, জগদীশ্বর যখন সম্পদ দিতেছেন, তখন তাঁহার কাজে তাহা লাগাইতে হইবে। তাঁহাদের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হাঁস্‌পাতালের মত রাখিতে হইবে। তাহাতে ডাক্তার, দাস দাসী, সকলি থাকিবে। তাঁহাদের মহিলা বন্ধুদিগের মধ্যে যে কেহ পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য তাঁহাদের নিকট আসিয়া থাকিতে চাহিবেন তাঁহারা ঐ হাঁস্‌পাতালে আসিয়া থাকিবেন। এই পরিবারের ব্যয়ে তাঁহাদের পরিচর্য্যা হইবে। গিয়া শুনিলাম, এইরূপ দুই চারিটী মেয়ে সর্ব্বদাই ঐ ভবনে আছেন।

এতদ্ভিন্ন তাঁহারা আর-একটী পরামর্শ এই করিলেন যে, তাঁহারা ক্যাথারিনকে একখানি গাড়ি ও দুইটী ঘোড়া দিবেন। ক্যাথারিন তাহাতে চড়িয়া ষ্ট্রীট গ্রামের চারিদিকে চারি পাঁচ মাইলের মধ্যে কৃষক

ও শ্রমজীবীদের ভবনে ঘুরিয়া তাহাদিগকে সুরাপান ছাড়াইবার চেষ্টা করিবেন এবং তাহাদের শিশুদিগের শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিবেন। ক্যাথারিন তখন সেই কাজে নিযুক্ত। তিনি একদিন বৈকালে আমাকে দেখাইবার জন্য একগ্রামে কৃষকদের সভা আহ্বান করিলেন। গিয়া দেখি ৫০।৬০ জন কৃষক চা খাইবার জন্য এক প্রকাণ্ড টিনের ঘরে উপস্থিত। ক্যাথারিন আমাকে তাহাদের অনেকের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে কে কে তাঁহার চেষ্টাতে সুরাপান ছাড়িয়াছে, তাহা আমার কানে কানে বলিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি আমাকে তাঁহাদের নিজ গ্রামের টাউনহলে লইয়া গেলেন। গিয়া শুনি প্রসিদ্ধ জন ব্রাইটের জামাতা এই গ্রামে বাস করেন এবং তাঁহার একটী জুতার কল ও কারবার আছে। তিনি এ টাউনহলটা নির্ম্মাণ করিয়া তথাকার কৃষক ও শ্রমজীবীদের ব্যবহারার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। সেই হলে, পাঠাগার, নাট্যাগার, পুস্তকালয়, ভোজনাগার, প্রভৃতি সকলি দেখিলাম। ঐ হলে ব্রাহ্মসমাজের মত বিশ্বাস ও কার্য্য-কলাপের বিষয় আমি কিছু বলিলাম। জন ব্রাইটের কন্যা তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতান্তে উঠিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের মত বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতেছি না, কিন্তু ভারতবর্ষের নারীকুলের জন্য ইহাঁরা যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেজন্য ইহাঁদের মস্তকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ-পুষ্পের বৃষ্টি হউক।" সে কথাগুলি আমি কখনও ভুলিব না। কেবল তাহা নহে, তাঁহার মুখখানি আমার মনে দৃঢ় মুদ্রিত রহিয়াছে। আমি এমন পবিত্র নারীমূর্ত্তি অল্পই দেখিয়াছি। এরূপ সৌজন্য, এরূপ শ্রীশীলতা, এরূপ পবিত্রতা, যে নারীমূর্ত্তিতে থাকে, ইহা একবার দেখাও জীবনের একটা পরম লাভ।

তৎপরে ফিরিবার সময় ক্যাথারিন বলিলেন, এই-সকল শিক্ষার উপায়

বিধানের আয়োজনের ফল কি হইয়াছে চল তোমাকে এক কৃষকের ঘরে লইয়া দেখাই। এই বলিয়া এক কৃষকের ঘরে আমাকে লইয়া গেলেন। সে ব্যক্তি তখন ঘরে ছিল না। প্রবেশ করিয়া দেখি, সেটি যেন একটি ল্যাবরেটরী;—এত প্রকার কল, আরক, শিশি বোতল প্রভৃতি রহিয়াছে! একপার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড পুস্তকের আল্‌মারি। ক্যাথারিন বলিলেন, "মানুষটা বিজ্ঞানের পরীক্ষা লইয়া এবং উদ্ভিদবিদ্যা লইয়া পাগল।" আমি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। তৎপরে আমি ষ্ট্রীট ছাড়িয়া লণ্ডনে ফিরিলাম।

লণ্ডনে থাকিবার সময় আমি আরও কয়েক স্থানে ব্রাহ্মসমাজের বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলাম, এবং ইউনিটেরিয়ানদিগের দ্বারা ও ব্রাহ্ম আচার্য্য ভয়সী সাহেবের দ্বারা আহূত হইয়া তাঁহাদের উপাসনা-মন্দিরে কয়েকবার উপদেশ দিয়াছিলাম।

এতদ্ভিন্ন সে দেশের পরোপকারী ব্যক্তিগণ পরোপকারের জন্য যে-সকল কার্য্যের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহারও অনেকগুলি দেখিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ডাক্তার বার্ণার্ডোর প্রতিষ্ঠিত পিতৃমাতৃহীন বালকদিগের আশ্রয়-বাটিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার বার্ণার্ডো একজন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী লোক ছিলেন; চিকিৎসা-কার্য্যে বসিয়া এই শ্রেণীর বালকদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি ইহাদের জন্য কিছু করা আবশ্যক বোধ করিলেন। কতকগুলি পিতৃমাতৃহীন বালক সংগ্রহ করিয়া লণ্ডন সহরে এক আশ্রয়-বাটিকা স্থাপন করিলেন। আমার যাইবার পূর্ব্বে কয়েক বৎসর হইতে এই কাজ চলিতেছিল। তৎপূর্ব্বে তাঁহার আশ্রয়-বাটিকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অনেকগুলি যুবক ক্যানেডা দেশে কর্ম্ম কাজ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। আমরা যখন তাঁহার আশ্রয়-বাটিকা দেখিবার জন্য গেলাম, তখন গিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বিস্মিত

হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কিসের অধিক প্রশংসা করিব, ইংরাজের অদ্ভুত কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার শক্তির, অথবা পরহিতৈষণার। কাজের এরূপ সুব্যবস্থা জীবনে কখনও দেখি নাই, এরূপ পরোপকার-প্রবৃত্তিও দেখি নাই।

এইরূপ আর-একটি আশ্রয়-বাটিকা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। সেটা ব্রিষ্টল নগরের সুপ্রসিদ্ধ জর্জ মুলারের প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রয়-বাটিকা। ইহার ইতিবৃত্ত অতি অদ্ভুত। কিরূপে জর্জ্জ মূলার এক পয়সা ভিক্ষা না করিয়া, চাঁদা না তুলিয়া, কেবলমাত্র ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা ৬৩ বৎসর এই-সকল আশ্রয়-বাটিকাতে এককালে সহস্রাধিক পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাকে রাখিয়া প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর ও ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠের যোগ্য।

১৮৮৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর দিবসে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিনে ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার স্মৃতিতে এক সভা করিবার জন্য ঐ নগরে যাই। তৎপূর্ব্বে আমি ও আমার বন্ধু দুর্গামোহন দাস উদ্যোগী হইয়া রাজার সমাধি-মন্দিরের মেরামতের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। কিরূপ মেরামত হইল, তাহা দেখিবারও ইচ্ছা ছিল। ঐদিন আমি সমস্ত দুপুর বেলা Arno's Vale নামক সমাধি-ক্ষেত্রে রাজার সমাধি-মন্দিরে যাপন করি, এবং সন্ধ্যার সময় এক প্রকাশ্য হলে রাজার বিষয় বক্তৃতা করি।

রাজার স্মৃতি যে এখনও ব্রিষ্টলবাসীর মনে আছে তাহা জানিতাম না। আমি ১৮৮৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর দুপুর বেলা দ্বারকানাথ ঠাকুর বিনির্ম্মিত রাজার সমাধি-মন্দিরে বসিয়া আছি, দেখিলাম সেই সময়ের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি আসিয়া রাজার সমাধি-মন্দিরের সমক্ষে ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহার সমাধিতে লিখিত বাক্যগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। তৎপরে

সন্ধ্যার সময় আমার বক্তৃতা শেষ হইলে দেখি যে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে লোকে ধরিয়া সভামধ্য হইতে আমার দিকে আনিতেছে। আমি তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া আমার হস্ত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই হাতে রামমোহন রায়ের হাত ধরিয়াছিলাম। এস, আজ তোমার হাত ধরি।" বলিয়া মহোৎসাহে আমার হাত ধরিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখে কোথায় কিরূপে রামমোহন রায়কে দেখিয়াছিলেন তাহা শুনিলাম। পরে আর-একটী ঘটনা ঘটিল, তাহাও চিরস্মরণীয়। মৃত্যুকালে রাজা রামমোহন রায়কে যে ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যা তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার যৌবনকালে নিজ পিতার সঙ্গে রামমোহন রায়কে অনেকবার দেখিয়াছেন, রাজার সঙ্গে মিশিয়াছেন, ও তাঁহার আতিথ্য করিয়াছেন। রাজা ও তাঁহার পিতা গত হইলে, তিনি নিজ পিতার নিকটে প্রাপ্ত মৃন্নির্ম্মিত রাজার মস্তক ও তাঁহার মাথার শালের পাগ্‌ড়ী প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্নগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। বার্দ্ধক্যে কবে চলিয়া যান ইহা ভাবিয়া সেগুলি আমার হাতে অর্পণ করিবার জন্য আমাকে ডাকিয়াছিলেন। সেগুলি আমার হাতে অর্পণ করিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া সেগুলি গ্রহণ করিলাম এবং দেশে লইয়া আসিলাম। দুঃখের বিষয় আমি নানা স্থানে বাসা নাড়িয়া বেড়াইবার সময় অপরাপর ছোট ছোট স্মৃতিচিহ্নগুলি হারাইয়া ফেলিলাম। অবশেষে তাঁহার মৃন্নির্ম্মিত মূর্ত্তিটী ও শালের পাগ্‌ড়ীটী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তে দিয়াছি। তাঁহারা রক্ষা করিতেছেন। রাজা রামমোহন রায় বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন, সুতরাং তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে রাখা অতীব কর্ত্তব্য, এই ভাব মনে আসাতে স্মৃতিচিহ্নগুলি তাঁহাদের হাতে দিয়াছি।

রামমোহন রায় মীটিংএর পরদিন সেই নগরে জর্জ্জ মূলারের প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রয়-বাটিকা দেখিতে যাই। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। দেখিলাম পাঁচটী আশ্রয়-বাটিকাতে প্রায় দুই সহস্র বালক-বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। তাহাদের জন্য পাঁচটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহার জানালার সংখ্যা এগার শত। ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা ও মানুষের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা এই-সকল ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। ভবনে প্রবেশ করিয়া প্রথমে শিশুদের ঘরে গেলাম। গিয়া দেখি দুইজন স্ত্রীলোক ২০।২৫টি শিশুকে লইয়া খেলা দিতেছেন ও রক্ষা করিতেছেন। তৎপরে অপরাপর গৃহও দেখিলাম। কি সুব্যবস্থা। কি রক্ষা ও শিক্ষার রীতি, দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

এতদ্ব্যতীত সে দেশে জনসাধারণের কল্যাণার্থ যত প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহারও অনেকগুলি দেখিয়াছিলাম। বলিতে কি. আমি ঐ-সকল দেখাকেই আমার একটী প্রধান কার্য্য মনে করিয়াছিলাম।

যে-সকল স্থান দেখিয়াছিলাম, তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি। অগ্রেই বলিয়াছি, আমার যাইবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে শ্রমজীবীদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য বিশেষ প্রয়াস চলিতেছিল। সেজন্য যতপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে working men's institutes নামে শ্রমজীবীদিগের পাঠাগার ও বিশ্রামাগার একটি প্রধান। আমি একদিন এইরূপ একটী বিশ্রামাগার দেখিতে গেলাম। একটী ১৭।১৮ বৎসর বয়স্ক শ্রমজীবী যুবক আমাকে লইতে আসিয়াছিল। সে ব্যক্তি তখন একজন সেক্‌রার সহকারীর কাজ করিত। সে আমাকে সঙ্গে করিয়া উত্তর লণ্ডনে এক ইনষ্টিটিউটে লইয়া গেল। সে এক প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রবেশ করিয়া দেখি, তাহাতে নানাপ্রকার আলোচনা ও উপদেশাদির জন্য নানা ঘর। কোন ঘরের দ্বারে লেখা রহিয়াছে chemistry। শুনিলাম

সে ঘরে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন সন্ধ্যার সময় কিমিতিবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ হয়। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি একটা ছোটখাট ল্যাবরেটারি প্রস্তুত। কোন ঘরের দ্বারে লেখা physics। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, পদার্থবিদ্যা বিষয়ে উপদেশের আয়োজন। এইরূপ নানা ঘরে নানা আয়োজন দেখিলাম। সম্পাদক মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, তিনি তৎপূর্ব্বে চোদ্দ বৎসর কাল ঐ কাজ করিতেছেন; বেতন লন না। প্রতিদিন বৈকালে নিজের আফিস হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার সময় ইনষ্টিটিউটে আসেন, এবং রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত কাজ করেন। এই পরিশ্রম চোদ্দ বৎসর চলিয়াছে। ভাবিলাম কি স্বদেশহিতৈষিতা ও পরহিতৈষণা!

ইনষ্টিটিউটের মধ্যে দুইটা বড় ঘরে এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী দেখিলাম। শুনিলাম শ্রমজীবীগণ সেই লাইব্রেরী হইতে বই লইয়া পাঠ করে। তৎপরে বাহির হইয়া উঠানে গিয়া দেখি ছাত্র ও ছাত্রীগণের শারীরিক ব্যায়াম ও খেলার জন্য সমুদায় বন্দোবস্ত আছে। ছাত্র ও ছাত্রীগণের জন্য দুইটা স্বতন্ত্র প্রাঙ্গণ। বক্তৃতাদি শোনার পর সেই-সকল প্রাঙ্গণে একটু খেলাও হইয়া থাকে।

শুনিলাম, এই প্রকাণ্ড ভবন দেশহিতৈষীগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এখানে যে-সকল বক্তৃতাদি দেওয়া হয়, তাহা লণ্ডন ইয়ুনিভার্সিটির প্রফেসারগণের ও অপরাপর বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে বিনা বৃত্তিতে দিয়া থাকেন।

ইংরাজদিগের এই দানপ্রবৃত্তি যে, কিরূপ, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলাম। একবার শুনিলাম ঐরূপ একটা ইনষ্টিটিউটের জন্য একজন ভদ্রলোক ১০।১২ লক্ষ টাকা দান করিলেন, কিন্তু কে দিল জানিতে পারা গেল না। ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র, সকলের মধ্যে

আশ্চর্য্য দানপ্রবৃত্তির নিদর্শন দেখিতাম। যে বাড়ীতে আমি থাকিতাম, সে বাড়ীতে অনেকবার এইরূপ ঘটনা হইয়াছে, যে, মেয়েরা সায়ংকালীন আহারের পর বৈঠকঘরে বসিয়া পড়িতেছেন ও কাজ করিতেছেন, এমন সময় একটী মেয়ে খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে বলিয়া উঠিলেন, "মা দেখ! দেখ! একটা নূতন কাজের আয়োজন হচ্চে। আমরা কি কিছু সাহায্য করতে পারি না?" এই বলিয়া কাগজ হইতে কাজটীর বিবরণ পড়িয়া শুনাইলেন। মা বলিলেন, "রোস, দেখি, দিবার মত কি আছে।" এই বলিয়া তাঁহার হিসাবের খাতা আনিয়া হিসাব দেখিতে বসিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "আমরা পাঁচ শিলিং দিতে পারি।" তখনি মনিঅর্ডার যোগে পাঁচ শিলিং ঐ কাজের সেক্রেটারির নামে পাঠান হইল। দেখিয়া আমি ভাবিলাম, অপরাপর habitএর ন্যায়, habit of charityও সঙ্গ ও অবস্থাগুণে ফুটিয়া থাকে। যে দেশের লোকের মনে habit of charity ফোটে নাই সে দেশের মানুষকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়। লোকে মুঠা করিয়া পয়সা ধরিয়া বসিয়া থাকে, যে জোরে মুঠা খুলিয়া লইতে পারে, সেই পায়, অন্যে পায় না, আমাদের দেশের যেন এই অবস্থা।

আর-একবার কতিপয় ভদ্র পুরুষ ও মহিলার প্রতিষ্ঠিত একটী শ্রমজীবীদের সভাতে গেলাম। সেদিন আলোচ্য বিষয় ছিল, "পানাসক্তির অবৈধতা।" আমি সুরাপান-বিরোধী বলিয়া আমাকে তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। জাতীয় পানাসক্তির অনিষ্ট ফলের বিষয় বক্তাগণ যখন বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন আমার মন বিস্ময় ও ঘৃণাতে অভিভূত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা আমাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "আমি সেই দেশ হইতে আসিয়াছি, যে দেশের পূর্ব্বপুরুষগণ সুরাপানকে মহাপাতকের মধ্যে গণ্য

করিয়াছিলেন। এই বলিয়া মনুর "ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ" প্রভৃতি বচন উদ্ধৃত করিলাম। আর-একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, যে, সেই পূর্ব্বপুরুষগণ আদেশ করিয়াছেন, যে, "মত্তহস্তীতে তাড়া করিলে হস্তীর পদতলে পড়িয়া মরিবে, তথাপি শুণ্ডিকালয়ে আশ্রয় লইবে না।" এই-সমস্ত বচন শুনিয়া উপস্থিত পুরুষ ও মহিলাগণ হাঁ করিয়া রহিলেন, ও পরস্পর মুখ দেখাদেখি করিতে লাগিলেন। যখন আমি বলিলাম, যে, "আমাদের দেশে এরূপ লক্ষ লক্ষ পরিবার আছে, যথা আমার নিজের পরিবার, যাহারা চোদ্দ পুরুষের মধ্যে কোন প্রকার মদ্য দেখে নাই, এরূপ দেশে তোমাদের গবর্ণমেণ্টের অধীনে প্রকারান্তরে সুরাপানের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে এবং হাজার হাজার সুরার দোকান স্থাপিত হইতেছে।" তখন চারিদিকে shame, shame (কি লজ্জা, কি লজ্জা) শব্দ উঠিতে লাগিল।

ইংরাজ জাতির পানাসক্তি বিষয়ে অগ্রে কিছু বলিয়াছি, আরও কিছু স্মরণ হইতেছে, তাহা এখানে বলিয়া রাখি। একদিন উত্তর লণ্ডনে আমার বাসা হইতে কুমারী কলেটের বাড়ী যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছি, পথে একটা লোক একখানা মুদ্রিত কাগজ লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল, "অমুক জাহাজ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে, ইহাতে তাহার বিবরণ আছে, আপনি নেবেন?" আমি বলিলাম, "আমি সংবাদপত্রে ঐ জাহাজ ডোবার বিবরণ পড়েছি।" তখন সে আপনার দারিদ্র্যের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইল। বলিল—"আমরা স্ত্রীপুরুষে বড় কষ্টে আছি, আমাদের দিন চলে না। অনেক দিন অনাহারে যায়, আপনি যদি কিছু সাহায্য করেন, বড় ভাল হয়।" তাহার কথা শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল, কিছু দান করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তার মুখে মদের গন্ধ পাইলাম। তখন তাহাকে বলিলাম, "তোমাকে :কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা হইতেছে, করিতেও

পারি; কিন্তু তোমাদের জাত বড় মাতাল, তোমাকে যে পয়সা দিব, তাহা হয়তো তোমার স্ত্রীর হাতে না গিয়া শুঁড়ির হাতে যাবে। এই জন্য দিতে ইচ্ছা করে না"। সে ব্যক্তি বলিল, "এই রাস্তার অদূরে এক গলিতে আমি থাকি, আপনি আমার বাড়ীতে আমার স্ত্রীর কাছে চলুন, তাকে জিজ্ঞাসা করিলে সব কথা জানিতে পারিবেন।" আমি পূর্ব্বেই সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে লণ্ডনের ঐ উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে অনেক দুষ্টলোকের বাস, সর্ব্বদাই চুরি, ডাকাতি, হত্যা, মারামারি প্রভৃতি হইয়া থাকে। সময় সময় পথিকদিগকে ভুলাইয়া গলির ভিতর লইয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয় এবং চোখে কাপড় বাঁধিয়া নানা গলি ঘুরাইয়া আর-এক পথে ছাড়িয়া দেয়। তখন দয়ার আবির্ভাবে সে কথা আমার স্মরণ হইল না। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সে আমাকে গলি হইতে গলির ভিতর লইয়া চলিল। অবশেষে আমাকে একটা বাড়ীতে এক ঘরের ভিতর পুরিয়া বলিল, "আমার স্ত্রী ঘরে নাই, এখানে বসুন, আমি তাকে ডেকে আন্‌ছি।" এই বলিয়া বাহির হইয়া গেল। আমার তখনও খেয়াল নাই যে বিপৎসঙ্কুল স্থানে আসিয়াছি। তখনও তার স্ত্রীর সহিত কথা কহিব ও কিছু দান করিব, এই ভাবটা প্রবল আছে। আমি বসিয়া আছি, কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি তিন চারি জন সবলকায় পুরুষ আসিয়া দ্বারে উঁকি মারিতেছে ও পরস্পর কি পরামর্শ করিতেছে। তখন আমার সেই সংবাদপত্রের কথাটা স্মরণ হইল। আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলাম ও দ্রুতগতিতে বাহিরের রাস্তায় যাইবার জন্য অগ্রসর হইলাম। তাহারা দ্বারে আমার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। তাহারা আমার হাত ধরিতে না ধরিতে আমি দৌড়িয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন দেখি সেই লোকটা রাস্তার অপর পার্শ্ব হইতে আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আমার দিকে আসিতেছে। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমার স্ত্রী

আস্‌ছে।" আমি বলিলাম, "না, তোমার স্ত্রীর জন্য আর দাঁড়াইব না, আমি চলিলাম।" সে আমার সঙ্গ লইল। আমি বলিলাম, "তোমাকে যখন কিছু দিব বলেছি, তখন দিচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গ ছেড়ে যাও।" এই বলিয়া তাকে কিছু পয়সা দিয়া কুমারী কলেটের বাড়ী গেলাম। গিয়া তাঁর বকুনি খাইয়া মরি। তিনি বলিলেন,—"তুমি কাগজে পড়েছ, লোকমুখে শুনেছ, এই দিকে খারাপ লোকের বাস; তবু তোমার চেতনা হয় নাই, এ বড় আশ্চর্য্য কথা! আর যদি প্রাণভয়ে পালিয়ে এলে তবে পয়সা দিলে কেন? দয়ার কি স্থান অস্থান নাই?" আমি আর কি বলিব! মাথা পাতিয়া তাঁর বকুনি খাইলাম।

শ্রমজীবীগণের মধ্যে ভদ্রলোকেরা যে কাজ করিতেছিলেন, তাহার আর-একটী ব্যাপার একদিন দেখিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ এই। কোয়েকার-সম্প্রদায়-ভুক্ত কয়েক ব্যক্তি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রতি রবিবার প্রাতে একটী ভবনে, তাঁহারা শ্রমজীবীদিগকে একত্র করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিবেন। আমাকে একদিন দেখিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন। আমি গিয়া তাঁহাদের যে কার্য্যপ্রণালী দেখিলাম, তাহা এই। প্রায় শতাধিক শ্রমজীবী একত্র হইয়াছে। প্রথম একটী বড় ঘরে তাহাদিগকে লইয়া আধঘণ্টা কাল উপাসনা করা হইল। তাহার পর তাহাদিগকে আর-একটী ঘরে আনিয়া আধঘণ্টা কাল দুইপ্রকার কাজ চলিল। প্রথম, ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হইল। শ্রমজীবীগণ সপ্তাহের মধ্যে যে যাহা সঞ্চয় করিয়াছে তাহা জমা দিতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ, অপর দিকে অনেকে লিখিবার খাতা খুলিয়া A B C D লিখিতে বসিয়া গেল, এবং যাহা লিখিয়া আনিয়াছে, তাহা শিক্ষকদিগকে দেখাইতে লাগিল। আমি দেখিলাম ৩০।৩৫ বৎসর বয়সের বুড়া মদ্দেরাও A B C D লিখিয়া দেখাইতেছে। তৎপরে ধর্ম্মোপদেশের জন্য চারি পাঁচ ঘরে ক্লাস বসিল।

এক-এক ক্লাসে এক-একজন ভদ্রলোক শিক্ষকের আসন অধিকার করিয়া উচ্চ আসনে বসিলেন। আমাকে তাহার এক ঘরে উচ্চ আসনে শিক্ষকের পাশে বসাইয়া দিলেন। তৎপরে যেভাবে কার্য্য আরম্ভ হইল, তাহা এই। শিক্ষক বলিলেন, গত রবিবার অমুক ব্যক্তিকে বাইবেলের অমুক অমুক স্থান পড়িয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি যদি উপস্থিত থাকেন, উঠে দাঁড়ান এবং সেই স্থান পড়ে কি উপদেশ পেয়েছেন বলুন। অতঃপর সমবেত শ্রমজীবীদের মধ্যে একজন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাইবেলের কোন্ কোন্ স্থান পড়িয়া কি উপদেশ পাইয়াছে বলিতে প্রবৃত্ত হইল। বক্তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও ভাবগ্রাহিতা দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। শিক্ষক আমাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন, আমি কিছু বলিলাম না, কিন্তু অপর কয়েকজনে কিছু কিছু বলিলেন। অবশেষে শিক্ষক তাঁহার উপদেশ দিয়া উপসংহার করিলেন। এইরূপে একঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহাতে আপনাকে উপকৃত বোধ করিলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অপরাপর স্থানের মধ্যে Salvation Armyর সেনাপতির বাসভবন দর্শন একটী স্মরণীয় ঘটনা। আমি ইংলণ্ড বাসকালে, Salvation Armyর কাজ কর্ম্ম বিশেষভাবে দেখিতাম; তাঁহাদের সভা-সমিতির সংবাদ পাইলেই উপস্থিত থাকিবার চেষ্টা করিতাম। একবার Alexandra Palace নামক কাচমন্দিরে তাঁহারা এক বিরাট সভা করিলেন। তখন সভ্যগণের, বিশেষতঃ জেনারেল বুথের পুত্রকন্যাগণের, যে উৎসাহ দেখিয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা হয় না। আমি উক্ত প্রাসাদে পদার্পণ করিবামাত্র, মেয়ের পর মেয়ে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। "আপনি কি স্যালভেসনিষ্ট ? আপনি কি খৃষ্টান ?" যেই বলি "না" আর কোথায় যায়! অমনি চীৎকার, তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়! একটা মেয়ের হাত ছাড়াইলে, আর একটার হাতে পড়ি। Armyর কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগেরই বিশেষ উৎসাহ দেখিলাম। শুনিলাম, জেনারেল বুথের পুত্রবধূ, ব্রামওয়েল বুথের পত্নী, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন এবং বারাঙ্গনাদিগের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া তাহাদিগকে বিপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। একদিন আমি ইহাঁদের প্রধান কর্ম্মস্থান দেখিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া জেনারেল বুথের বাসভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন মিসেস বুথ বোধ হয় অসুস্থ ছিলেন। জেনারেল বুথ আসিতে পারিলেন না। তাঁহার পুত্র ব্রামওয়েল বুথ আমাকে লইয়া তাঁহাদের সাধন-গৃহ দেখাইতে লাগিলেন। আমি যেদিকে চাই, সেইদিকেই দেখি, প্রাচীরের গায়ে লেখা আছে, "যীশু

তোমাদিগকে ডাকিতেছেন।" "যীশুর চরণে মতি রাখ, যীশুর চরণে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদিগকে বল দিবেন", ইত্যাদি, ইত্যাদি। সমুদয় প্রাচীর যীশুর গুণগানে পরিপূর্ণ; ঈশ্বরের নাম কোথাও নাই! দেখিয়া আমি কিছু বিষণ্ণ হইয়া গেলাম। আমার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া ব্রাম্‌ওয়েল বুথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?" আমি বলিলাম, "কেবল যীশু যীশু দেখিতেছি, ঈশ্বরের নাম কোথাও নাই, সেই জন্য আমার দুঃখ হইতেছে; আপনারা যীশুরূপ পর্দ্দা দিয়া একেবারে ঈশ্বরকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন।" ব্রাম্‌ওয়েল বুথ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি কি জানেন না যীশুই আমাদের ঈশ্বর, যীশু ঈশ্বরের অপর নাম মাত্র।" আমি ভাবিতে লাগিলাম, অবতারবাদে ভক্তবৎসল ভগবানের স্বরূপকে কি চাপা দিয়াই ফেলিয়াছে! এই ভাবিতে ভাবিতে ঘরে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

অপরাপর স্থানের মধ্যে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, বোর্ড স্কুল, অপরাপর মিড্‌ল্ ক্লাস স্কুল পরিদর্শন করিয়াছিলাম। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলাম। শিশুদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার যে এত প্রকার উপায় উদ্ভাবন হইতে পারে, তাহা অগ্রে জানিতাম না। তাহাদিগকে খেলার ভিতর দিয়া নানাপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাহারা মাটি দিয়া ছোটখাট বাড়ী গড়িতেছে; নানারঙের কাগজ দিয়া অন্যপ্রকার পদার্থ নির্ম্মাণ করিতেছে। শিক্ষয়িত্রীরা আমাকে লইয়া সকল বিভাগ দেখাইলেন। অবশেষে একজন শিক্ষয়িত্রী যখন শিশুদিগের সহিত করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে ঘরে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। শিশুদের এই শিক্ষাপ্রণালী আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, আমি আসিবার সময় কিণ্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রোবেলের জীবনচরিত ও উক্ত শিক্ষাপ্রণালীর কয়েকখানি গ্রন্থ কিনিয়া

আনিলাম। তাহা আমি পরে ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে উপহার দিয়াছি।

বোর্ডস্কুলের শিক্ষাপ্রণালীও বড় চমৎকার বোধ হইল। বিশেষতঃ বালকগণ মানসাঙ্কে যেরূপ অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাইল, তাহা কখনও ভুলিবার নয়। শিক্ষক দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এততে এত যোগ কর, তাহা হইতে এত বিয়োগ কর, তাহার ফলকে এত দিয়া গুণ কর, তাহার ফলকে এত দিয়া ভাগ কর, ইত্যাদি, ইত্যাদি।—কি ফল দাঁড়াইল বল। যে ছেলে ঠিক করেছে সে হাত তুলুক।" যেই বলা অমনি একটী ছেলে হাত তুলিল এবং ফলটী বলিয়া দিল।

আপার মিড্‌ল্ ক্লাস স্কুলে গিয়া দেখি ভূগোল ও ভূতত্ত্ববিদ্যাতে বালকদের অদ্ভুত পারদর্শিতা। সমগ্র পৃথিবীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যেন তাহাদের নখের আগায় রহিয়াছে। তারপর সেখানে আর-এক ব্যাপার দেখিলাম। এক এক শ্রেণীতে ২৫।৩০ জন ছাত্রের বেশি হইবে না, কিন্তু একই সময়ে দুইজন শিক্ষক কার্য্য করিতেছেন।

ইংলণ্ডের শিক্ষাপ্রণালী দেখিবার জন্য কেবলমাত্র বালকদিগের স্কুল দেখিয়া ক্ষান্ত হই নাই। একটী বালিকাদিগের বোর্ডিংস্কুলও দেখিতে গিয়াছিলাম। কি শৃঙ্খলা, কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা! কি পাঠ, ক্রীড়া প্রভৃতির সুনিয়ম! যাহা দেখি তাহাতেই চমৎকৃত হইতে হয়! অবশেষে তত্ত্বাবধায়িকা যে গৃহে বালিকারা শয়ন করে তাহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেটী একটী হাঁস্‌পাতাল ঘরের ন্যায় বড় হল। তাহাতে অনেকগুলি বালিকার শয়নের শয্যা আছে। হলের এক পার্শ্বে একটী উচ্চ কাঠের মঞ্চ (platform)। একজন শিক্ষয়িত্রী বালিকাদের সঙ্গে একঘরে শয়ন করেন, তাঁহার শয্যাটী ঐ মঞ্চের উপর রহিয়াছে। আমি তত্ত্বাবধায়িকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শিক্ষয়িত্রী কাঠের মঞ্চের উপর শয়ন

করেন কেন?" তিনি বলিলেন "ওখানে শুইয়া শুইয়া বালিকাদের গতিবিধি দেখা যায়।"

উচ্চশ্রেণীর শিক্ষালয়ের মধ্যে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ-সকল দেখিতে গিয়াছিলাম। অক্সফোর্ডে গিয়া মনে হইল, হায়! একদিনের জন্য এই-সকল বিদ্যামন্দির দেখিতে না আসিয়া যদি ছয়মাস কাল বা একবৎসর কাল এখানে থাকিতে পারিতাম, নিশ্চয় বিশেষ উপকৃত হইতাম! কলেজগুলি দেখিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন হিন্দু-শিক্ষাপ্রণালীর কথা মনে হইতে লাগিল। আমাদের প্রাচীন নিয়ম এই ছিল যে, ছাত্রগণ পাঠদ্দশায় ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিবে এবং গুরুকুলে বাস করিবে। সেখানে দেখিলাম, ছাত্রগণ সকলেই অবিবাহিত ও ব্রহ্মচর্য্যে আছে এবং কলেজ-ভবনগুলিতে গুরুগণের সহিত একত্রে বাস করিতেছে। সেই-সকল ভবনের হাওয়াতে যেন জ্ঞান ও সদালোচনা রহিয়াছে। অক্সফোর্ডের বড্‌লিয়ান লাইব্রেরী যখন দেখিতে গেলাম, তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলাম। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরী দেখিয়া যেরূপ বিস্মিত হইয়াছিলাম, ইহাও তদ্রূপ। লণ্ডনবাসকালে আমি অনেক দিন ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িয়াছি। শুনিয়াছি সেখানে এত বইয়ের আলমারি আছে যে, একটার পাশে আর একটা দাঁড় করাইলে ছয় মাইল পূর্ণ হইতে পারে। অথচ কাজের কি সুব্যবস্থা! পাঠক একখানি নূতন বই চাহিবামাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে বইখানি আসিয়া উপস্থিত। এই লাইব্রেরির বাতিক ইংরাজগণের এক প্রধান বাতিক। ভদ্রলোকদের বাড়ীতে গিয়া দেখিতাম যে তাঁহাদের পাঠাগারে মেজে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত পুস্তকের আল্‌মারিতে পরিপূর্ণ। পথ, ঘাট, গলি, ঘুচি সর্ব্বত্রই পুস্তকালয়। সামান্য ব্যয়ে সকল শ্রেণীর মানুষ পড়িবার সুবিধা পায়। ইহাতেই প্রমাণ ইংরাজদের জ্ঞানস্পৃহা কত প্রবল

যাক ও কথা। অক্‌সফোর্ড হইতে আসিয়া কেম্‌ব্রিজে গমন করি। ঘটনাক্রমে সেদিন বড় দুর্য্যোগ হইল। ঘুরিয়া সকল কলেজ দেখিতে পাইলাম না। কেবল মিল্‌টন ও ডারুইনের কলেজ দেখিয়া আসিলাম। তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল।

এই কেম্‌ব্রিজ পরিদর্শনকালের আর-একটী ঘটনা স্মরণ আছে। ঋষি-প্রতিম ই বি কাউয়েল যিনি একসময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার ও সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, যাঁহার সাধুচরিত্রের সংশ্রবে আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের কতিপয় ছাত্র খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তিনি তখন সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে কেম্‌ব্রিজে বাস করিতেছিলেন। অধ্যাপকতা করিবার জন্য তাঁহাকে কলেজে যাইতে হইত না, কিন্তু সংস্কৃতশিক্ষার্থী ছাত্রগণ তাঁহার ভবনে আসিয়া পড়িয়া যাইত। সেই প্রবীণ মানুষ যখন শুনিলেন যে ভারতবর্ষের একজন নেতৃস্থানীয় লোক, কেম্‌ব্রিজের কলেজ-সকল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন, তখন সেই দুর্য্যোগের ভিতরেও, আমি যে বন্ধুর বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, তাঁহার ভবনে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি বাল্যকালে সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময়, তাঁহাকে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষরূপে দেখিয়াছিলাম, এবং কিরূপে তাঁহার সাধুতার দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। এখন দেখিলাম সেই সাধুপুরুষ পলিতকেশ স্থবির; তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রুজাল নাভিকে অতিক্রম করিয়া নামিয়াছে; চক্ষুর্দ্বয়ে ও মুখের আকৃতিতে গভীর জ্ঞানানুরাগ ও সাধুতার দেদীপ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। তাঁহাকে বালককালে কি দেখিয়াছিলাম, এবং তিনি আমার জীবনে সত্যানুরাগ কিরূপে উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন তাহা যখন বলিলাম, এবং মিউটিনির হাঙ্গামা থামিলে, নববর্ষে পারিতোষিক বিতরণের সময়

তিনি যে সংস্কৃত কবিতাটি রচনা করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা যখন আবৃত্তি করিলাম, তখন তিনি বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন এবং কেবলমাত্র আমাকে বুকে জড়াইয়া কোলে লইতে বাকি রাখিলেন। তাঁহার রচিত সেই কবিতাটি এই—

বিদ্যালয়ঃ স্বালয়মেত্য সাম্প্রতম্
সমৃদ্ধ-কীর্ত্তি র্ভুবনে ভবিষ্যতি।
তথাহি সানৌ মলয়স্য নান্যতঃ
ধ্রুবং সমারোহতি চন্দনদ্রুমঃ॥

অর্থাৎ কলেজ আপনার বাড়ীতে আসিয়া উন্নতি লাভ করিয়া জগতে বিখ্যাত হইবে। তাহা ত হইবেই, কারণ মলয় পর্ব্বতের সানুদেশেই চন্দনবৃক্ষ বাড়িয়া থাকে।

এই কবিতাটী আবৃত্তির পর আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ যেন আবার জাগিয়া উঠিল। তিনি আমার কাছে বসিয়া সংস্কৃত কলেজ, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতির কথা বলিতে লাগিলেন এবং কেম্ব্রিজে দেখিবার উপযুক্ত কি আছে তাহাও জানাইলেন। দুঃখের বিষয় এই দুর্য্যোগের জন্য সমুদয় দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু বহুদিন পরে সাধু কাউয়েলের সহিত সম্মিলনে যেন সকল অভাব পূর্ণ করিল। সেই সম্মিলন আমার নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

আমি ছয়মাস কাল মাত্র ইংলণ্ডে ছিলাম। এতদ্ব্যতীত দেখিবার আরও অনেক স্থান ও বিষয় ছিল। কিন্তু আমার স্কন্ধে গুরুতর এক কার্য্যের ভার পড়াতে শেষ কয়েক মাস আমার দেখাশুনার কিছু ব্যাঘাত ঘটিল। সে বিষয়টা এই, ট্রুবনার (Trubner) নামক মুদ্রাকর কোম্পানীর ম্যানেজার একদিন কুমারী কলেটের নিকট হস্তলিখিত একখানি পুস্তক পাঠাইয়া লিখিলেন যে, সেখানি একজন ভদ্রলোকের

লিখিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত। তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া সংশোধন করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা ছাপিতে পারেন। কুমারী কলেট পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে অনেক স্থলে ভুল আছে; তাহা না ছাপাই ভাল। এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে লিখিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা এখন এখানে আছেন, তোমরা যদি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ছাপিতে চাও, তাঁহা দ্বারা লিখাইয়া দিতে পারি।" এই বলিয়া আমাকে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধে তাঁহারই সংগৃহীত কাগজপত্র লইয়া ইতিহাস লিখিতে বসিলাম। শেষ দুইমাস এই কাজে আবদ্ধ ছিলাম। সুতরাং বেশি ঘোরাঘুরি করিতে পারি নাই।

আমি যাহা লিখিতাম, তাহা কুমারী কলেটকে পড়িয়া শুনাইতাম। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বিষয়ে তাঁহার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতি অল্প লোকই ছিল। তিনি যাহা সংশোধন করিবার উপযুক্ত মনে করিতেন, তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া হইত এবং তিনি একজন যুবতী স্ত্রীলোককে আমার লিখিত প্রবন্ধ কাপি করিয়া দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া ছিলেন, তাহার দ্বারা কাপি করাইয়া লইতাম। এই যুবতী স্ত্রীলোকের বিষয়ে একটা স্মরণীয় ঘটনা আছে, তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করাই ভাল। আমার পুস্তক কাপি করে কে? এই প্রশ্ন উঠিলে কুমারী কলেট বলিলেন, "আমি তোমাকে একটী মেয়ে দিচ্ছি, সে তোমার লেখা কাপি করে দেবে, তাকে প্রত্যেক একশত শব্দের জন্য এক পেনি করে দিও।" এই বলিয়া সেই মেয়েটীর ইতিবৃত্ত আমাকে কিছু বলিলেন। তাহার মাতার মৃত্যুর পর তাহার পিতার মতিগতি বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। পানাসক্তি ও অপরাপর চরিত্রদোষ দেখা দিয়াছে। সে বেচারি বাধ্য হইয়া পিতার ভবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাসা লইয়াছে।

নিজে উপার্জ্জন করিয়া খায়, এবং প্রতিদিন দুপুর বেলার কয়েক ঘণ্টা গিয়া পিতার সঙ্গে বাস করে, ঘর পরিষ্কার করে, জিনিসপত্র গুছায়, পিতার সেবা করে এবং তাঁহাকে ভাল পথে আনিবার চেষ্টা করে। রাত্রে সে বাড়ীতে থাকিতে পারে না।

এই যুবতীর বিষয়ে যে ঘটনাটী স্মরণ আছে, তাহা এই। একদিন সন্ধ্যার সময় মেয়েটী কাপি লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। তখন আমি বেড়াইতে বাহির হইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছি। কাপিগুলি লইয়া মেয়েটীকে পয়সা দিয়া বলিলাম, "দাঁড়াও আমি বাহিরে যাইতেছি, দুজনে একসঙ্গে বাহির হইব।" দুইজনে বাহির হইলাম। রাস্তাতে আসিয়া বলিলাম, "চল, তোমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত বেড়াইতে বেড়াইতে যাই।" এই বলিয়া তাহার বাড়ীর দিকে চলিলাম। সে প্রায় দেড় মাইল পথ। কিন্তু আমরা পথের কথা ভুলিয়া গেলাম। কথাপ্রসঙ্গে প্রাচীন য়িহুদী জাতির ইতিবৃত্তের বিষয়ে কথা পড়িল। আমি Old Testament ও তৎপূর্ব্বে প্রকাশিত একখানি প্রাচীন য়িহুদী ইতিবৃত্ত পড়িয়া যাহা জানিয়াছিলাম, তাহা বলিতে লাগিলাম। কথায় কথায় দেখিলাম, মেয়েটী সে বিষয়ে এতদূর অভিজ্ঞ এবং এত কথা বলিতে লাগিল যাহা আমি অগ্রে স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই আলাপে মগ্ন হইয়া আমরা তাহার বাড়ীর দ্বারে গিয়া পৌঁছিলাম। কোথা দিয়া সময় যাইতেছে তাহা মনে নাই। তাহার বাড়ীর দ্বার হইতে দুইজনে ফিরিয়া আবার আমার বাসার অভিমুখে চলিলাম। অবশেষে আমাদের বাসার সন্নিকটে আসিয়া ঘড়ি খুলিয়া দেখি আহারের সময় সন্নিকট, তাহারও কার্য্যান্তরে যাওয়া প্রয়োজন। তখন সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। মেয়েটী চলিয়া গেলে ভাবিতে লাগিলাম, যে মেয়ে একশটা শব্দ লিখিয়া একপেনি করিয়া পায়, সে মেয়ে আমা অপেক্ষা জ্ঞানে এত

অগ্রসর যে, তাহার সহিত কথা কহিয়া আমি আপনাকে উপকৃত-বোধ করিতেছি। এদেশে জ্ঞানচর্চ্চা কি প্রবল! ইহাও মনে হইল প্রজা-সাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানস্পৃহা প্রবল থাকা নরনারীর সম্মিলনের মধ্যে পবিত্রতা রক্ষা হওয়ার একটী প্রধান উপায়। এই যে দুই ঘণ্টাকাল দুইজনে কথাবার্ত্তাতে মগ্ন ছিলাম—আমি যে পুরুষ এবং ও যে মেয়ে তাহা মনেই ছিল না। কোথা দিয়া সময় গেল তাহা জানিতেই পারিলাম না।

যাহা হউক ইতিবৃত্তখানি কিছুদিন লিখিতে লিখিতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ট্রুবনার কোম্পানি ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিবৃত্ত ছাপিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছেন। তখন আমি সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। লিখিত অংশটুকু বহু বৎসর পড়িয়া ছিল। অবশেষে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এখানে প্রকাশ করা গিয়াছে।

অবশেষে যে যে স্মরণীয় মানুষ সেখানে দেখিয়াছিলাম এবং যাঁহা-দিগের সহিত পরিচিত হইয়া আপনাকে উপকৃত বোধ করিয়াছি, তাঁহাদের বিষয় কিছু কিছু উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ড-বাসকালের বিবরণ শেষ করিতেছি। প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ইউনিটেরিয়ানদিগের নেতা ও গুরু আচার্য্য জেম্‌স মার্টিনো। তিনি নিজের ধর্ম্মজ্ঞান, চিন্তাশক্তি ও সাধুতার দ্বারা জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব? তাঁহার সঙ্গে একদিন মাত্র দেখা হইয়া-ছিল। কিন্তু সেই একদিন এ জীবনে চিরস্মরণীয় দিন হইয়া রহিয়াছে! আমি যখন লণ্ডনে, তখন ডাক্তার মার্টিনো সকল কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া স্কটলণ্ডের কোন নিভৃত প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে অক্সফোর্ড হইতে ডিগ্রী দিবার জন্য তাঁহার প্রতি এক নিমন্ত্রণ গেল। তিনি ডিগ্রী লইয়া স্কটল্যাণ্ডে ফিরিবার সময় দুইদিন লণ্ডনে

বাস করিয়া গেলেন। এই সংবাদ পাইয়া আমি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে ছিলাম কি না সন্দেহ। সেই অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই ধর্ম্মজীবনের অনেক গুরুতর তত্ত্ব ব্যক্ত করিলেন। তন্মধ্যে একটী এই:—কেবলমাত্র ভ্রম ও কুসংস্কারের প্রতিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতার উপরে ধর্ম্মসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথে এই এক বিপদ আছে যে ধর্ম্মভাবসম্পন্ন ভক্তিপ্রধান ব্যক্তিদিগকে সেইরূপ সমাজে তৃপ্ত করিয়া রাখা যায় না। দেখ আমারই স্বসম্পর্কীয় কতকগুলি লোক আমাদের অবলম্বিত ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্মে অতৃপ্ত হইয়া ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয় দলে প্রবেশ করিয়াছে; এবং এরূপ লোকও দেখা গিয়াছে, যাহারা একেবারে নিরীশ্বরবাদে উপনীত হইয়াছে। তাঁহার প্রধান কথাগুলি যেন আমার কানে লাগিয়া রহিয়াছে। তিনি বলিলেন "Somehow men do not stay with us।" তৎপরে ইউনিটেরিয়ান পরিবারে সন্তানদিগের ধর্ম্মশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না বলিয়া দুঃখ করিলেন। ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণের ধর্ম্মভাব ও ভক্তিপ্রাণতার বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। আমি যখন উঠিয়া আসিতেছি, তখন সিঁড়ি পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আসিয়া, আমি যখন নামিতেছি তখন সিঁড়ির উপর হইতে আমাকে বলিলেন, "Give us a little of your mysticism, and take from us a little of our practical genius." আমি ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম—দুই কথায় দুই জাতির বিশেষ ভাবটী কি সুন্দর রূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন! প্রাচ্য ভক্তিপ্রবণতা ও প্রতীচ্য কর্ম্মশীলতা মিলিত হইলে যে আদর্শ ধর্ম্মজীবন গঠিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় স্মরণীয় ব্যক্তি কুমারী কব্ (Miss Cobbe)। ইংলণ্ড যাত্রার পূর্ব্ব হইতেই আমি তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। তাঁহার বিমল ভক্তি

ও প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব আমার মনকে প্লাবিত করিয়াছিল। আমি যখন লণ্ডনে তখন তিনি ওয়েল্‌স্ প্রদেশে এক নিভৃত স্থানে বাস করিতেছিলেন। কিরূপে তাঁহার সঙ্গে দেখা হয়, এই চিন্তাতে যখন মগ্ন আছি তখন একদিন শুনিলাম—তিনি লণ্ডনে আসিয়াছেন। আসিয়া এক বন্ধুর ভবনে স্থিতি করিতেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ধাবিত হইলাম। গিয়া যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহা কখনও ভুলিবার নয়। মানুষের মুখ যে এত প্রসন্ন, প্রফুল্ল ও পবিত্র হইতে পারে এই আশ্চর্য্য। কুমারী কবের মুখ যেন প্রেমে ও আনন্দে মাখা! তিনি হাসিয়া প্রাণ খুলিয়া আমার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, এবং প্রেমে যেন আমার মনকে মাখাইয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মসমাজ এদেশে কি কাজ করিতেছেন, সে বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, এবং তিনি কি ভাবে ওয়েল্‌সে বাস করিতেছেন ও নিরীহ পশুদিগের রক্ষার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের এক সভাতে আমাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে আমি একদিন কিছু বলিয়াছিলাম।

তৃতীয় স্মরণীয় ব্যক্তি ফ্রান্সিস্ নিউম্যান। ইনি তখন সকল কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া সমুদ্রকূলবর্ত্তী ওয়েষ্টন সুপারমেয়ার (Weston Supermare) নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য সেখানে গমন করি, এবং দুইদিন তাঁহার ভবনে থাকি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অশীতিবৎসরের অধিক হইবে। সেই শীতপ্রধান দেশে হাত পা ঠিক রাখিতে পারেন না, তাঁহার স্ত্রী কাপড় পরাইয়া দেন, হাত ধরিয়া আনেন, তবে নীচে আসেন। যে দুই দিন সে ভবনে ছিলাম, সে দুইদিন দেখিলাম, যে, প্রাতে নীচে আসিয়া তাঁহার প্রথম কর্ম্ম ভগবানের নাম করা। সে উপাসনাতে

তাঁহার পত্নী, বাড়ীর রাঁধুনী, চাকরাণী প্রভৃতি সকলে উপস্থিত থাকিত। তিনি প্রথমে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ করিতেন; তৎপরে তাঁহার নিজের প্রণীত প্রার্থনা-পুস্তক হইতে একটী প্রার্থনা পড়িতেন। আহার করিতে গিয়া দেখি, তিনি ভোজনের টেবিলের নিকট আসিলেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বৃদ্ধ সাধু অগ্রে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া তবে আহার করিতে বসিলেন। দ্বিতীয় দিনে আহার করিতে বসিয়া আমাকে বলিলেন,—"তুমি যেখানে যেখানে যাইবে, একেশ্বরবাদীদিগকে বলিও, তাহারা যেন নাস্তিকের মত পৃথিবীতে বাস না করে। স্বীয় স্বীয় গৃহ ও পরিবারে ঈশ্বরের নাম ও উপাসনাকে যেন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে।" আমি তাঁহার পাঠাগারে গিয়া দেখি, তাঁহার প্রণীত যে-সকল গ্রন্থের কথা জানিতাম না সেই-সকল গ্রন্থে পাঠাগার পূর্ণ। তিনি যে এত ভাষা জানিতেন ও এত বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহা আমার ন্যায় তাঁহার অনুগত ভক্তদিগেরও অবিদিত ছিল। দুইদিন তিনি আমাকে সমুদ্র-তীরে লইয়া গিয়া অনেক উপদেশ দিলেন।

চতুর্থ স্মরণীয় ব্যক্তি থীষ্টিক চার্চের (Theistic Churchএর) আচার্য্য রেভারেণ্ড চার্লস্ ভয়সী (Rev. Charles Voysey)। আমি লণ্ডনে থাকিবার সময় মধ্যে মধ্যে ইহাঁর উপাসনা-মন্দিরে যাইতাম। তিনি যেমন সময়ে অসময়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ও যীশুর দোষকীর্ত্তন করিতেন, তাহা আমার ভাল লাগিত না; কিন্তু যে ভাবে উদার, আধ্যাত্মিক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সত্য-সকল ব্যক্ত করিতেন, তাহাতে আমার মন মুগ্ধ হইত। তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইলে তিনি তাঁহার বাড়ীতে আহারের জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন ভয়সী-গৃহিণী (Mrs. Voysey) ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সঙ্গে আমার আলাপ হইল। তাঁহারা একেবারে আমাকে নিজের লোকের মত করিয়া লইলেন। তারপর একদিন

ভয়সী সাহেবের অনুরোধে, তাঁহার উপাসনা-মন্দিরে উপদেশ দিলাম। সেই উপদেশে ব্রাহ্মসমাজ কি কি কাজে হাতে দিয়াছে ও কি করিতেছে, তাহার বর্ণন করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মগণ এদেশে কিরূপ সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করিতেছেন, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, সেই বিবরণ উপস্থিত ব্যক্তিদিগের অনেকের ভাল লাগিয়াছিল। একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে। উপাসনা-মণ্ডপ হইতে নামিয়া পার্শ্বের ঘরে আসিয়া ভয়সী সাহেব ও ভয়সী-গৃহিণীর সহিত কথা কহিতেছি, তখন মিষ্টার ভয়সীর কনিষ্ঠা কন্যা (যাহার বয়স তখন ২৭।২৮ বৎসর হইবে) আমাকে আর কথা কহিতে দেয় না, আমাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া বারবার বলিতে লাগিল, "মিষ্টার শাস্ত্রী, ব্রাহ্মসমাজ আমার সমাজ, ভারতবর্ষ আমার দেশ, আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমাকে নেবে কি না, বল না?" আমি ২।১ বার বলিলাম, "রোস কথা কহিতে দাও।" সে দেরি তার সয় না, আবার ঠেলিয়া বলে, "আমাকে সঙ্গে নেবে কি না বল না?" তখন আমি ভয়সী-গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম, "আপনার মেয়ে ত আমার সঙ্গে চলিল।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "যাওয়ার অর্থ কি তা ও এখনও বোঝে না। তা মন্দ কি! ওকে নিয়ে যাও।" ভয়সী সাহেবের একটী মেয়ে সিন্ধুদেশের একটা ব্রাহ্মযুবককে বিবাহ করিয়া এদেশে আসিয়াছে, সে সেই মেয়েটী কি না জানি না।

ইহার পরে আমি দেশে ফিরিলে, ভয়সী সাহেব তাঁহার মুদ্রিত উপদেশ সপ্তাহে সপ্তাহে আমার নিকট পাঠাইতেন। সর্ব্বদা চিঠি পত্র লিখিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমার কাজের জন্য অর্থসাহায্য করিতেন। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এই আত্মীয়তা রক্ষা করিয়াছিলেন।

পঞ্চম স্মরণীয় ব্যক্তি উইলিয়ম ষ্টেড্ সাহেব (William Stead)। ইনি তখন পেল-মেল গেজেটের সম্পাদকতা করিতেন। কুমারী কলেট

পত্রের দ্বারা তাঁহার সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। আমি প্রথমে পেল-মেল গেজেটের আফিসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি এবং আসামের কুলীদের অবস্থা ও কুলী আইনের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া সে বিষয়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য অনুরোধ করি। তিনি বিশেষ ভাবে আরো কিছু শুনিবার জন্য একদিন আমাকে তাঁহার বাড়ীতে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করেন। আমি গিয়া দেখিলাম, তিনি আহারের পূর্ব্বে আপনার শিশুসন্তানদিগকে লইয়া পাশের এক ঘরে একান্তে বসিয়াছেন এবং নানারূপ গল্পগাছা করিয়া উপদেশ দিতেছেন। আমি আসিয়াছি জানিবামাত্র আমাকে সেই ঘরে ডাকিয়া লইলেন। আমি গিয়া বসিলে বলিলেন, "আমি বড় কাজে ব্যস্ত মানুষ, দিনের অধিকাংশ সময় কাজে ব্যস্ত থাকি; দৃঢ়তার সঙ্গে সন্তানদের সঙ্গে কিছু সময় যাপন কর্‌বার নিয়ম না রাখ্‌লে, উহাদের শিক্ষা ও উন্নতির প্রতি দৃষ্টি থাক্‌বে না—এইজন্য নিয়ম করেছি যে সায়ংকালীন আহারের পূর্ব্বে এক ঘণ্টাকাল উহাদের সঙ্গে বস্‌বোই বস্‌বো"। আমি বলিলাম, "এটা বড় ভাল।" তারপর তিনি আমার সমক্ষেই তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। দেখিলাম, অতি সহজ ভাষায় এমন সকল জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদের গোচর করিতেছেন, যদ্দারা তাহাদের বিশেষ উপকৃত হইবার সম্ভাবনা। তার পর, আহারের পর আমি আসামের কুলীদের অবস্থা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি চেয়ারে বসিয়া বলিতেছি, ষ্টেড ঘরের এধার হইতে ওধারে বেড়াইতেছেন, এবং তার পর, তার পর, করিতেছেন। ইহা লইয়া একটা হাসাহাসি উপস্থিত হইল। আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তুমি যে আমাকে জুঅলজিক্যাল গার্ডেনের বাঘের কথা স্মরণ করাইতেছ, একটু বস না।" ষ্টেড বলিলেন, I can not make my mind sit down. (আমি আমার মনকে বসাইতে পারি না)। আমি হাসিয়া বলিলাম,

"আধ ঘণ্টা বসিবে, তাও পার না? আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে চল, আমি দেখাইয়া দিব, আমাদের দেশের সাধুরা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ধ্যানে বসিয়া আছেন।" ষ্টেড করতালি দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ও বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। আমি ভাবিতাম এত কোটি মানুষকে আমরা কি করিয়া জিনিয়া লইলাম। এত দিনের পর বুঝিলাম, তোমরা চোখ মুদিয়া থাকিয়াছ, আমরা পশ্চাৎ হইতে মারিয়া লইয়াছি!" ইহা লইয়া খুব হাসাহাসি চলিতে লাগিল।

আর একদিনের কথা মনে আছে; সেদিনও আমাকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেদিন আহারের পর আমি তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে প্রেততত্ত্ব ও মানসিক প্রেরণার (Telepathy) বিষয়ে কিছু বলিলাম। তৎপূর্ব্বে লণ্ডনের কোন পরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করিলাম। সে বিষয়টী এই—সেদিন আহারের পর সে বাড়ীর মেয়েরা আমাকে এক খেলা দেখাইলেন। একটী মেয়ে আমাকে পাশের এক ঘরে লইয়া গিয়া রুমাল দিয়া আমার দুই চক্ষু বাঁধিলেন। বাঁধিয়া বলিলেন, "তোমাকে বৈঠকঘরে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে দাঁড় করিয়ে দেবো, নিজে একটা কিছু ইচ্ছা রাখ্‌বে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, তারপর চল্‌তে ইচ্ছা হলে চল্‌বে, কিছু কর্‌তে ইচ্ছা হলে কর্‌বে, তাতে বাধা দিবে না। আমি তোমার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত দিয়ে থাক্‌ব মাত্র।" এই বলিয়া মেয়েটী আমার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া আমাকে বৈঠকঘরে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, এবং নিজে আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কাঁধে হাত দিয়া রহিল। আমি যথাসাধ্য মনটা নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিলাম। ক্রমে চলিতে ইচ্ছা হইল, সেই চোখবাঁধা অবস্থাতেই অগ্রসর হইলাম; হাত বাড়াইতে ইচ্ছা হইল, হাত বাড়াইলাম; একটা চেয়ারের উপর হইতে একখানা কাপড় তুলিতে

ইচ্ছা হইল, তুলিলাম; অমনি চারিদিকে করতালি ধ্বনি উঠিল। তাড়াতাড়ি চক্ষের বাঁধন খুলিয়া শুনি, সেই গৃহস্থিত পুরুষ ও নারীগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে, চোখ-বাঁধা মানুষটী আসিলে তাহা দ্বারা ঐ কাপড়টী তুলাইতে হইবে; এবং আমি ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইলে সেই প্রকার ইচ্ছা করিতেছিলেন। অবশ্য, যে মেয়েটী আমার পশ্চাতে· ছিল, সেও ঐ বিষয় জানিত এবং সেও সেই প্রকার ইচ্ছা করিতেছিল। আমি যে বিষয়ে কিছুই জানিতাম না, সেরূপ কাজ আমা দ্বারা হইল, ইহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম।

ষ্টেড ও তাঁহার পত্নীর নিকট যখন এই কথা ব্যক্ত করিলাম, তখন ষ্টেড সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "তাও নাকি হয়। আমাকে কিছু জান্‌তে দেবে না, আর আমা দ্বারা কাজ করিয়ে নেবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।" আমি বলিলাম, "এসো, আমি করে দেখাই।" তৎপরে পাশের ঘর হইতে, ষ্টেড সাহেবের চোখ বাঁধিয়া আনা হইল। আমি কাঁধে হাত দিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলাম, কিন্তু তাঁহা দ্বারা যে কাজ করাইব স্থির ছিল, তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া গেল না। আমি বলিলাম, "তুমি মনটা নিগেটিব (Negative) করিয়া রাখিতে পার নাই, আমার ইচ্ছাকে বাধা দিয়াছ।" তারপর তাঁর ঘরের এক কোণে একটা টুপিতে একটা পয়সা রাখিয়া, মিসেস ষ্টেডের চোখ বাঁধিয়া আনিলেন। আমি তাঁহার পিঠে হাত দিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলাম। তিনি বরাবর ঘরের কোণে গেলেন, অবনত হইয়া টুপির মধ্যে হাত দিলেন, কিন্তু পয়সাটি তুলিলেন না। এতটা দেখিয়া ষ্টেড কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। তাহার পর তাঁহার এক কন্যার চোখ বাঁধিয়া আনা হইল। এবার স্থির হইল সে নির্দ্দিষ্ট একটী জিনিস লইয়া তাহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিবে। সে আসিয়া দাঁড়াইলে আমি তাহার কাঁধে হাত দিয়া তাহার

পশ্চাতে দাঁড়াইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই সে চলিতে আরম্ভ করিল এবং সেই জিনিসটি তুলিয়া লইয়া চোখ-বাঁধা অবস্থাতেই নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতার দিকে চলিল। তখন পিতা, মাতা, ভাই, বোন, সকলে মিলিয়া ছোট ছেলেটির হাতের পাশে হাত পাতিলেন। চোখ-বাঁধা মেয়েটী একে একে সকলের হাত ছুঁইয়া পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে ছোট ভাইটীর হাতেই জিনিসটী দিল। তখন ষ্টেড আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন তবে ত ইহার ভিতর কিছু আছে। এক মনের শক্তি দ্বারা যদি আর-এক মনের ও শরীরের উপরে এরূপ কাজ কাজ করা যায়, তবে কেন পরলোকগত আত্মারা এজগতের মানুষের উপর কাজ কর্‌বে না।" আমি বলিলাম, "তাই ত বটে, আমিও ত তাই বলি।" ইহার পর আমি এদেশে চলিয়া আসিলাম। কিছুদিন পরে শুনি ষ্টেড প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহার প্রকাশিত পত্রিকা ও পুস্তকে তাহার অনেক প্রমাণ পাইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি যে ঘটনার কথা বলিতেছি সে সময়ে তাঁহার সে প্রকার ভাব কিছুই দেখি নাই। তাহাতে অনুমান করি, অপরাপর ঘটনার মধ্যে এটীও তাঁহার চিত্তকে ওই দিকে প্রেরণ করিয়া থাকিবে।

যে যে ব্যক্তির নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করিলাম, তদ্ব্যতীত আরও কয়েকজন অগ্রগণ্য পুরুষ ও নারীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যথা অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌, অধ্যাপক জন এষ্ট্‌লিন্‌ কার্পেণ্টার, রেভারেণ্ড ষ্টপফোর্ড ব্রুক, মিসেস ফসেট, মিসেস জোসেফাইন বাট্‌লার। ইঁহাদের মধ্যে মিসেস বাট্‌লারকে দেখিয়া মনে যেন নব শক্তি পাইয়াছিলাম। তিনি তখন যে ভাবে কার্য্য করিতেছিলেন, তাহাতে নারীকুলের মধ্যে এক আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চার হইতেছিল। যে সময়ে তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তখন তিনি আইরিশ নেতা পার্ণেলের পক্ষ

ছিলেন; কিন্তু অচিরকালের মধ্যে পার্ণেলের দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ পাইলে মিসেস বাট্‌লারের দল তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিলেন এবং নারীগণের খড়্গাঘাতে পার্ণেল দাঁড়াইতে না পারিয়া অকালে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। ইংলণ্ডের নারীশক্তি কিরূপে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে তাহা এদেশের লোক জানে না। এদেশের প্রাচীনভাবাপন্ন অনেক মানুষের মত দেখি যে, নারীগণকে সামাজিক স্বাধীনতা দিলে সামাজিক পবিত্রতা থাকিবে না। ঠিক ইহার বিপরীত কথা সত্য। নারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতার উপরেই সামাজিক শক্তি ও পবিত্রতা নির্ভর করে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আমি ইংলণ্ডে আসিয়াই এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম যে ইংরেজ জাতি এত অল্পসংখ্যক হইয়াও কিরূপে এত বড় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের উপরে রাজত্ব করিতেছে? এই শক্তির মূল নিশ্চয় ইহাদের জাতীয় চরিত্রে আছে। সে মূল কি তাহা একবার দেখিতে হইবে।

তাঁহাদের জাতীয় চরিত্রের যে যে গুণ আমার প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তাহা এই। প্রথম, তাঁহাদের জাতীয় চরিত্রে যেমন একদিকে স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তি ও স্বাবলম্বন-শক্তি আছে, তেমনি অপর দিকে সাধুভক্তি ও বাধ্যতা আছে। এই উভয়ের সমাবেশ অতীব আশ্চর্য্য। প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়িতাম, আর এদেশের সহিত একটা বিষয়ে পার্থক্য মনে হইত। এদেশে থাকিতে সকল বিষয়ে মানুষকে গভর্ণমেণ্টের দোহাই দিতে দেখিতাম, দুর্ভিক্ষ আসিতেছে গভর্ণমেণ্ট দেখিবেন, জলপ্লাবন হইয়াছে গভর্ণমেণ্ট দেখিবেন, নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা হইতেছে না গভর্ণমেণ্ট দেখিবেন, সুরাপান বাড়িতেছে গভর্ণমেণ্ট দেখিবেন, ইত্যাদি। সেখানে গিয়া দেখিলাম গভর্ণমেণ্ট কোণ-ঠাসা, গভর্ণমেণ্টের খোঁজ খবর বড় পাওয়া যায় না, সব কাজ প্রজারাই করিতেছে, গভর্ণমেণ্ট কোন কোন বিষয়ে সহায় মাত্র। প্রজারা প্রকাশ্য সভাদিতে গভর্ণমেণ্টকে অবাক্য কুবাক্য বলিতেছে; পার্লেমেণ্ট সভাতে তাঁহাদের নাকের সম্মুখে ঘুষি ঘুরাইতেছে; একদিকে এই স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তি ও স্বাবলম্বন, অপর দিকে যে কোনও কাজ দশজনে মিলিয়া করিতেছে, সেই কাজেই দেখা যাইতেছে যে যাহার প্রতি যে কাজের প্রধান ভার প্রদত্ত হইতেছে, অপরেরা সেই

উচ্চতম কর্ম্মচারীর আজ্ঞাবহ থাকিয়া সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতেছে। এই জাতীয় চরিত্রগত বাধ্যতার গুণে বড় বড় কাজ কলের মত চলিতেছে। ইংরাজগণ মহা স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তি সত্ত্বেও রাজবিধির বাধ্য, পুলিসের বাধ্য, আইন আদালতের বাধ্য, সামাজিক ও গার্হস্থ্য নিয়মাবলীর বাধ্য। জাতীয় চরিত্রে বিরুদ্ধগুণের এই এক অদ্ভুত মিলন।

দ্বিতীয় মিলন, স্থিতিশীলতা ও উন্নতিশীলতার। এমন স্থিতিশীল, প্রাচীনের প্রতি এরূপ আস্থাবান জাতি অল্পই দেখিয়াছি। কোনও ভদ্রগৃহস্থের গৃহে যাও, অপরাপর দ্রষ্টব্য বিষয়ের মধ্যে সেই পরিবারের পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতিচিহ্ন ভক্তিসহকারে প্রদর্শিত হইবে। হয় ত গৃহস্বামী তোমার হস্তে একখানি বাইবেল দিয়া বলিবেন এখানি আমার অত্যতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের ব্যবহৃত গ্রন্থ। গুণিগণের ও দেশের অতীত মহাশয়গণের প্রতি সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তি শ্রদ্ধা।

উইণ্ডসর্ কাস্‌ল (Windsor Castle) রাজবাড়ী দেখিতে গিয়া দেখিলাম যে মাস্তলটার নিম্নে নেলসন আহত হইয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে প্রোথিত রহিয়াছে, এবং জেনারেল গর্ডনের ব্যবহৃত বাইবেলখানি একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্সের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। জাতীয় চরিত্রে সাধুভক্তি এতই প্রবল, প্রাচীনের প্রতি আস্থা এতই প্রবল যে রাজ্যেশ্বরী মহারাণী পর্য্যন্ত একজন প্রজার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করা আবশ্যক মনে করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের যে কোনও বড় নগরে যাওয়া যায়, সকল স্থানেই রাজপথ-সকল তৎতৎ প্রদেশের বড়লোকদিগের পাষাণনির্ম্মিত মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার অ্যাবী (Westminster Abbey) নামক প্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে পদার্পণ করিলে, দেশের বড় বড় কবি, বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় সাধু সদাশয় মানুষের স্মৃতিচিহ্নে সে স্থান পূর্ণ দেখা যায়। তাঁহাদের সুখ্যাতিপূর্ণ

যে-সকল উক্তি তাঁহাদের স্মৃতিস্তম্ভে লিখিত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া শরীর কণ্টকিত হইতে থাকে। একদিন সেখানকার সেন্ট পল নামক গির্জ্জাতে পদার্পণ করিয়া দেখি যে ভারত-প্রসিদ্ধ সার উইলিয়ম জোন্স সাহেবের এক প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার এক পার্শ্বে এক ব্রাহ্মণ শিক্ষকের মূর্ত্তি, অপর পার্শ্বে এক মুসলমান মৌলবীর মূর্ত্তি। সে দেশের নানা স্থানে বড়লোকদিগের স্মৃতি আর-একপ্রকারে রক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা জীবনের অধিকাংশ দিন যে গৃহে বাস করিয়াছিলেন সেই গৃহগুলি পূর্ব্বাবস্থাতে রাখা হইয়াছে, এবং গৃহগুলি গৃহস্বামীর স্মৃতিচিহ্নে পরিপূর্ণ। এইরূপে দেখা যায় সে দেশের রাজাপ্রজা সকলের মনে সাধুভক্তি প্রবল।

আবার অপর দিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চার দিকে সর্ব্বশ্রেণীর মনোযোগ; ধর্ম্ম সমাজনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক নূতন তত্ত্ব-সকলের আলোচনার জন্য নানাপ্রকার আয়োজন। সাধুভক্তিতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল করিতেছে না। সভা, সমিতি, পাঠাগার প্রভৃতির অন্ত নাই।

জাতীয় চরিত্রে তৃতীয় পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ অতীব আশ্চর্য্য। তাহা একদিকে জ্ঞান ও বিশ্বাসের ঐকান্তিকতা ও তন্নিবন্ধন উন্নতিস্পৃহার উৎকটতা, আবার অপর দিকে তাহার লাভ বিষয়ে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। সুরাপাননিবারণী সভাতে, বা female suffrage সভাতে যাইয়া বক্তাদিগের কথা শুনিলে মনে হয় যে তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন না করিলে দেশের পরিত্রাণ নাই, অথচ কাগজে পড়ি যে তাঁহাদের প্রার্থনা পার্লেমেণ্টের গোচর করিয়া তাঁহারা স্বীয় অভীপ্সিত লাভ করিবার জন্য দশবৎসর, বিশবৎসর, ত্রিশবৎসর অপেক্ষা করিতেছেন; প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ধৈর্য্যধারণ করিতেছেন।

চতুর্থ বিরুদ্ধগুণদ্বয়ের সমাবেশ, তুষ্ণীভাব, নির্জ্জন-বাস, আত্ম-চিন্তা এবং সজন-বাস ও কার্য্যদক্ষতা। মানুষ এ জীবনে স্বল্পভাষী হইয়া

কিরূপে কাজ করিয়া যাইতে পারে, এ বিষয়ে মানববুদ্ধিতে যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে ইংরাজগণ তাহা করিয়াছেন। ভদ্র গৃহস্থের গৃহে শিশু সন্তান যদি না থাকে তবে সে গৃহে থাকাও যাহা আর হিমালয়ের শৃঙ্গে কোনও গিরিকন্দরে থাকাও তাহা। চাকরাণী আসিতেছে যাইতেছে, আদেশ শুনিতেছে তাহা পালন করিতেছে, ফিরীওয়ালা জিনিসপত্র দিয়া যাইতেছে, জল-স্রোতের ন্যায় কার্য্যের স্রোত চলিতেছে, অথচ গৃহে সাড়া নাই শব্দ নাই। চাকর-চাকরাণী যে ঘরে থাকে সে ঘরের প্রত্যেক ঘরের নম্বর অনুসারে নম্বরওয়ালা ঘণ্টা আছে, তাহার সঙ্গে প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে তারযোগে যোগ আছে। যদি চাকরাণীকে চাও তবে তোমার ঘরে বসিয়া কলনাড়া দেও, এক মিনিটের মধ্যে চাকরাণী আসিয়া উপস্থিত, তোমার দ্বারে টোকা দিতেছে, তাহাকে ঘরে আসিতে বল, তবে তোমার ঘরে প্রবেশ করিবে। তুমি আদেশ কর, অবিলম্বে তদনুসারে কার্য্য করিবে। এমন স্বরে তোমাকে কথা কহিতে হইবে যেন অপর ঘরের লোক শুনিতে না পায়। তুমি একটী রাস্তার ধারের বাড়ীতে আছ, নিজের ঘরে বসিয়া লিখিতেছ, সাড়া নাই, শব্দ নাই; কেবল মস্ মস্ জুতার শব্দ শোনা যাইতেছে, কিন্তু একবার যদি উঠিয়া জানালার কাছে দাঁড়াও বোধ হইবে যেন রাস্তাতে টুপীর বন্যা আসিয়াছে, এত লোক যাইতেছে! দোকানে কাপড় কিনিতে যাও, যেই দ্বারটী ঠেলিবে অমনি কোথা হইতে টং করিয়া একটী ঘণ্টা বাজিবে, প্রবেশ করিবামাত্র একজন লোক উপস্থিত; আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে যাহা প্রয়োজন তাহাকে বল, অবিলম্বে তাহা পাইবে, দর নাই দস্তুর নাই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ সমাধা। যেমন নিস্তব্ধ ভাবে কাজ করিবার রীতি তেমনি সময় বাঁচান। এই গুণেই ইংরাজগণ কাজ করিবার এত সময় পান। বলিতে কি ছয়মাস ইংলণ্ডে বাস করিয়া আমার চুপে চুপে

কথা কহার এরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, স্বদেশে ফিরিয়া বঙ্গদেশের স্বরের মাত্রাতে উঠিতে অনেক দিন গেল। ঐ সময়ের মধ্যে যাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহাদের অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেন আমার অসুখ করিয়াছে কি না, নতুবা এত চুপে চুপে কথা কহিতেছি কেন!

আমি ইংরাজ জাতির এই নির্জ্জনবাস ও নিস্তব্ধতার বিশেষ ইষ্ট ফল দেখিয়াছি। প্রত্যেক ভদ্র ইংরাজের গৃহে একটী ঘর থাকে, যাহাকে Drawing Room বা বৈঠকখানা বলে। সে ঘরে কেহ শয়ন করে না, তাহা কেবল বন্ধুবান্ধব অতিথি অভ্যাগতগণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিবার ঘর। বাড়ীর লোকে সায়াহ্নিক আহারের পর সেখানে বসিয়া বিশ্রাম ও গল্পগাছা করেন। লোকে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সেই ঘরে দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন গৃহস্বামীর একটী স্বতন্ত্র ঘর থাকে, তাহাকে Study বা পাঠাগার বলে। সেখানে তিনি যখন বাস করেন, তখন সে ঘরে কেহ যায় না। তিনি সেখানে বসিয়া পাঠ ও চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহাতেই ইংরাজগণ বড় বড় কাজ করিতে পারিতেছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ কাজ নির্জ্জনবাস ও আত্মচিন্তার ফল। একদিকে নির্জ্জনে পাঠ ও চিন্তা, অপরদিকে সজনে কার্য্যদক্ষতা ও ও আবশ্যক হইলে বক্তৃতা। ইংরাজগণ সজনে কাজকর্ম্মে গুরুতর শ্রম করেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তখন এরূপ মন প্রাণ দিয়া কার্য্য করেন যে দেখিলে মনে হয় যে, তাঁহাদের অন্য কর্ম্ম বুঝি নাই।

পঞ্চম বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ, সামাজিকতা ও ধর্ম্মভাব। আমি যখন সেখানে ছিলাম দেখিতাম পর্ব্বাহ বা ছুটির দিনে হাজার হাজার লোক লণ্ডন সহর হইতে রেলযোগে বাহির হইয়া যাইত। সহরের বাহিরে কোনও মাঠে বা বনে আমোদ-আহ্লাদে দিনটা অতিবাহিত

করাই উদ্দেশ্য; ফিরিবার সময় রেলগাড়ি হইতে নামিয়া একজন লোক যদি একটা পায়নাফোর্টে নাচের বাদ্য বাজাইল, অমনি দলে দলে পুরুষ ও নারী কোমরে কোমরে বাঁধাবাঁধি করিয়া রেলওয়ে প্লাটফর্মেই নাচিতে আরম্ভ করিল। যেন আমোদ প্রাণে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ইটালিয়ান ব্যাণ্ড নামে একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র লইয়া লোকে দ্বারে দ্বারে বাজাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করে। কোনও স্থানে সেই বাদ্য বাজিতেছে, দুইটা নিম্নশ্রেণীর ১৭।১৮ বৎসরের বালিকা কিছু কিনিতে বাজারে যাইতেছে। যেই বাদ্য শোনা অমনি কোমরে জড়াজড়ি করিয়া রাস্তার উপরেই নাচ। সামাজিক সুখভোগের প্রবৃত্তি প্রবল। কিন্তু তাহা বলিয়া ইংরাজ জাতিতে লঘুচিত্ততা নাই। ন্যায়ান্যায়ের বিচার যখন আসে, রাজনীতি বা সামাজিক নীতির উৎকর্ষ বিধানের প্রস্তাব যখন উপস্থিত হয়, তখন ইংরাজ আপাদমস্তক ঐকান্তিকতায় পরিপূর্ণ। সত্যের জয় হইবেই হইবে, অধর্ম্ম হেয় ও ধর্ম্ম শ্রেয়, ইহা তাহাদের অস্থি মজ্জা মাংস মস্তিষ্কে যেন বসিয়া আছে। আমি ব্রাডলা দলের নাস্তিকদের সভাতে উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়াছি, তাঁহাদের কথার ভাবভঙ্গী ও মত প্রকাশের ঐকান্তিকতা দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহাদের মতে তাঁহাদের পথাবলম্বী না হইলে ইংলণ্ডের রক্ষা নাই এবং সেই পথাবলম্বী হইতেই হইবে। এইসব দেখিতাম, আর মনে মনে এই কথা জাগিত—ইংরাজ জাতি সত্যানুরাগী ও ধর্ম্মানুরাগী জাতি।

আমি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে একদিন ষ্টেড্ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইংলণ্ড হইতে কি লইয়া যাইতেছ?

আমি—কি জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ?

ষ্টেড—না, তা কেন? কি দেখিয়া কি শিখিয়া গেলে?

আমি—দেখিয়া যাইতেছি যে তোমরা ধর্ম্মপ্রবণ বিশ্বাসী জাতি,

তোমাদের নাস্তিকেরাও আস্তিক, তারাও বিশ্বাস করে যে ব্রহ্মাণ্ড ধর্ম্ম-নিয়ম দ্বারা শাসিত, এখানে সত্যের জয় হবেই হবে।

ষ্টেড—তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমরা ধর্ম্মপ্রবণ জাতি।

ফলতঃ এই ধর্ম্মপ্রবণতা ইংরাজজাতির চরিত্রের মূলে মহাশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে।

ইংরাজজাতির উন্নতির ও মহত্বের আর-একটী মূল কারণ লক্ষ্য করিলাম। তাহা ইংরাজের গার্হস্থ্যনীতি। মধ্যবিত্ত ভদ্র ইংরাজের গৃহ একটী দেখিবার জিনিস। দশ দিন তাহার মধ্যে বাস করিলে মনে এক অভূতপূর্ব্ব শান্তি আনন্দ ও পবিত্রতা অনুভব করা যায়। ইংরাজের গৃহের সৌন্দর্য্যের অনেকগুলি কারণ আছে। যে যে কারণ আমার মনে লাগিয়াছে তাহাই উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম কারণ, মধ্যবিত্ত ভদ্র ইংরাজ গৃহস্থের ভবনে নারীর অধিকার। ইংরাজের গৃহে, গৃহিণী সত্য-সত্যই গৃহস্বামিনী, রাণী। পুরুষ উপার্জ্জক, সুতরাং বিচারের দিক দিয়া দেখিলে তাঁহারই কর্ত্তা হইবার কথা। কিন্তু ইংরাজজাতির সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে গৃহিণীই রাণী। পুরুষ গৃহে তাঁর প্রজা বা প্রধান মন্ত্রী। পুরুষ যাহা উপার্জ্জন করেন তাহা গৃহিণীর হস্তে দিয়া তাঁহারই কর্তৃত্বাধীন হইতে ভাল বাসেন। গৃহের ব্যবস্থা বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিয়া তিনি পাঠ চিন্তাদি দ্বারা আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইতে পারেন।

গৃহিণীর সর্ব্বময় কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা থাকাতে অতি চমৎকার ফল ফলিতেছে। নারীগণ সর্ব্ববিধ জ্ঞানচর্চ্চার অংশী ও সর্ব্ববিধ শুভচেষ্টার সহায় হইতেছেন। আমি কোনও বক্তৃতাদি শুনিতে গেলে সভায় অর্দ্ধেক নারী দেখিতে পাইতাম। অনেক সময়ে কোনও বিখ্যাত আচার্য্যের উপদেশ শুনিবার জন্য স্ত্রীলোক ঠেলিয়া

উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইত। কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণাদিতে গেলে, বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত কোনও জ্ঞানের বা সামাজিক উন্নতির প্রসঙ্গে কোথা দিয়া সময় যাইত জানিতে পারিতাম না।

অথচ প্রত্যেক ভদ্র গৃহস্থের গৃহে নারীগণের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ সকল সামাজিক শাসন ও সুনিয়ম দেখিতে পাইতাম যে, দেখিয়া মন মুগ্ধ হইত। এদেশের লোক নারীর অবরোধ দেখিয়া অভ্যস্ত, তাহাদের স্বভাবতঃ মনে হইতে পারে যে যে-সমাজে নারীগণ সম্পূর্ণ সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করেন, তাঁহারা বোধ হয় নীতি অংশে হীন। অন্য দেশের কথা জানি না, ইংরাজ মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের নারীগণ পবিত্রতার আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারাই ইংরাজ জাতির গৌরব ও শক্তির মূলে।

নারীজাতির শিক্ষা ও সামাজিক অধিকারের পরে ইংরাজ গৃহস্থের গৃহের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ পারিবারিক সকল কার্য্যের সুব্যবস্থা। যে কাজটি যে সময়ে করিবার নিয়ম আছে, সে সময়ে সেটি হইবেই হইবে। উঠিবার ঘণ্টা, চা খাইবার ঘণ্টা, পারিবারিক উপাসনার ঘণ্টা, প্রাতরাশের ঘণ্টা, মাধ্যাহ্নিক আহারের ঘণ্টা, বৈকালের চা খাইবার ঘণ্টা, ডিনারের ঘণ্টা, এইরূপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়াছে, ঠিক সময়ে আসা চাই, ঠিক সময়ে খাওয়া চাই, ঠিক সময়ে ওঠা চাই। এইরূপ সময়ের সুব্যবস্থা থাকাতে, হাতে অনেক সময় থাকে এবং পরিবারের লোকেরা অনেক কাজে মন দিতে পারে। তৎপরে অগ্রে যে নিস্তব্ধতার বর্ণনা করিয়াছি তাহা পরিবার মধ্যেও বিদ্যমান। গৃহমধ্যে জলস্রোতের ন্যায় কার্য্যস্রোত চলিতেছে অথচ গৃহের মধ্যে থাকিয়াও জানিতে পারা যায় না। যে পড়িতেছে, সে নিস্তব্ধ গৃহে নির্জনে একান্ত মনে পড়িতেছে; যে চিন্তা করিতেছে সে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা

করিতেছে; যে কাজ করিতেছে সে অপরপার্শ্বে দুরন্ত শ্রম করিতেছে; যার কাজ তার কাজ তাহাতে অপরের সংশ্রব নাই। এই চিন্তা ও কার্য্যের ব্যবস্থা অতীব মনোরম।

তাহার পর আর-একটা গুণ যাহাকে ইংরাজীতে order বলে, অর্থাৎ সেখানকার যেটা সেইখানে সেইটা থাকা। দোয়াতটার জায়গায় দোয়াতটা, বই গুলির জায়গায় বইগুলি, আবশ্যক হইলেই পাওয়া যায়। কোনও জিনিসের প্রয়োজন হইলে পাইতে দুই মিনিট বিলম্ব হয় না। এদেশে কতবার দেখিয়াছি গৃহস্বামী একস্থানে দোয়াত কলম রাখিয়া গিয়াছিলেন, বাড়ীর কোন ছেলে আসিয়া কলমটা কোথায় লইয়া গিয়াছে, গৃহস্বামী একটা বিল স্বাক্ষর করিয়া দিবেন, কলমটার প্রয়োজন; চীৎকার করিতেছেন, "ওরে রামা। কলম নে-গেল কে? কলমটা দেখে নিয়ে আয়।" কলম আসিতে বিলম্ব হইতেছে, তাঁহার মেজাজ খারাপ হইয়া যাইতেছে; সে বিল স্বাক্ষর করাইতে আসিয়াছে, সে দ্বারে দণ্ডায়মান, তার সময় যাইতেছে; বাবুর ক্রোধ বাড়িতেছে, মহা হুলস্থুল। ইংরাজ ভদ্রলোকের গৃহে এরূপ ঘটনা বড় নিন্দার বিষয়। এরূপ ঘটিতে থাকিলে সে বাড়ীর গৃহিণীর ভদ্রসমাজে মুখ দেখান কঠিন।

মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহে এই গার্হস্থ্য ব্যবস্থার পরে পারিবারিক প্রধান গুণ পরিচ্ছন্নতা (cleanliness)। প্রতিদিন গৃহের সকল বিভাগ সুমার্জ্জিত হয়, কেবল তাহা নহে, প্রত্যেক চেয়ারের পায়াগুলি, প্রত্যেক খাটের পায়া ও বাড়গুলি, প্রত্যেক আলমারির ধারগুলি, কাপড়ের দ্বারা উত্তমরূপে মার্জ্জিত হইয়া থাকে। অনেক গৃহস্থের গৃহসামগ্রীগুলি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন অল্প দিন সে বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছেন।

সর্ব্বোপরি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ ভদ্রগৃহস্থের গৃহে ধর্ম্মের একটা ছায়া আছে। প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা হইয়া থাকে; রবিবার

গির্জ্জাতে যাওয়া ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত হয়। সৎকার্য্যের জন্য দান অধিকাংশ স্থানে অযাচিতরূপে করা হইয়া থাকে। এইরূপে ধর্ম্মভাব ও নীতির ভাব পারিবারিক হাওয়ার মধ্যেই বিদ্যমান। দুই দিন সেই হাওয়াতে বাস করিলেই তাহা অনুভব করা যায়।

আমি লণ্ডনে ও মফঃস্বলে যে যে পরিবারে গিয়া বাস করিতাম সেই-খানেই পারিবারিক জীবনের এই-সকল সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম।

আমি মে মাসে লণ্ডনে পৌঁছিয়াছিলাম, নভেম্বর মাসে স্বদেশে প্রস্থান করিলাম। আসিবার সময় দুর্গামোহন বাবুর সঙ্গ পাইলাম না। তিনি পীড়িত হইয়া তৎপূর্ব্বেই পার্ব্বতী বাবুর সঙ্গে দেশে ফিরিয়াছিলেন। আমি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লইয়া ব্যস্ত থাকাতে তাঁহাদের সঙ্গে আসিতে পারি নাই।

যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিবার জন্য বন্ধুবর দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইল, অচিরকালের মধ্যে সেই ইতিবৃত্ত লেখাই বন্ধ করিতে হইল। আগেই বলিয়াছি যে ট্রুবনার (Trubner) কোম্পানী ঐ ইতিবৃত্ত ছাপিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। কি শুনিলেন, কি ভাবিলেন, আমরা জানিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র কুমারী কলেটকে জানাইলেন যে তাঁহারা সে সংকল্প ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই আদেশক্রমে আমার লিখিত অংশ ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীর পুস্তকাধ্যক্ষ একজন জর্ম্মান পণ্ডিতকে দেখাইয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিয়দংশ রেভারেণ্ড ষ্টপফোর্ড ব্রুককেও পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি ভারি খুসী হইয়াছিলেন। ট্রুবনার কোম্পানী পিছাইয়া পড়িতেছে শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "তুমি থাক, আমি ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী দ্বারা তোমার বই ছাপাইব।" কিন্তু আমি থাকি কিরূপে?

আমার কতিপয় বন্ধু আমার ইংলণ্ডে থাকিবার ব্যয় দিতেছিলেন,—তাঁহাদিগকে ভারাক্রান্ত করিতে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। আমি কোন কোন সংবাদপত্রে লিখিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছিলাম। তাহাতেও সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে মনে হইল যাহা লিখিবার আছে দেশে গিয়া লেখাই ভাল। তাই স্বদেশে প্রস্থান করিলাম।

আসিবার সময়কার একটা ঘটনা মনে আছে। আমি আসিবার সময় Talmudic Miscellanies, Life and Teachings of Confucius, প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক কিনিয়া আনিয়াছিলাম। জাহাজে সেইগুলি সর্ব্বদা পাঠ করিতাম এবং অধিকাংশ সময় ধর্ম্মচিন্তাতে যাপন করিতাম। আমাদের সঙ্গে একজন ইংরাজ খ্রীষ্টীয় মিশনরি আসিতেছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে কথা কহিতেন না, কিন্তু যখন দেখিলেন আমি কখনও Talmud পড়িতেছি, কখনও Confucius পড়িতেছি, কখনও বাইবেল পড়িতেছি, তখন আমি কি তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী।

আমি—আমি একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক।

মিশনারি—তোমাকে কখনও দেখি Talmud পড়িতেছ, কখনও দেখি Confucius পড়িতেছ, এ সকল পড় কেন?

আমি—পড়িয়া জ্ঞানোপদেশ পাই বলিয়া। ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক উচ্চকথা পাই বলিয়া।

মিশনারি—তোমাকে বাইবেলও পড়িতে দেখি। তুমি বাইবেলের বিষয়ে কি মনে কর?

আমি—বাইবেলেও অনেক ভাল কথা আছে। বাইবেল পড়িয়াও সুখ পাই।

মিশনারি—তুমি এই-সকল গ্রন্থের সঙ্গে বাইবেলকেও এক জায়গায় দাঁড় করাইলে, এটা ভাল নয়। বাইবেল অভ্রান্ত ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থ, ইহাতে যে-সকল উপদেশ আছে, তাহা অপর কোনও গ্রন্থে নাই।

আমি—আচ্ছা আপনি বাইবেলের এমন কোনও উপদেশ উল্লেখ করুন, যার সদৃশ উপদেশ আপনার বিবেচনায় অন্য কোনও গ্রন্থে নাই।

মিশনারি—Do unto others as you would that they should do unto you.

সৌভাগ্যক্রমে এই উপদেশের অনুরূপ দুইটী উপদেশ আমি কিছুদিন পূর্ব্বে *Talmud ও Confucius, এই উভয়গ্রন্থেই পড়িয়াছিলাম। আমি দুইখানি গ্রন্থ আনিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। বলিলাম দেখুন কংফুচের অনুবাদক ডাক্তার লেজ আপনাদেরই একজন মিশনারি। তাঁহারই উক্তিতে প্রমাণ কংফুচ যীশু জন্মিবার প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। একজন শিষ্য কংফুচকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "গুরো, সকল উপদেশের সার কি?" তদুত্তরে কংফুচ বলিতেছেন, সকল উপদেশের শ্রেষ্ঠ উপদেশ এই—"তোমার প্রতি অপরের যে ব্যবহার তুমি পছন্দ কর না তাহা অপরের প্রতি করিয়ো না।" ইহা ত প্রকারান্তরে ঐ একই কথা! ইহার অনুবাদক একজন খ্রীষ্টীয় মিশনারি। বলুন তবে বাইবেলের অলৌকিকতা কোথায় রহিল? আপনি কি বলেন? সত্যের প্রবর্ত্তক কে? ঈশ্বরই ত সত্যের প্রবর্ত্তক। তবেই ত প্রমাণ হইতেছে যে তিনি দেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে আধ্যাত্মিক সত্যসকল অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

আমার যতদূর স্মরণ হয়, তিনি মৌনী হইয়া থাকিলেন। কিন্তু আর একটী মিশনারি ভদ্রলোক বলিলেন, "কথাটা কি জান? দুষ্ট সয়তান অনেকসময় ধর্ম্মের মুখস্ পরিয়া মানুষকে বিপথে লইয়া যায়। অনেক উচ্চকথা মানুষের গোচর করিয়া পথভ্রান্ত করে। সুতরাং সয়তানও

সত্য অভিব্যক্ত করে। সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই খ্রীষ্টের অভ্যুদয়।"

শুনিয়া আমি বলিলাম,—"আমি আপনার কাছে হার মানিলাম।" ভাবিলাম ইহাদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা। তখনকার আর-একটী কথা স্মরণ হইতেছে তাহা যথাস্থানে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ইংলণ্ডে যাইবার সময় সিংহল হইতে কয়েকজন খ্রীষ্টীয় মিশনরি আমাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন তাহা অগ্রেই লিখিয়াছি। ইঁহারা পথিমধ্যে প্রতি রবিবার আরোহীদিগকে লইয়া জাহাজের এক পার্শ্বে গির্জ্জা করিতেন। আমি তাঁহাদের উপাসনাতে যাইতাম। দুই তিনবার যাওয়ার পর একজন মিশনারি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদের উপাসনাদি তোমার কেমন লাগিতেছে?

আমি—ভালই লাগিতেছে। কেবল একটা চিন্তা বারবার আমার মনে উদয় হয়।

মিশনারি—সেটা কি?

আমি—আপনারা উপদেশে প্রায় প্রতিবার বলেন যে মনুষ্যের পাপে জন্ম, মনুষ্যের প্রকৃতি পাপপ্রবণ, সভ্যতার যতই উন্নতি হইতেছে, ততই মানুষ ঘন হইতে ঘনতর পাপে নিমগ্ন হইতেছে। অথচ ইহাও বলেন যে অবশেষে মানুষ ঈশ্বরচরণে আসিবে। ইহা কিরূপ? যদি মানুষ দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর পাপেই ডুবিল, তবে আবার পূর্ণ উন্নতি পূর্ণ সুখ পাইবে কিরূপে?

মিশনারি—তা বুঝি জান না? প্রভু যীশু যখন আবার আসিবেন, তখন সয়তানকে ধরিয়া এক অন্ধকার গহ্বরে বন্ধ করিয়া ফেলিবেন; মানুষকে প্রলুব্ধ করিবার কেহ থাকিবে না, সুতরাং মানুষ নিষ্পাপ হইবে।

এই উত্তর শুনিয়াও আমি হাঁ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম।

ইংলণ্ডবাস কালে একদিন সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড ষ্টপফোর্ড ব্রুকের নিকট এইরূপ কথার প্রসঙ্গ হওয়াতে তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—ইহা তোমাদের পুরাণ।

এই সমুদ্রযাত্রা কালের আর-একটা বিষয় স্মরণ আছে। আমরা যখন সিংহলের রাজধানী কলম্বো সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন শুনিলাম ব্রিষ্টল অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ্জ মূলার দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময়ে সেখানে আসিয়া এক হোটেলে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহা শুনিয়াই তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি সেই হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সেই কয়েক মিনিট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমি তৎপূর্ব্বে তাঁহার প্রণীত "The Lord's Dealings with George Muller" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি এবং তৎদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তিনি শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি সকল বিষয়েই প্রার্থনা করেন।" তিনি বলিলেন, "আমার একটা চাবি হারাইয়া গেলেও আমি তাহা পাইবার জন্য ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি। জীবনের এমন কোন বিভাগ নাই,—কার্য্য নাই—যাহার জন্য সেই মুক্তিদাতা বিধাতার শরণাপন্ন হই না।"

আমি আর-একজন সাধুপুরুষের এই চাবি হারাইলে প্রার্থনার কথা শুনিয়াছি। তিনি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় কালীনারায়ণ গুপ্ত। এই সাধুপুরুষের পরিবার-পরিজনের মুখে শুনিয়াছি, জীবনের এমন কোন কার্য্য ঘটিত না যাহাতে তাঁহাকে "ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম" শব্দ উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বর স্মরণ করিতে ও তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে দেখা যাইত না। সন্তানগণ এমনও দেখিয়াছেন যে পিতার চাবি হারাইয়া গিয়াছে, তিনি চাবি খুঁজিতেছেন, কিন্তু মুখে "ওঁ ব্রহ্ম,

ওঁ ব্রহ্ম" ঈশ্বর স্মরণ করিতেছেন। ভক্ত মানুষের কার্য্যই স্বতন্ত্র। প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততার বিষয়ে বিচার তাঁহাদের নাই। সকল বিষয়ে সর্ব্বাবস্থাতে প্রার্থনা তাঁহাদের প্রাণে লাগিয়াই আছে! সাধু জর্জ্জ মূলারের মুখে সেই অকৃত্রিম ভক্তির লক্ষণ সুস্পষ্ট দেখিলাম। ঐরূপ মানুষকে জীবনে একবার দেখাও পরম লাভ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি ক্রমে আসিয়া দেশে পৌঁছিলাম। পৌঁছিয়া আবার ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। অপরাপর কার্য্যের মধ্যে ইন্দোরের প্রথম প্রচারকার্য্য স্মরণ আছে। আমার বন্ধু নবীনচন্দ্র রায় তখন কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া খাণ্ডোয়াতে বাস করিতেছিলেন, সেখান হইতে তিনি রট্‌লামে এক কর্ম্ম পান। আমি খাণ্ডোয়া ও রট্‌লাম হইয়া ইন্দোরে গমন করি। সেখানে কতকগুলি উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। ইন্দোরে আমি রাজ-অতিথিরূপে রাজার অতিথিশালাতে আশ্রয় পাই। আমার পরিচর্য্যার জন্য চাকর-বাকর এবং যাতায়াতের জন্য গাড়ি নিযুক্ত হয়। ক্রমে আমি কার্য্য আরম্ভ করি। ইন্দোরে যেখানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজপ্রতিনিধি (Resident) থাকেন তাহা রেসিডেন্সী বিভাগ বলিয়া খ্যাত। এই রেসিডেন্সী বিভাগে অনেক ভদ্রলোকের বাস। আমার ব্রাহ্মবন্ধুগণ আমাকে রেসিডেন্সী বিভাগে একটী বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে আমি বক্তৃতা করিতে রাজি হই। তাঁহারা রেসিডেন্সী বিভাগে একটী হল স্থির করিয়া আমার বক্তৃতার বিজ্ঞাপন বাহির করেন। ঐ মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের এক খণ্ড রেসিডেণ্ট সাহেবের হস্তে পতিত হয়। কে তখন রেসিডেণ্ট ছিলেন, ভাল মনে নাই, বোধ হয় সার লেপেল গ্রিফিন; তিনি বিজ্ঞাপন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ শিবনাথ শাস্ত্রী কে ?" উত্তরে শুনিলেন যে একজন বাঙ্গালি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক। তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বাঙ্গালিরা কেন এখানে আসে ? এ বক্তৃতা এখানে হইতে পারিবে না।" অগত্যা তাড়া-

তাড়ি রাজার অধিকার-মধ্যে একটী স্কুলগৃহ স্থির করিয়া সেখানে বক্তৃতা করা হইল। তৎপরে আমি ও আমার সঙ্গী বন্ধু লছমনপ্রসাদ মহারাজা হোল্‌কারের সহিত সাক্ষাৎ করি। যতদূর স্মরণ হয়, তিনি দিন ক্ষণ দেখিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং কাল পোষাক পরিয়া গেলে পছন্দ করিতেন না বলিয়া আমাদিগকে সাদা কোট পরিয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনি আমাদের প্রতি যথেষ্ট সদ্ভাব প্রকাশ করিলেন। আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ঋণশোধের সাহায্যার্থে ৪০০ শত টাকা এবং আমার ও লছমনের যাতায়াতের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কিছু কিছু টাকা দিলেন। মহারাজা ব্রাহ্মসমাজের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "যব মৈনে শুনা আপ্‌লোগোঁকো বীচ্‌মে ঝগ্‌ড়া হুয়া তব মেরে দিল ফাট গিয়া।" অর্থাৎ যখন আমি শুন্‌লাম যে আপনাদের মধ্যে বিবাদ ঘটেছে তখন আমার বুক ফেটে গেল। রাজার কথাগুলি এখনও আমার কর্ণে বাজিতেছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, দুই এক বৎসর পরে আবার ইন্দোরে গিয়া শুনি যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি রাজার মন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার রাজ্যমধ্যে কোনও সভাসমিতি হইতে দিবেন না বলিয়াছেন। শুনিলাম, রাজার ক্রোধ দেখিয়া আর্য্যসমাজ প্রভৃতি অনেক সভার মীটিং বন্ধ হইয়াছে। কেবল ব্রাহ্মেরা তাঁহার বিরক্তি গ্রাহ্য না করিয়া উপাসনার্থ তাঁহাদের মন্দিরে নিয়মমত মিলিত হইতেছেন। ইহাতে নাকি হোল্‌কার ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে তাঁহার ভবনে ডাকিয়া বলিয়াছেন যে তিনি তাহাদের মন্দির ভাঙ্গিয়া দিবেন। এক সময়ে তিনি ঐ মন্দির নির্ম্মাণার্থ কয়েক সহস্র টাকা দিয়াছিলেন, এখন ঐ মন্দির ভাঙ্গিতে প্রস্তুত! আমি শুনিয়া ভাবিলাম দেশীয় রাজার রাজ্যে বাস করাও বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থা। সেবারে আর-এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে রাজার ব্রাহ্মদিগের প্রতি ঐ

বিদ্বেষবুদ্ধি আরও প্রকাশিত হইল। সেটা দশহরার সময়। এই দশহরার সময় ইন্দোরাধিপতি পাত্রমিত্রসহ হস্তী আরোহণে সসৈন্যে বাহির হইয়া থাকেন। বহুকাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই দশহরা যাত্রার দিন আমি আমার বন্ধু সদাশিব পাণ্ডুরঙ্গ কেল্‌কারের সহিত যাত্রা দেখিতে গেলাম। রাজপথের উপর বিপুল জনতা হওয়াতে আমরা রাজপথ হইতে নামিয়া মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম; সেখানে ভিড় ছিল না। তৎপরদিন হোল্‌কার মহারাজার পুত্রের শিক্ষক আমাদিগকে বলিলেন, যে, মহারাজা হোল্‌কার তাঁহাকে বলিয়াছেন, "আমি অমুক মাঠে কেল্‌কারের পার্শ্বে যেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে দেখিলাম, তিনি কি এখানে আসিয়াছেন?"

উত্তর—আজ্ঞে হাঁ, এখানকার ব্রাহ্মসমাজের উৎসব চলিতেছে; সেইজন্য তিনি আসিয়াছেন।

হোল্‌কার—আমি পছন্দ করি না যে এইসব মানুষ আমার রাজ্যে আসে।

উত্তর—আজ্ঞে তিনি দুই এক দিনের মধ্যেই চলিয়া যাইবেন।

পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই মহারাজকে পদচ্যুত করিয়া বন্দিদশায় রাখিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্রকে তাঁহার পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। রাজার অব্যবস্থিতচিত্ততা ও অতিরিক্ত প্রভুত্বপ্রিয়তা বোধ হয় তাহার কারণ।

ইহার পরে একটী শোচনীয় ঘটনা ঘটে। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু নবীনচন্দ্র রায়, কলিকাতাতে একটী বাসভবন নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিবার জন্য আমার ভবনে আসিয়া বাস করেন। ঐ কার্য্যের তত্বাবধানের জন্য তাঁহাকে গুরুতর শ্রম করিতে হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহার চিরদিন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাসের অভ্যাস ছিল, তাঁহার আহারাদির নিয়ম স্বতন্ত্র ছিল, তাহা আমাদের ভবনের নারীগণ জানিতেন না, নবীন বাবুও স্বাভাবিক হ্রীশীলতা-

বশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু বলিতেন না। এতদ্ভিন্ন বোধ হয় তাঁহার অপর কোনও উদ্বেগের কারণও ছিল। যাহা হউক তিনি আমার ভবনে গুরুতর রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তখন খাওয়া হইতে তাঁহার পরিজনদিগকে আনা হয় এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে নবনির্ম্মিত ভবনে স্থানান্তরিত করিয়া চিকিৎসা করা যায়। এই রোগ-শয্যাতে সেই সাধুপুরুষের যে ভাব দেখিয়াছিলাম, তাহা চিরদিন মনে মুদ্রিত রহিয়াছে। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এযাত্রা আর বাঁচিবেন না তখন প্রথম প্রথম দেখা গেল যে তাঁহার পত্নী নিকটে গিয়া বসিলেই তাঁহার মন আবেগে পূর্ণ হইয়া উঠে ও চক্ষে জলধারা পড়ে। বোধ হয় ভাবেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীকে কে দেখিবে। দুই তিন দিন পরে সেভাব চলিয়া গেল। চিত্ত ও মুখ প্রশান্তভাব ধারণ করিল। তখন পত্নী নিকটে গিয়া কাঁদিলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমার দিকে দেখাইয়া দিতেন, এবং আর সংসারের কথা শুনাইতে বারণ করিতেন। এই অবস্থায় একদিন একজন ব্রাহ্ম যুবক আসিয়া বলিলেন, আপনাকে একটী গান শুনাইতে চাই; কোন্ গানটী করিব? নবীনচন্দ্র বলিলেন, "ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম" এই গানটী করুন। সে গানটি এই—

"ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম
অপূর্ব্ব শোভন, ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোকতাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন,
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষিমুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত লোচন কি অমৃত রসপানে ভুলিল চরাচর।
কি সুধাময় গান, গাইছে সুরগণ, বিমল বিভুগুণ-বন্দনা,
কোটি-চন্দ্র-তারা উলসিত নৃত্য করিছে অবিরাম।"

এই সংগীত যখন হইতে লাগিল তখন দর-দর ধারে নবীন বাবুর চক্ষে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পূর্ণ হইল। আমরা কি দেখিলাম!

নবীনচন্দ্রে এমন কিছু ছিল, যাহা দেখিয়া স্বদেশী বিদেশী সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইত। শুনিয়াছি এই বিবরণ যখন কাগজে বাহির হইল, তখন তাহা দেখিয়া খাণ্ডোয়ার ডেপুটী কমিশনার সাহেব নাকি বলিয়াছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি নবীনচন্দ্র স্বচক্ষে স্বর্গধাম দেখিয়াছিলেন।"

যাহা হউক ইহার পর যে দুই দিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, সে দুই দিন স্বীয় পত্নীকে কেবল সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পত্নীকে বলিলেন—"মহব্বতসে মিল্‌কর হামেসা ইহাঁ রহনা" অর্থাৎ প্রেমে মিলিত হইয়া চিরদিন ইহাঁদের কাছে থাকিও। এই তাঁর স্ত্রীর প্রতি শেষ উপদেশ। ইহাঁর শেষ শ্বাস যখন যায়, তখন আমরা ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম, দেখিলাম তিনি হাত দুইখানি জুড়িয়া বক্ষের উপরে লইলেন, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে করিতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরিবার-পরিজনকে দেখিবার ভার আমার উপর দিয়া গেলেন।

নবীনচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পরেই আমি একবার ধর্ম্মপ্রচারার্থ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে গমন করি। এবার রেলযোগে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী দিয়া গমন করি। এই যাত্রাতেই বোধ হয় কয়েকদিন পুনা নগরে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে মহাশয়ের ভবনে অতিথি হই। রাণাডে মহাশয়ের দৈনিক জীবন দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি বোধ হয় তখন পুনার স্মল কজ কোর্টের জজ। এরূপ পদস্থ একজন বাঙ্গালি ভদ্রলোক হইলে তাঁহার ভবনে কি বাহ্য বিলাসের প্রাদুর্ভাব দেখিতাম!

গাড়ি, পোষাক, পরিচ্ছদ, দাস দাসীর ধূম দেখিতাম। কিন্তু রাণাডের ভবনে তাহার কিছুই দেখিলাম না। তিনি কোর্ট হইতে আসিয়াই রাজকীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার মারহাটি লালপেড়ে ধুতি, বেনিয়ান ও লালপেড়ে চাদর ও চটি পরিয়া আমার সহিত বহির্ভ্রমণে বাহির হইতেন। ফিরিয়া আসিয়া একটী কাঠের দোলার উপরে বসিতেন, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি সংবাদপত্র সকল লইয়া মাটিতেই বসিতেন, বসিয়া এক এক খানি কাগজ লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন, এক এক প্যারাগ্রাফের দুই পংক্তি পড়িলেই রাণাডে মহাশয় আর পড়িতে হইবে কি না জানাইতেন; তৎপরে আবশ্যক হইলে আরও পড়া হইত, নতুবা সে প্যারা ত্যাগ করা হইত। পড়িতে পড়িতে কোন্ কাগজে কি টেলিগ্রাম করিতে বা পত্র লিখিতে হইবে, তাহা মুখে মুখে লেখাইয়া দেওয়া হইত। এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা যাইত, তৎপরে আহারার্থ যাওয়া হইত। প্রাতে রাণাডে গুরুতর বিষয়-সকল পাঠ করিতেন ও সে বিষয় চিন্তা করিতেন। এইরূপে নিঃশব্দে চিন্তা ও কার্য্যের স্রোত প্রবাহিত থাকিত, দেখিয়া হৃদয়-মনের বিশেষ উপকার হইত।

এই যাত্রাতেই বোধহয় আমি বাঙ্গালোর হইয়া প্রথমে পশ্চিম মালাবার উপকূলস্থিত কালিকট নগরে যাই। কালিকটে গিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। সেখানে প্রবাদ যে মালাবার উপকূলে স্বয়ং পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগের রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে নাম্বুরীসম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণগণের অসীম প্রভুত্ব। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের নাম নায়র। নায়রগণ বোধহয় আদিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত এদেশ জয় করিতে আসিয়াছিলেন। নায়রগণের বীরত্বের অনেক কথা শুনিলাম। সেখানে কতকগুলি প্রথা দেখিলাম যাহা অতীব বিস্ময়জনক। প্রথম দেখিলাম ব্রাহ্মণ বা গুরুজন-

দিগকে দেখিলে নায়র বা শূদ্র স্ত্রীলোকদিগকে বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিতে হয়। শুনিলাম তাহা ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদিগের প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশের চিহ্ন! এ সম্বন্ধে একটী গল্প শুনিলাম। একবার টিপু সুলতান নাকি উপহাসচ্ছলে একজন নায়র পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "নায়র যুবতীদের বক্ষঃস্থল অনাবৃত কেন? লোকে ত অপমান করিতে পারে।" তদুত্তরে নায়র পুরুষ বলিলেন, "নায়রদের স্ত্রীগণের বক্ষঃ অনাবৃত, পুরুষদের তরবারিও অনাবৃত।" নায়রদিগের বীরত্ব-খ্যাতি আছে।

দ্বিতীয় সামাজিক নিয়ম যাহা দেখিলাম তাহা একটী ঘটনাদ্বারা প্রকাশ করিতেছি। একদিন অপরাহ্নে একজন ব্রাহ্মণ বন্ধুর সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছি; পথিমধ্যে দেখিলাম, একজন নিম্নশ্রেণীর লোক আসিতে আসিতে দশ বার হাত দূরে দাঁড়াইয়া গেল এবং কি বলিল। আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, ও আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে, এইজন্য দাঁড়াইয়া আমাকে সতর্ক করিতেছে যেন উহার বাতাস বা ছায়া আমার গায়ে না লাগে; ইহাই আমাদের সামাজিক প্রথা। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে পথে ব্রাহ্মণ দেখিলে ঐরূপ করিতে হয়। আমি এরূপ সামাজিক শাসন আর্য্যাবর্ত্তে কখনও দেখি নাই; দেখিয়া দাক্ষিণাত্যে জাতিভেদ প্রথা যে কতদূর গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম।

তাহার পর যাহা শুনিলাম, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। তাহা এই। শুনিলাম নায়র ও শূদ্র বালিকাদের বিবাহ নাই। বিবাহের বয়স হইলে স্বজাতীয় একটী বালকের সঙ্গে একদিন নামমাত্র বিবাহ হয়, একটা খাওয়া-দাওয়া হয়, কিন্তু তাহা বিবাহ বলিলে যাহা মনে হয় তাহা নহে, বিবাহের পরদিন হইতে তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ রহিত হয়। তৎপর কন্যা মাতৃভবনেই থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আত্মীয় স্বজন একজন ব্রাহ্মণ যুবককে আনিয়া তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দেন, এবং সেই ব্যক্তিই

প্রকৃত পতি হইয়া দাঁড়ায়। রমণী মনে করিলে তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। কিন্তু সে ব্যক্তি কার্য্যতঃ পতি হইলেও সন্তানদিগের সম্বন্ধে তাহার কোনও দায়িত্ব থাকে না। সে দায়িত্ব তাহাদের মাতুলের উপর থাকে, তাহারা মাতুলেরই ধনের অধিকারী হয়। ইহাকে ইংরাজীতে nepotism বলে।

একদিকে যেমন এই নিয়ম, অপরদিকে নাম্বুরী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আর-এক অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম পুত্র বংশরক্ষার জন্য বিবাহ করে, অপর পুত্রেরা বিবাহ না করিয়া নায়র ও শূদ্রজাতীয় স্ত্রীদিগের সহিত এবং আবশ্যক হইলে একাধিক শূদ্র রমণীর সহিত সংগত হইবার জন্য থাকে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে অনেক ব্রাহ্মণকন্যাকে পতি অভাবে চিরকৌমার্য্য ধারণ করিতে হয়। নায়র নারীদিগের সহিত নাম্বুরী ব্রাহ্মণদিগের মিলিত হওয়া সেদেশে এরূপ স্বাভাবিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে একজন নায়র ভদ্রলোক একদিন আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমার এই দেহে ব্রাহ্মণের রক্ত আছে।

কালিকট হইতে ফিরিয়া আমি মান্দ্রাজে গমন করি। দ্বিতীয়বার কোকনদাতে যাই। সেখানে গিয়া গুরুতর পীড়াতে আক্রান্ত হই। পরে শুনিয়াছি তাহা টাইফয়েড জ্বর। জ্বরের সহিত রক্তদাস্ত ও মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। কোকনদার বন্ধুগণ প্রথমে আমার জন্য একটা বাড়ী স্থির করিয়া সেই বাড়ীতে আমাকে রাখিয়াছিলেন। অপর একস্থান হইতে দুইবেলা আমার খাবার পাঠাইয়া দিতেন। পীড়া যখন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল তখন তাঁহারা বড়ই চিন্তিত হইলেন। এই সময়ে একজন বাঙ্গালি খ্রীষ্টান কোকনদা স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন এবং সপরিবারে স্কুল-ভবনে বাস করিতেন। অবশেষে তিনি

দয়া করিয়া আমাকে স্কুলভবনে লইয়া গেলেন এবং চিকিৎসা করাইতে আরম্ভ করিলেন। আমার শুশ্রূষার ভার ব্রাহ্মসমাজানুরাগী কতিপয় ব্রাহ্ম যুবকের প্রতি ছিল। কিন্তু তাঁহারা তখনও হিন্দুসমাজসংসৃষ্ট আছেন; তাঁহারা সমাজভয়ে আমাকে খাওয়ান ধোয়ান প্রভৃতি কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেন না, সেজন্য একজন মেথরজাতীয় স্ত্রীলোক রাখা হইয়াছিল। সে খোঁড়া ও দুর্ব্বল, সে আমাকে তুলিয়া পায়খানায় লইবার সময় প্রায় ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিত। একদিন তার কঠিন হস্তে বন্দী হইয়া টলিতে টলিতে আমি বলিয়া উঠিলাম, "I see my career is going to end in the arms of a sweeper woman" অর্থাৎ "একজন মেথরানীর বাহুপাশেই বা আমার জীবন শেষ হয়।"

যেই এই কথা বলা অমনি দেখি একজন ব্রাহ্মণ যুবক আপনার গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া, পৈতা কোমরে গুঁজিয়া বলিল, "লোকে যা করে কর্‌বে, আপনাকে এরূপ লাঞ্ছিত হতে কখনই দেব না।" এই বলিয়া সেই মেথরানীকে সরাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বুকে করিয়া ধরিল এবং তদবধি পুত্রাধিক যত্নে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহার প্রেম আমি কখনই ভুলিব না।

এই পীড়ার সময়ের তিনটী বিষয় আমার স্মৃতিতে রহিয়াছে। প্রথম, আমার শারীরিক ধাতুর দুর্ব্বলতা এত অধিক হইয়াছিল যে পড়িয়া পড়িয়া আমার মনে হইত যেন কে আমার সমগ্র শরীরের উপর দিয়া একখানা সীসা বা ইস্‌পাতের পাত বুলাইতেছে! দ্বিতীয় বিষয়টি অতি আশ্চর্য্য। আমি দারুণ মাথার যন্ত্রণায় অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় অচেতনপ্রায় আছি, হঠাৎ ঘণ্টার শব্দের ন্যায় কি শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমার বোধ হইল যেন ঘণ্টার শব্দটী এখন আমার নিকটস্থ হইতেছে, সে দিকে মনোনিবেশ করিবামাত্র যেন বহু বহু লোকের সম্মিলিত

সংগীতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে সর্ব্বদা ইংরাজীতে কথা কহিতাম, সুতরাং ইংরাজীতে বলিলাম, "Where is that noise from?" অমনি এক নারীর স্বর শুনিলাম (আমি মনে করিলাম, তিনি ঘণ্টা বাজাইতেছিলেন)। তিনি বলিলেন, That's the anthem of the immortals, অর্থাৎ উহা অমরদিগের বন্দনাধ্বনি।

আমি—In what language is it ? অর্থাৎ কোন্ ভাষাতে ঐ সংগীত হইতেছে।

নারী—Have the immortals any language. Those are thoughts.—অর্থাৎ অমরদিগের কি ভাষা আছে ? ও-সকল চিন্তা।

আমি—But I notice a tune—অর্থাৎ, কিন্তু আমি যেন কি একটা সুর লক্ষ্য করিতেছি।

নারী—That's the tune of the universe, harmony.—অর্থাৎ উহা এই ব্রহ্মাণ্ডের সুর, উহার নাম মহাযোগ।

ইহা শুনিয়া আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, অমরগণের চিন্তা মহাযোগে এক হইয়া উঠিতেছে। তৎপরে প্রশ্ন করি, আর সে নারীকণ্ঠের উত্তর নাই। তখন আমি ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় হাসিতে হাসিতে আসিতেছেন। এরূপ মৃতব্যক্তির স্বপ্ন আমি প্রায় দেখি না। কেন জানি না আমার পরমাত্মীয়দিগকেও স্বপ্নে দেখি না। কিন্তু এবারে আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে দেখিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ পৃথিবীতে থাক্‌তে কত ভুল করা যায়, পরস্পরকে চিন্‌তে পারা যায় না। যা হোক্ তুমি এস তোমাকে রামমোহন রায়ের কাছে নিয়ে যাই।" আমি যেমন উঠিব, অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চেতনা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় তৎপরে দুই তিন দিন জাগ্রত অবস্থাতেও সেই মহারোল ও অমরদিগের গাথা শুনিতে লাগিলাম।

তৃতীয় ঘটনাটীও আশ্চর্য্য, ইহা পরে শুনিয়াছি। আমি যখন কোকনদাতে শয্যায় পড়িয়া মা, মা করিয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম, তখন না কি আমার মাতাঠাকুরাণী গ্রামের বাড়ীতে পিতাঠাকুর মহাশয়কে অস্থির করিয়া তুলিলেন, "তুমি কল্‌কাতাতে যাও ও তার খবর আন; আমার মন কেন অস্থির হচ্চে।" বাবা রাগ করিয়া সহরে আসিলেন; আসিয়া গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের নিকট গিয়া শুনিলেন, আমার গুরুতর পীড়া।

যাহা হউক, আমার গুরুতর পীড়ার কথা শুনিয়া কলিকাতার বন্ধুগণ, আমার বর্ত্তমান জামাতা বিপিনবিহারী সরকার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শশীভূষণ বসু, আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজ-মোহিনী ও আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা এই চারিজনকে কোকনদাতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা গিয়া চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা দ্বারা আমাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। আমি ক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে কলিকাতায় আসিলাম।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আসিয়া যে যে কাজে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার মধ্যে চারিটা স্মরণীয়। প্রথম, আসার কিছুদিন পরে ইংলণ্ডে মিষ্টার ভয়সীর চর্চ্চের একজন সভ্য মিষ্টার ব্লেকার (যিনি কেল্‌নার কোম্পানির অধীনে কোনও কর্ম্ম করিতেন) নামে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া স্থির হইল যে কলিকাতাতে ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী একেশ্বরবাদীদিগের জন্য একটী উপাসক মণ্ডলী স্থাপন করা হইবে; এবং উপাসনার ভার আমার প্রতি থাকিবে। তদনুসারে মিষ্টার ব্লেকার টাকা তুলিয়া লালদীঘির দক্ষিণবর্ত্তী ড্যালহৌসী ইনষ্টিটিউট রবিবার প্রাতের জন্য ভাড়া লইয়া উপাসনার বন্দোবস্ত করিলেন। আমি আচার্য্যের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি মিষ্টার ভয়সীর প্রকাশিত ও তাঁহার লণ্ডনস্থ উপাসনামন্দিরে ব্যবহৃত প্রার্থনাপুস্তক হইতে আরাধনা প্রার্থনা প্রভৃতি পাঠ করিতাম এবং একটা উপদেশ লিখিয়া পড়িতাম। এ উপদেশের অনেকগুলি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার নামক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। মিষ্টার ব্লেকারের উপাসকমণ্ডলী ক্রমে ড্যালহৌসী ইনষ্টিটিউট হইতে অনেক স্থানে ভদ্রলোকের বাড়ীতে বাড়ীতে উঠিয়া যায়, এবং কয়েক বৎসর নিয়ম-মত তাহার কার্য্য চলে। অবশেষে মিষ্টার ব্লেকার কার্য্যগতিকে স্থানান্তরিত হওয়াতে তাহা উঠিয়া যায়। উপাসকমণ্ডলী চালাইয়া দেখিতে পাইলাম যে প্রধানতঃ যাহাদের জন্য তাহা স্থাপন করা হইয়াছিল, তাঁহারা বড় আসিতেন না। অল্পই ইংরাজ বা ফিরিঙ্গী আসিতেন। প্রধানতঃ বিলাতফেরত লোকেরাই যোগ দিতেন। যাহা হউক, তাহাও রহিল না।

দ্বিতীয় কার্য্য ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয় স্থাপন। অগ্রেই বলিয়াছি যে আমি ইংলণ্ডে বাসকালে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল দেখিয়াছিলাম, এবং শিক্ষাবিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থও কিনিয়া আনিয়াছিলাম। সেইগুলি পাঠ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন চিন্তা আমার মনে উদয় হয়। এজাতীয় চিন্তা বহুদিন হইতে আমার মনে ছিল। আমি যখন বি-এ ক্লাসে পড়ি, তখন একটী বিশেষ ঘটনাতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় নূতন চিন্তা আমার মনে প্রবেশ করে। সে ঘটনাটী এই। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ীতে গেলে বাবা আমাকে প্রতিনিধি দিয়া তাঁহার শিক্ষকতা-কার্য্য হইতে কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। একদিন আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াইতেছি এমন সময় সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর পণ্ডিত মহাশয় একটী চারি কি পাঁচ বৎসরের বালককে লইয়া ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়া বলিলেন—"মহাশয়! এই ছেলেটীকে পড় বলিলেই কাঁদে; কি করি?"

আর বাস্তবিক দেখিলাম, ছেলেটীর দুই চক্ষে দুইটী অশ্রুধারা পড়িয়া পেটের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তার চিহ্ন রহিয়াছে। আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল; বলিলাম, "পড় বল্লেই কাঁদে, আচ্ছা ওকে আমার নিকট দিয়া যান, আমি দেখি।" তিনি ছেলেটীকে আমার নিকট দিয়া গেলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি আমার হাত ধরে আমার সঙ্গে বেড়াও ত। সে আমার হাত ধরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমার যখন মনে হইল যে বেড়াইতে বেড়াইতে সে ভয়ভাঙ্গা হইয়াছে, তখন তাহাকে তুলিয়া বেঞ্চের উপরে বসাইলাম। বসাইয়া নিজের অঙ্গুলি দিয়া তার পেট টিপিতে লাগিলাম। সে হাসিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বল ত, কি দিয়ে ভাত খেয়েছ। তখন সে ভাত, ডাল, চড়চড়ি প্রভৃতি তর্‌কারির উল্লেখ করিতে লাগিল। কিন্তু মাছের নাম করিল

না। আমি মনে করিলাম, খুব সম্ভবতঃ মাছ খাইয়াছে, কেবল নাম করিতে ভুলিয়া যাইতেছে। আমি বলিলাম, "তুমি আর-একটা জিনিস খেয়েছ, আমাকে বল্‌ছ না কেন? তুমি মাছ খেয়েছ।" তখন তার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। সে মনে করিল আমি পেটের বাহিরে অঙ্গুলি দিয়া মাছ খাওয়া ধরিলাম কিরূপে? সে হাসিয়া বলিল, "তুমি জান্‌লে কি করে?" আমি বলিলাম—"আঁ খোকা, আমি পেটে আঙ্গুল দিয়ে মাছ খাওয়া ধর্‌তে পারি, তা বুঝি জান্‌তে না?"

এইরূপে যখন দেখিলাম সে একেবারে ভয়ভাঙ্গা হইয়াছে, তখন তার বই খানা খুলিয়া তার সমুখে রাখিয়া বলিলাম—"দেখ তুমি খারাপ ছেলে আর আমি ভাল ছেলে।" সে জিজ্ঞাসা করিল "কেন?" আমি উত্তর করিলাম, "আমি পড়্‌তে পারি, তুমি পড়্‌তে পার না, এই দেখ আমি পড়ি।" এই বলিয়া "ক" "খ" "গ" "ঘ" করিয়া পড়িয়া চলিলাম। সে আমাকে পড়িতে দেয় না, বলিল আমিও পড়িতে পারি। আমি বলিলাম —"আচ্ছা পড়।" তখন সে জোরে জোরে "ক" "খ" "গ" "ঘ" করিয়া পড়িয়া চলিল। অবশেষে আমি তাহাকে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে তাহার ক্লাসে লইয়া গেলাম। গিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, "দেখুন, আপনি বল্‌ছিলেন, ও পড় বল্‌লেই কাঁদে, কিন্তু আমার কাছে ত বেশ পড়িল।" চাহিয়া দেখি পণ্ডিত মহাশয়ের পার্শ্বে একগাছি চেটাল বাঁকারি রহিয়াছে. কোনও ছেলে না পড়িলে বা অবাধ্য হইলে তাহার পৃষ্ঠে বা তাহাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া তাহার পেটে ঐ বাঁকারি পড়ে। আমি বলিলাম, "ও বাঁকারি দেখিলে ওর বাবা হয়ত কাঁদে, ও ত কাঁদ্‌বেই। ও বাঁকারি আপনাকে ফেলে দিতে হবে।" তিনি বলিলেন, "তাহলে আর পড়াশোনা হবে না।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা দেখুন আপনার সম্মুখেই আমি পড়াই।" এই বলিয়া স্কুলের চাকরকে বলিলাম,—"একটা বড় মাদুর

পেতে দে, আমাদের একটা খেলা হবে।” অমনি ক্লাসসুদ্ধ ছেলে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল, “দেখুন, কি খেলা হবে?”

আমি—রোসো না, দেখবে এখন, খুব মজার খেলা হবে।

তারপর মাদুর পাতা হইলে সেই মাদুরে ছেলেদিগকে লইয়া বসিলাম। প্রথমে তাহাদেরই সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটা নিয়ম করিয়া লইলাম যে খেলার মধ্যে যে দুষ্টামি বা গোল করিবে তাহাকে খেলা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। শেষে খেলা আরম্ভ হইল। আমি শ্লেটে লুকাইয়া লুকাইয়া একটা ঘোড়া আঁকিলাম। তাহার জিভ বাহির হইয়া আছে। শেষে তাহার জিভে “ক”, লেজের আগায় “খ”, পায়ের খুরে “গ”, এইরূপে বর্ণমালার অক্ষরগুলি লিখিলাম। শেষে সেই ঘোড়া যখন সকলের সম্মুখে বাহির করিলাম, তখন মহা হাস্যের রোল উঠিল। যাহাদের কিছু কিছু অক্ষর পরিচয় হইয়াছিল, তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল “ঘোড়ার জিভে ক, ল্যাজে খ” ইত্যাদি। আর যাহাদের বর্ণপরিচয় হয় নাই তাহারা ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “কই ভাই দেখি কেমন জিভে ক” ইত্যাদি। দেখিতে দেখিতে তাহাদের বর্ণপরিচয় হইতে লাগিল! তৎপরদিন যেই স্কুলে প্রবেশ করিয়াছি, অমনি সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর ছেলেরা আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বলিতে লাগিল, “পণ্ডিত মশাই, তুমি আমাদের ক্লাসে এস, আমাদের সঙ্গে খেলা কর্‌বে।”

এই ঘটনাটা আমার চিরদিন মনে রহিয়াছে। পরে হরিনাভিতে ও ভবানীপুরে যখন হেডমাষ্টারি করিয়াছি, তখন নিম্নশ্রেণীর মাষ্টারদিগকে ছেলেদিগকে ভুলাইয়া পড়াইবার উপদেশ দিয়াছি। ইংলণ্ডে গিয়া কিণ্ডারগার্টেন স্কুল দেখিয়া ঐসকল ভাব আমার মনে আরও প্রবল হয়। কোকনদা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মপাড়ায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদিগকে সর্ব্বদা পাড়ায় খেলিতে দেখিয়া মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম,

ইহাদিগকে বেথুন স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া এদের জন্য একটী ছোট স্কুল করা যাক্। স্কুলটী তিন ঘণ্টা বসিবে এবং কিণ্ডারগার্টেনের অনুরূপ প্রণালীতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই ভাবিয়া প্রথমে কতকগুলি শিশু সংগ্রহ করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করা গেল। স্কুলটীতে বালিকাই অধিক জুটিল, সঙ্গে শিশু বালকও থাকিত। নাম রাখা গেল ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়। আমি নিজে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে বোর্ডের সাহায্যে ছবি আঁকিয়া পড়াইয়া দেখাইতাম, কেমন করিয়া পড়াইতে হয়। সে সময়কার কোন কোন শিক্ষক সেই সময় হইতে শিশুশিক্ষার একটা নূতন ভাব পাইলেন, এবং উত্তরকালে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক হইয়া উঠিলেন।

ক্রমে এই শিক্ষালয়টী বড় হইয়া উঠিল। ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিবার ইচ্ছা ছিল না। আমি ইহাতে নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম এবং তদনুরূপ আয়োজন করিতেছিলাম। কিন্তু সমাজের সভ্যগণ ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং শ্রদ্ধেয় গুরুচরণ মহলানবিশের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বোর্ডিংকে ইহার সহিত যুক্ত করিয়া ইহাকে এক প্রসিদ্ধ বালিকা-বোর্ডিং করিয়া তুলিলেন, এবং পরে আমি ইহার সহিত সাক্ষাৎ সংস্রব ত্যাগ করিলাম।

তৃতীয় কার্য্য সাধনাশ্রম স্থাপন। যতদূর স্মরণ হয় ১৮৯০।১৮৯১ সালে আমি সহরের ভিতর হইতে উঠিয়া গিয়া বালিগঞ্জে বাসা করিয়াছিলাম। উঠিয়া যাইবার কারণ এই। কিছুদিন হইতে আমার মনে কি একপ্রকার অবসাদের ভাব আসিয়াছিল, আমার নিজের কাজকর্ম্মের প্রতি ও সমাজের কাজকর্ম্মের প্রতি কেমন একপ্রকার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। কিছুই ভাল লাগিত না; মেজাজ খারাপ হইয়া যাইতেছিল। সামান্য কথাতে বন্ধু-বান্ধবের প্রতি, পরিবার-পরিজনের প্রতি বিরক্ত হইতাম। অবশেষে মনে হইল সহর হইতে একটু দূরে থাকাই ভাল। তাই বালিগঞ্জে

একটী বন্ধুর একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া গিয়া বাস করিলাম। এখানে প্রায় প্রতিদিন প্রাতে এক নির্জ্জন বাগানে গিয়া বসিয়া চিন্তা করিতাম। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মনে হইতে লাগিল যে, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ব্রাহ্মসমাজ ও জনসমাজের সেবার জন্য আত্মসমর্পণ করিবেন এবং বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবার ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিবেন, এরূপ একটী ঘননিবিষ্ট সাধকমণ্ডলী গঠন করার বড় প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগিবে না। বিশ্বাসী ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন মানুষই ধর্ম্ম-সমাজের বল। এরূপ মানুষ প্রস্তুত না হইলে ধর্ম্মসমাজের শক্তি জাগে না। এই ধারণা মনকে এমন করিয়া ধরিয়া বসিল যে দিনরাত্রি চিন্তাকে অধিকার করিতে লাগিল। অবশেষে ১৮৯২ সালের মাঘোৎসবের সময় মনে সংকল্প জাগিল, যে, এরূপ একটী সাধকমণ্ডলী প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই বিষয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। অবশেষে হৃদয়ে সেইরূপ প্রেরণা আসিল। ঐ বৎসর আমার জন্মদিনের পূর্ব্বে অর্থাৎ ৩১শে জানুয়ারির পূর্ব্বে সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। প্রস্তাবিত আশ্রমের উদ্দেশ্য ও ভাব একখানি কাগজে লিখিয়া বন্ধুবর আনন্দমোহন বসুকে দেখাইলাম। তিনি হৃদয়ের সহিত উৎসাহ দিলেন। তৎপরে ৩১শে জানুয়ারি আমার জন্মদিন হইয়া গেল। ১লা ফেব্রুয়ারি ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেনের সিটী স্কুলবাড়ীর একটী ঘর চাহিয়া লইয়া কতিপয় বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাসনাপূর্ব্বক আশ্রম স্থাপন করিলাম। সেইদিন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী একজন। তিনি ঐ কাগজ পড়িয়া অতিশয় আন্দোলিত হইলেন, এবং আপনাকে ঐ কার্য্যের জন্য দিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন ময়মনসিংহ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিয়া-ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে তখন বিদায় দেওয়া গেল। কিন্তু তিনি

গিয়া বারবার পত্র লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার কিছু ঋণ ছিল। অবশেষে সেই ঋণ শোধ করিবার জন্য টাকা দিয়া তাঁহার ঋণ শোধ করিয়া তাঁহাকে আসিতে বলিলাম। জগদীশ্বর আশ্চর্য্য উপায়ে আশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে লাগিলেন। আমি একটী ছেলের হাতে ভিক্ষার ঝুলি পাঠাইতাম। তাহাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোকে যাহা দিত তাহা দ্বারাই সমুদয় ব্যয় চলিয়া যাইত। গুরুদাস সর্ব্বত্যাগী হইয়া আসিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল নামে বিক্রমপুরের একজন ব্রাহ্ম তাঁহার জুতার দোকান তুলিয়া দিয়া আসিলেন। ক্রমে ক্রমে আরও অনেকে আসিলেন। ইহার মধ্যে অনেকে আবার চলিয়া গিয়াছেন। আশ্রম ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে থাকিয়া অবশেষে সমাজ পাড়াতে সমাজের নির্ম্মিত প্রচারক-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইল; এবং অদ্যাবধি সেইখানেই আছে। আশ্রমের ইতিবৃত্ত নামে একখানি হস্তলিখিত পুস্তক আছে, তাহাতে ইহার অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া এখানে আর অধিক লিখিলাম না। কেবল কয়েকটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আশ্রম যখন স্থাপিত হইল, তখন আমার হাতে একটী পয়সা ছিল না। এমন কি বসিয়া লিখিবার জন্য যে একখানি চেয়ার ও ডেস্ক কিনি সে পয়সারও অভাব ছিল। অথচ আশ্রম স্থাপনের উপাসনাতে যে-সকল বন্ধু আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কাহারও কাছে কিছু চাহিলাম না। মনে এই ভাব ছিল, একার্য্য যদি জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হয়, সাহায্য আপনি আসিবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা চলিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দুই দিন যাইতে না যাইতে ইংলণ্ড হইতে প্রোফেসার ফ্রান্সিস নিউম্যানের প্রেরিত ১৫৲ পনর টাকা আসিয়া উপস্থিত। তিনি লিখিয়াছেন, তুমি ব্রাহ্মসমাজের যে কাজে ব্যয় করিতে চাও করিয়ো। তাহা দিয়া একটী ডেস্ক, একখানি চেয়ার ও অত্যাবশ্যক যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল, তাহা কেনা হইল। এই ভাবাপন্ন হইয়াই

যে বালকটীর হাতে বাড়ীতে বাড়ীতে বাক্স পাঠাইয়াছিলাম, তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম, কাহারও নিকট বিশেষ ভাবে কিছু চাহিবে না। কেবল বাক্সটী লইয়া বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া দাঁড়াইবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যিনি যাহা দিবেন লইবে। এইরূপ করিয়াই চারিদিক হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। আর একটী স্মরণীয় ঘটনা, একবার আমি সাধনাশ্রমের কার্য্যভার আশ্রমের একজন পরিচারকের প্রতি দিয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ লাহোরে গিয়াছিলাম। সেখানে সম্বাদ পাইলাম আশ্রমে মহা অর্থকষ্ট উপস্থিত। দিনে দুই তিন আনা মাত্র বাজার হইতেছে। যে রবিবার প্রাতে এই সম্বাদ পাইলাম, সেইদিন তথাকার এক ব্রাহ্ম বন্ধুর ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। আহার করিতে যাইবার সময় সঙ্গের একটী ব্রাহ্ম বন্ধুকে বলিলাম, "আজ আমার নিমন্ত্রণ খেতে উৎসাহ হচ্চে না। কলিকাতার আশ্রমে যারা আছেন, তাঁদের বাজারের পয়সা নাই, আর আমি এখানে নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়াচ্ছি—এ ভাল লাগ্‌ছে না। কিন্তু কি করি কথা দিয়েছি না গেলে নয়।" এই বলিয়া কোন প্রকারে গিয়া আহার করিয়া আসিলাম। সায়ংকালে লাহোর মন্দিরে উপাসনার কার্য্য আমাকে করিতে হইল। উপাসনান্তে আমি বেদী হইতে নামিয়াছি এমন সময় একজন আসিয়া আমাকে বলিলেন, যে, একটী পাঞ্জাবী বড়ঘরের মেয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য মন্দিরের পশ্চাতের ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি গিয়া দেখি তিনি একজন বড়লোকের পুত্রবধূ। তাঁহার পতি কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া গলবস্ত্রে আমার চরণে প্রণত হইলেন এবং আমার পায়ে একশত টাকার নোট রাখিয়া বলিলেন, আপনার স্থাপিত আশ্রমের সাহায্যার্থে দান। তৎপরদিনই সেই টাকা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিলাম।

আশ্রমসংক্রান্ত আর-একটী ঘটনা চিরস্মরণীয়। ১৮৯২ সালে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সালের মাঘোৎসবে ১২ই মাঘ সাধনাশ্রমের উৎসবের দিন। উপাসনা-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করি। তিনি দয়া করিয়া সম্মত হন। তিনি সংক্ষেপে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বেদী হইতে অবতরণপূর্ব্বক চলিয়া গেলে, কিয়ংক্ষণ আমাদিগের প্রার্থনাদি চলিতে থাকে। সেদিন এইরূপ একটী ভাবের আবির্ভাব হইল যে, সমাগত বন্ধুগণের নিকট দানের উপযুক্ত যে কিছু ছিল, সকলে দান করিতে লাগিলেন। এমন কি অবশেষে চারিদিক হইতে আমার মস্তকের উপর পুরুষদিগের গায়ের শাল, দামী পট্টবস্ত্র, মহিলাদের বালা, চুড়ি, গলার হার, প্রভৃতি পড়িতে লাগিল। তাহা বিক্রয় করিয়া পরে অনেক শত টাকা হইয়াছিল। এইরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা সাধনাশ্রম চিরদিনই চলিয়া আসিয়াছে। সাধনাশ্রমের ইতিবৃত্ত দেখিয়া বন্ধুগণ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিবার যথেষ্ট কারণ পাইবেন। তিনিই যে ইহার অর্থাভাব পূরণ করিয়া আসিয়াছেন, কেবল তাহা নহে; ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে চারিজনকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপনাদের প্রচারক-পদে বরণ করিয়াছেন।

চতুর্থ কাজ—কলিকাতার উপাসকমণ্ডলীর উন্নতি সাধন। বরাবর কলিকাতার উপাসকমণ্ডলীর কাজ এইভাবে চলিয়া আসিতেছিল যে সম্পাদক এক এক সপ্তাহে এক এক জনকে উপাসনা করিতে অনুরোধ করিতেন, তিনি উপাসনা করিতেন। আমরা এই ভাবেই উপাসনা করিয়া আসিতেছিলাম। তাহাতে কিছুই জমিতেছিল না। পরে ১৮৯৬ কি ১৮৯৭ সালে ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় উপাসকমণ্ডলীর সম্পাদক হন। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, যে, খ্রীষ্টীয় সমাজের pastoral system

প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে না। আমার নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করাতে আমি হৃদয়ের সহিত সে কার্য্যে সহায় হইলাম এবং প্রথম দায়ী স্থায়ী আচার্য্যের ভার গ্রহণ করিলাম। আচার্য্যের ও উপাসকগণের ব্যবহারার্থ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী নামে একটী লাইব্রেরী স্থাপিত হইল। আমি আমার আপিস তাহাতে স্থাপন করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতে লাগিলাম। প্রতি সপ্তাহে লিখিয়া উপদেশ দিতাম, এবং সেই উপদেশ পরে ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইত। সেই উপদেশগুলি পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়া "ধর্ম্মজীবন" নামে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিকে আমার আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্ম্মজীবনের পরিণত ফল বলিলে হয়।

কিছুদিন পরে শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য আমাকে দায়ী আচার্য্যের কাজ ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে যাইতে হয়। উপাসকমণ্ডলীর কাজ আবার পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়াছে। সেটা একটা দুঃখের বিষয়।

এই কালের মধ্যে আর-একটা কাজে হাত দেওয়া গিয়াছিল, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় নাই। যে সময়ে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম, সেই সমকালেই সীতানাথ নন্দী নামে এক ব্রাহ্ম যুবক আমার নিকট ব্রাহ্ম বালকদিগের জন্য একটী বোর্ডিং স্কুল স্থাপনের আবশ্যকতার উল্লেখ করেন। আমি বলি, তোমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, আমি পশ্চাতে আছি। তিনি বলেন, "আপনি যদি সম্পাদক বলিয়া নাম দেন, তাহা হইলে আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।" আমি সম্পাদকরূপে নাম দিতে স্বীকৃত হই এবং ঐ কার্য্যের দায়িত্ব নিজের শিরে গ্রহণ করি। সীতানাথের তত্ত্বাবধানে বোর্ডিং স্থাপিত হয়। ক্রমে অনেকগুলি বালক জোটে। দুঃখের বিষয় ইহার অল্পদিন পরেই সীতানাথ নন্দীর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু হইলে আমি বোর্ডিংএর ভার সাধনাশ্রমের পরিচারক গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর প্রতি অর্পণ করি। সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নামক একজন পূর্ববঙ্গীয় যুবক আসিয়া আশ্রমে যোগ দেন এবং ব্রাহ্মবালক বোর্ডিঙে গুরুদাস বাবুর সহকারী হন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে বোর্ডিং কিছুদিন চলে। তৎপরে গুরুদাস বাবু প্রভৃতি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আরাতে ও সেখান হইতে বাঁকীপুরে গমন করেন এবং সেখানে শাখা-আশ্রম স্থাপন করেন। ব্রাহ্মবালক বোর্ডিংএর ভার উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে শ্রদ্ধেয় গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হয়। অনেক বালকের দেয় অনাদায় থাকাতে গুরুদাস বাবুরা বাজারে প্রায় ৫০০ পাঁচশত টাকা দেনা রাখিয়া যান। তাহা আমাকে দিতে হয়। মহলানবিশ মহাশয়ের হাতে বোর্ডিং উঠিয়া যায়। আবার তিনি একটী ব্রাহ্মবালক বোর্ডিং ও স্কুল স্থাপন করিয়াছেন, এবং অদ্যাবধি চালাইতেছেন।

ইহার পরে এই সময়ের মধ্যে আর নূতন কাজে হাত দিই নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধনাশ্রমের কাজ ও উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্যের কাজ, এই দুই কাজই প্রধান কাজ থাকিয়াছে। ১৮৯৮ সালে শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য চন্দননগরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী বাড়ীতে গিয়া থাকি। সেখান হইতে রবিবার কলিকাতায় আসিয়া মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিতাম এবং সমাজের অন্যান্য কাজে সাহায্য করিতাম। ১৮৯৯ সালের শেষে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।

এই কালের মধ্যে ১৮৯৩ সালে হেমলতার বিবাহ হয়। ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার, যিনি কোকনদাতে পীড়ার সময় আমার চিকিৎসার জন্য সমাজের বন্ধুগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি আমার পীড়ার সময় হেমের সহিত পরিচিত হন; সেই পরিচয় ক্রমে দাম্পত্য প্রেমে পরিণত হয়, এবং অবশেষে তিনি হেমকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং আমার অনুমতি পাইয়া তাঁহারা বিবাহিত হন।

এই কালের মধ্যে আমার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনীও বিবাহিতা হয়। সাধনাশ্রমসংসৃষ্ট, কুঞ্জলাল ঘোষ নামক একজন যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হয়। দুঃখের বিষয় ইহার পর সুহাসিনী বহুদিন বাঁচিয়া থাকে নাই। ১৮৯৯ সালে বিবাহিত হইয়া ১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ঐ সালের ১৫ই নবেম্বর দিবসে গতাসু হয়। ১৯০১ সালের গ্রীষ্মকালে আমার পুত্রের বিবাহ হয়। ঐ বিবাহ কটকের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম বন্ধু মধুসূদন রাওর দ্বিতীয়া কন্যা অবন্তী দেবীর সহিত হয়। এই বিবাহের ফলস্বরূপ অদ্য পর্য্যন্ত একটী পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে।

এই কালের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে আর-একটী এই। এই সময়ের মধ্যে আমার মন্দিরের উপদেশ "ধর্ম্মজীবন" ব্যতীত যুগান্তর ও নয়নতারা নামে দুইখানি উপন্যাস ও মাঘোৎসবের উপদেশ ও বক্তৃতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামে একখানি গ্রন্থ এবং আমার রচিত প্রবন্ধ-সকল সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাবলী নামে এক গ্রন্থ মুদ্রিত করি।

১৯০১ সালের ৩রা জুন প্রসন্নময়ী স্বর্গারোহণ করেন। তৎপূর্ব্বে বহু বৎসর তিনি গুরুতর বহুমূত্র রোগে ক্লেশ পাইতেছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি পরলোকগত রামকুমার বিদ্যারত্ন ভায়ার মাতৃহীন সর্ব্ব-কনিষ্ঠা কন্যা রমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স এক বৎসর। তাহাকে লওয়ার কিছুদিন পরেই তাহার গুরুতর রক্তামাশয় রোগ জন্মে। সেই সময় রাত্রি জাগরণ ও দুর্ভাবনাতে প্রসন্নময়ীর বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হয়। তদবধি তাঁহাকে স্বাস্থ্যের জন্য নানাস্থানে প্রেরণ করা হয়। কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে ১৯০১ সালের জুন মাস হইতে অঙ্গুলিতে ক্ষত হইয়া তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

প্রসন্নময়ী চলিয়া গেলেন। এদিকে সেই বৎসরেই আমাকে সভাপতি

করাতে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সেই পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তাতে প্রসন্নময়ী চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই আমার বহুমূত্র রোগ প্রকাশ পাইল। তদবধি আর বসিয়া নিরুদ্বিগ্নচিত্তে কাজ করিতে পারিতেছি না। বৎসরের মধ্যে কয়েকমাস স্বাস্থ্যের জন্য সিমলা, দার্জিলিং, কটক, পুরী প্রভৃতি স্থানে থাকিতে হইতেছে।

এই অস্বাস্থ্যের অবস্থাতেও যথাসাধ্য সমাজের কাজ করা আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু অনেক সময় সহরে না থাকাতে সাধনাশ্রমের কাজের ক্ষতি হইয়াছে। এই পীড়িত অবস্থাতেও একবার ইচ্ছা হইল যে সমুদয় ভারতবর্ষ একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসি। তদনুসারে পত্নী বিরাজমোহিনী ও আশ্রমসংসৃষ্ট শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথ দত্তকে লইয়া ভারত ভ্রমণে বহির্গত হই। বহির্গত হইবার সময় সংকল্প করি যে যাত্রার সাহায্যের জন্য বিশেষভাবে কাহারও নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিব না। যাত্রার পূর্ব্বে মন্দিরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে একটা বক্তৃতা করিব। সেই বক্তৃতাস্থলে একটা ভিক্ষার ঝুলি থাকিবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে যিনি যাহা ফেলিয়া দিতে চান দিন, তাহাই আমাদের যাত্রার পাথেয়স্বরূপ হইবে। তদনুসারে বক্তৃতার দিন একটা ঝুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হইল, তাহাতে বন্ধুরা যিনি যাহা ফেলিয়া দিলেন, তাহা লইয়াই আমরা বহির্গত হইলাম। পথে একবারমাত্র ভিক্ষা না করা নিয়মের ব্যাঘাত করিয়াছিলাম। এলাহাবাদে একজন ব্রাহ্ম বন্ধুকে আমাদের জন্য ভিক্ষা করিবার অনুমতি দিয়াছিলাম। সেখানে কিছুই হইল না। তৎপরে আমরা ভিক্ষা করা একেবারে বন্ধ করিলাম। কাহাকেও আমাদের অভাব জানাইতাম না; যিনি যাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিতেন তাহাই গ্রহণ করিতাম। এইরূপে আমাদের ব্যয়নির্ব্বাহ হইত। আমরা এলাহাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ হইতে কানপুর গেলাম। তৎপরে

আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, রাউলপিণ্ডী, ইন্দোর, বোম্বাই, ম্যাঙ্গালোর, কালিকট, কোইম্বাটুর, বাঙ্গালোর, ট্রিচিনাপলি, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, নাগপুর হইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা না করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের দ্বারা আমাদের এই বিস্তীর্ণ ভ্রমণের সমুদয় ব্যয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গেল।

তাহার পর আর এত দূর ভ্রমণ করি নাই। বিগত বৎসর অর্থাৎ ১৯০৭ সালের মার্চ্চ মাসে Andhra Conferenceএ সভাপতির কার্য্য করিবার জন্য একবার কোকনদাতে যাই। সেখান হইতে কলিকাতাতে ফিরিয়া আসিয়া শরীরটা বড় খারাপ হয়। সেই অবস্থাতে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিঙ্গে আসি। এখান হইতে পিতাঠাকুর মহাশয়ের গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া সত্বর গ্রামে যাইতে হয়। তিনি আরোগ্যলাভ করিলে গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসি। কলিকাতায় আসিয়া ১৭ই জুন দিবসে গুরুতর পীড়াতে পতিত হই। এই পীড়াতে কয়েকবার জীবন সংশয় হইয়াছিল। যাহা হউক ঈশ্বরকৃপাতে ৪।৫ মাস রোগশয্যায় যাপন করিয়া উঠিয়াছি। সেই পীড়ার শেষফল এখনও রহিয়াছে। আজিও (৫ই জুন ১৯০৮) সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারি নাই। আগামী ১৭ই জুন হইতে আবার কার্য্যারম্ভ করিব ভাবিতেছি।

রোগশয্যাতে পড়িয়া অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তা করিবার সময় পাইয়াছি। নবশক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন ভাব মনে আসিয়াছে। অবশিষ্ট যে কয়েক বৎসর জগতে থাকি, নূতন ভাবে কাটাইব মনে করিতেছি। ঈশ্বর এই শুভসংকল্পের সহায় হউন।